গল্পগুলো অন্যরকম

লেখিকাবৃন্দ

সিহিন্তা শরীফা, নুসরাত জাহান, আনিকা তুবা, যাইনাব আল-গাযী, আফীফা আবেদীন সাওদা, সানজিদা সিদ্দীকা কথা, সারওয়াত জবীন আনিকা, সাদিয়া হোসাইন, শারিন সফি অদ্রিতা।

লেখকবৃন্দ

আরিফ আজাদ, মাহমুদুর রহমান, আরমান ইবনে সোলাইমান, শিহাব আহমেদ তুহিন, আলী আব্দুল্লাহ, আরিফুল ইসলাম, জাকারিয়া মাসুদ, শেখ আসিফ, মুরসালিন নিলয়।

Scanned with CamScanner

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

Scanned with CamScanner

জীবনের কাছে মাঝে মাঝে গল্পও তুচ্ছ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে জীবন রূপকথার চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। জীবনের বাঁকে বাঁকে, মোড়ে মোড়ে, ঘটনা-প্রতি-ঘটনায় জন্ম নেয় হৃদয়ের আকুতি-মিনতি, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ আর দুঃখ। এজন্যেই জীবন দুরন্ত, দুর্বিনীত ও চঞ্চল। এজন্যেই জীবন অন্যরকম।

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

জীবন একটি রঙিন ক্যানভাসের নাম। এই ক্যানভাসে রঙতুলির আঁচড়ে তৈরি হয় জীবনের বহুমাত্রিক গল্প। যার ভেতরে থাকে হাসি-কান্না ও দুঃখ-বেদনার সমারোহ। জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা গল্পগুলো হয়ে ওঠে ভাবনার উপজীব্য। জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এই গল্পগুলোর সরস উপাদান, থাকে-বর্ণিল জীবনকথা।

কিছু গল্প হয় দুঃখের উপাখ্যান, সুখের সারকথা। কিছু গল্পজুড়ে থাকে গভীর ভাবনা-চিন্তা ও কাজের প্রতিফলন। জীবনের এই মুহূর্তগুলো যখন শব্দে রূপ নেয়, তখন জীবন হয়ে ওঠে গল্প আর গল্প হয়ে ওঠে জীবন।

আমরা এক দূষিত সমাজে বাস করি। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নানা অনিয়ম, অনাচার আর অমানবিকতা। চারদিকে জরা-জীর্ণতার ছড়াছড়ি। সমাজ ও সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম-নীতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ভীষণ আর্তনাদে চিৎকার করে উঠি।

এরই ভেতর থেকে মাঝে মাঝে এমন কিছু চরিত্র উঠে আসে যারা স্রোতের বিপরীতে চলতে ভালোবাসে। কথা বলে ওঠে শত অনিয়ম, শত নিষেধাজ্ঞার মাঝে। এরাই যেন ঘোর অমানিশার মাঝে আলোর বিচ্ছুরণ, আশাহীন হৃদয়ের নির্ভরতা। চৈত্রের দহনে এক পশলা বৃষ্টি।

সময়ের প্রয়োজনে জেগে ওঠা এই মানুষগুলোর সম্মিলিত প্রয়াসে নিভু নিভু আলো ধীরে ধীরে রূপ নেয় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায়। বিদূরিত হতে থাকে অশুভ আঁধার। আমাদেরই চারপাশে বইতে থাকে পরিবর্তনের বাসন্তী-বাতাস। সেই বাতাসের ছুটে চলায় ভেঙে পড়ে সব জড়তা আর সংকীর্ণতার দেওয়াল।

Scanned with CamScanner

এমনই বৈরী পরিবেশে—যারা সত্য ও সাহসের কথা বলে, আমরা তাদের নিয়ে গল্প লিখি। তারা হয়ে ওঠে আমাদের গল্পের উপজীব্য। তাদের জীবনাচার থেকে ঘটনাগুলো তুলে এনে আমরা গল্পের রূপ দিই। রূপকথার গল্প নয়, সত্যিকারের সুপারস্টারদের গল্পগুলোই হয়ে ওঠে অন্যরকম। এই গল্পগুলো অচেনা, কিন্তু দরকারি। মনে হবে নতুন, কিন্তু ভীষণ ভাবনার উদ্রেককারী। গল্পগুলো নিছক গল্প থাকে না। সেগুলো হয়ে ওঠে আমাদের জীবন পরিবর্তনের নিয়ামক।

এমনই কিছু অন্যরকম গল্পের সমন্বয়ে আমরা সাজিয়েছি *গল্পগুলো অন্যরকম* বইটি। সেই অন্যরকম গল্পগুলো পড়ে পাঠকদের মনে ভাবোদয় ঘটবে, তাদের হৃদয়ে বইবে পরিবর্তনের বাসন্তী-বাতাস, তারাও হয়ে উঠবে এরকম গল্পের উপাদান—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গল্পগুলো অন্যরকম বইতে আমরা স্থান দিয়েছি বেশকিছু নবীন-প্রবীণ লেখকদের গল্প। অনেক পরিচিতমুখ আছেন সেই তালিকায়। তাদের গল্পে কখনও তারা হয়েছেন গল্পের উপাদান, কখনও বা গল্প-কথক। তারা লিখেছেন দুঃখ-ব্যথার কথা, সীমাহীন সুখের কথা। গল্পগুলোয় তুলে এনেছেন সমাজের অনিয়ম, অসুন্দর এবং অনাচারের কথা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—তাদের এই গল্পগুলো পাঠকদের হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, ইন শা আল্লাহ।

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত, আলহামদু লিল্লাহ। বইটির লেখক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মহামহিম আল্লাহ যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

বোধ — আরিফ আজাদ ১১

চেরিফুল — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৮

দ্বিতীয় বিয়ে — আনিকা তুবা ২৪

অশ্রুভেজা ডায়েরি — আফীফা আবেদীন সাওদা ৩০

সত্যিকারের মনস্টার — আলী আব্দুল্লাহ ৩৭

মায়ের দুআ — নুসরাত জাহান ৪৮

আঁধার মাঝে আলোর পরশ! — সিহিন্তা শরীফা ৫১

আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা — শিহাব আহমেদ তুহিন ৬৩

আমি আবারও যাব — আরিফুল ইসলাম ৬৯

একটি তাওয়াক্কুলের গল্প — মাহমুদুর রহমান ৭৪

নতুন মেয়ে যাইনাব — আফীফা আবেদীন সাওদা ৮০

অনুশোচনা — আরমান ইবনে সোলাইমান ৮৯

জীবনসায়াহ্নে — আরিফ আজাদ ৯২

স্বপ্নেরা বেড়ে ওঠে — শারিন সফি অদ্রিতা ৯৬

এক চিলতে রোদ — সারওয়াত জাবীন আনিকা ১০২

রূপকথাও হেরেছিল — শিহাব আহমেদ তুহিন ১১১

Scanned with CamScanner

এক টুকরো আলো — আফীফা আবেদীন সাওদা ১১৯
রুকাইয়া — মুরসালিন নিলয় ১২৪
মায়ের বিয়ে — যাইনাব আল—গাযী ১৩২
জাওয়াদ ও তার বাবা — নুসরাত জাহান ১৩৯
তোমায় ভালোবাসি — আরিফ আজাদ ১৪২
পূর্ণতার মাঝেই শূন্যতা — আনিকা তুবা ১৪৮
স্পেশাল অফার — জাকারিয়া মাসুদ ১৫১
এক চিলতে হাসি — সানজিদা সিদ্দীকা কথা ১৫৫
উমরাহ — সাদিয়া হোসাইন ১৬২
যা হারিয়ে পেয়েছি — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৬৭
পবিত্র প্রত্যাখ্যান — শেখ আসিফ ১৭৩
জীবনের ব্যাকরণ — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৭৫
ভাবনার আধাঁর — আনিকা তুবা ১৮১
মা — নুসরাত জাহান ১৮৫
এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় — আরিফ আজাদ ১৮৭
অন্তর মম বিকশিত করো — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৯৪
অগ্রাধিকার — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৯৮
পাঁচশো টাকা — আনিকা তুবা ২০৩
আকাশছোঁয়া আলো — মুরসালিন নিলয় ২০৬

Scanned with CamScanner

বোধ

আরিফ আজাদ

[এক]

আজ সকাল সকাল বের হতে হবে শাওনকে। দুই জায়গায় দুটি শিডিউল দেওয়া আছে। প্রথমেই যেতে হবে গৌরিপুর হাসপাতালে। সেখানে মামুনের স্ত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছে। ডেলিভারি কেইস। গতকাল রাত দেড়টায় মামুন ফোন করে জানিয়েছে, তার স্ত্রীর রক্ত লাগবে। তাও খুব সকাল সকাল। ফোনে মামুন পারলে তো কেঁদেই ফেলে। বারবার বলতে লাগল, 'দোস্ত, আসবি তো? বল না রে! সত্যি সত্যিই কি আগামীকাল আসবি হাসপাতালে? তোর ভাবির খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান যাচ্ছে। তুই ছাড়া এমন কেউ নাই যে আগামীকাল ভোরে এসে রক্ত দিতে পারবে। প্লিজ দোস্ত, কথা দে আসবি?'

এমনিতে ফোনের রিংটোন বেজে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেছে শাওনের। তার ওপর মামুনের এরকম ন্যাকা-কান্না শুনে তার সত্যিই রাগ লাগছিল। ভন ভন করে মাথা ঘুরতে লাগল। ফোনের ওপাশে মামুনের নাক্যামো মার্কা কান্না যেন থামছেই না। একপর্যায়ে শাওন বিরক্ত হয়ে বলল, 'থামবি তুই? এক কথা আর কতবার বলবি? বললাম না আসব। এক কথা কি হাজারবার বলা লাগে?'

Scanned with CamScanner

শাওনের একপ্রকার ধমক শুনে একটু থামল মামুন। বলল, 'দোস্ত, রাগ করিস না। ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পড়েই তোর কাছে ধরনা দিয়েছি। তাছাড়া আমার হাতে যদি আরও কয়েকটি অপশান থাকত তাহলে তোকে এভাবে জ্বালাতাম না আমি। বিশ্বাস কর।'

শাওন রাগতস্বরে বলল, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। তোকে বলেছি তো—আগামীকাল ভোরেই আমি হাসপাতালে থাকব—অন দ্য টাইম। এরপরও তুই বারবার বলে যাচ্ছিস—আসবি তো-আসবি তো? বিরক্তি লাগে না বল?'

মামুন চুপ মেরে গেল যেন। দুই প্রান্তেই নীরবতা। নীরবতা ভেঙে শাওন বলল, 'টেনশন করার কিছু নেই। আমি আগামীকাল খুব ভোরে উপস্থিত থাকব। বুঝেছিস?'

মামুন খুব ধীর-গলায় বলল, 'ধন্যবাদ দোস্ত।'

শাওন অতটা সময়ের অপেক্ষা করেনি। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্য শিডিউলটি ক্যাম্পাসের। আজ ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামের সব দায়-দায়িত্ব চেপেছে শাওনের কাঁধেই। মোটামুটি রকমের একটি ঝামেলায় পড়ে গেল সে। দুটি-ই ইমার্জেন্সি এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। বের হওয়ার পথে শাওনের মা ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত তাড়াতাড়ি তো কখনই যাস না। আজ যাচ্ছিস যে?'

শাওন ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'কখনই যাই না বলে যে আজ যেতে পারব না—এমন কোনো ব্যাপার আছে নাকি?'

ছেলের উত্তর শুনে শাওনের মা একদম চুপ মেরে গেলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার ছেলে কোনোদিন সোজা কথার সোজা উত্তর দেয় না। তাকে যখন মাছের কাঁটা বেছে মাছ খেতে দেওয়া হতো সে প্লেট ঠেলে দিয়ে বলত, 'কাঁটার জন্য মাছ খাবো না, তা তো বলিনি। মাছ খাবো না বলেছি—কারণ, মাছ খেতে আমার ভালোলাগছে না, তাই। শুধু শুধু বাড়তি যত্ন-আত্তির আমাকে করতে এসো না প্লিজ। বিরক্তি লাগে।'

ছেলের এমন অদ্ভুত আচরণে খুব আহত হন রাহেলা বেগম। বাপ-মরা একমাত্র ছেলে তার। কত স্বপ্ন তাকে ঘিরে! কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেটির এমন অদ্ভুত স্বভাবের কারণে রাহেলা বেগমের চোখের জল ফেলতে হয়। স্বামী আযহার উদ্দীনের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে আলেম বানাবেন। শাওনের যখন সাড়ে তিন বছর

Scanned with CamScanner

বয়স তখন থেকেই তাকে নিয়ে রোজ মসজিদে চলে যেতেন আযহার উদ্দীন। ছেলেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায় করতেন তিনি। এত ছোট্ট বাচ্চাকে মসজিদে আনতেন বলে অন্য মুরব্বী-মুসল্লীরা প্রায়ই দু-চারটি কথা শোনাতেন আযহার সাহেবকে; কিন্তু তাতে একেবারেই পাত্তা দিতেন না তিনি। তার একটাই কথা ছিল—ছোট বাচ্চারা ছোটবেলায় যা শেখে সেটি তারা সবসময় মনে রাখতে পারে। মসজিদে আসা শিখলে বড় হয়েও মসজিদে আসবে।

আযহার উদ্দীনের এই চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাবার হাত ধরে খুব ছোট বেলাতেই মসজিদে আসা-যাওয়া করা ছেলেটি বড় হয়ে একেবারে মসজিদমুখী হয় না বললেই চলে। বাবার শেখানো সব বিদ্যে সে ভুলে বসে আছে। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে একেবারে বখে গেছে সে। অথবা হতে পারে অবাধ স্বাধীনতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহেলা বেগম প্রায়ই বিড়বিড় করে বলেন, 'অতিরিক্ত স্বাধীনতাও একরকম পরাধীনতা।'

পায়ে মোজা পরতে পরতে শাওন বলল, 'দুপুরে খাব না। ফোন কোরো না।'

রাহেলা বেগম জানতে চাইলেন 'খাবি না কেন? কোথায় খাবি তাহলে?'

মায়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি দিল সে। তার চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। খুব কঠিন চেহারায় বলল, 'জাহান্নামে খাব, বুঝতে পেরেছ? কতবার বলেছি আমার ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে আসবে না। যখন বলেছি খাব না, তখন খাব না, ব্যস। ফারদার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে না—কেন খাব না, কোথায় খাব ইত্যাদি ইত্যাদি...।'

রাহেলা বেগম দ্বিতীয়বারের মতো চুপ মেরে গেলেন। ছেলের এমন স্বভাবের সাথে তিনি আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আগে সে এরকম ব্যবহার করলে তিনি জায়গাতেই চোখের পানি ছেড়ে দিতেন। টপটপ করে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ত মাটিতে। এখন চোখ আর মন—দুটি-ই কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে। অথবা হতে পারে সময়ের সাথে সাথে সয়ে নিয়েছে এগুলো। এখন আর এসব দেখে মনের ভেতরে হাহাকার হয় না। বুক ফেটে কান্না আসে না। মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে নিজের মৃত্যু চাইতে মন চায়। কিন্তু হাদীসে নিজের মৃত্যু চাইতে নিষেধ করা হয়েছে বলে তিনি ধৈর্য ধরে আছেন।

Scanned with CamScanner

শাওন যখন বের হতে যাবে তখন তিনি আবার বললেন, 'যদি একটু সময় দিতি তাহলে টিফিন ক্যারিয়ারে হালকা কিছু নাস্তা দিয়ে দিতাম। তোর জন্য ভোর থেকেই শীত-পিঠা বানাচ্ছিলাম।'

কিছুই বলল না সে। শুনতে পায়নি—এমন ভাব করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাহেলা বেগম। তার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। শাওন যখন তার বাবার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য অথবা স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হতো তখন সে বারবার পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাত। হাত নেড়ে মুচকি হেসে মাকে বিদায় জানাত। দরজার আড়াল থেকে তিনিও হাত নেড়ে ছোট্ট সোনামণিটাকে বিদায় দিতেন। মা-ছেলের চোখে-চোখে কথা হতো। সেই ছেলে আজ এরকম অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে—তা রাহেলা বেগম স্বপ্নেও ভাবেননি।

[দুই]

শাওন কথা রেখেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে।

গৌরিপুর হাসপাতাল। রোগীদের আসা-যাওয়া এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে গমগম করছে পুরো হাসপাতাল এলাকা। শাওনকে দেখে একরকম দৌড়ে এলো মামুন। চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। চিন্তা আর অস্থিরতায় শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শাওনকে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ দোস্ত। অনেক বড় উপকার করলি আজ'। মামুন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে শাওন বলল, 'তোর বউয়ের কী অবস্থা বল।'

'অবস্থা তো ক্রিটিক্যাল। খুবই ব্লিডিং হয়েছে। এজন্যই ব্লাড লাগছে।'

'ব্লাড কখন নেওয়া হবে?' জানতে চাইল শাওন।

'একটুপরেই।'

'আচ্ছা' বলেই থেমে গেল শাওন। শাওনের যে অন্য আরেক জায়গায় যাওয়ার তাড়া আছে ব্যাপারটি মামুনকে জানানো দরকার মনে করল না সে। বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে বাকি পৃথিবীটাই গৌণ।

ব্লাড দেওয়া শেষে শাওন হাসপাতালের বারান্দায় ফিরে এলো। তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল মামুন। শাওনের আজকের উপকারের কথা সে কোনোদিন ভুলবে না, এই প্রতিদানের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবে

Scanned with CamScanner

না সে—ইত্যাদি বলতে বলতে শিশুর মতোই কাঁদতে লাগল সে। তার কান্না দেখে আশেপাশের লোকজনও ফিরে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। হালকা বিব্রত হচ্ছে শাওন; কিন্তু এই মুহূর্তে মামুনকে থামিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। শাওন বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। আমি তাহলে আসি এবার।'

তার চলে যাওয়ার কথা শুনেই মামুন বলল, 'চলে যাবি মানে? আমার সন্তানের মুখ দেখে যাবি না?'

শাওন খেয়াল করল সন্তানের কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুতরকম পাল্টে গেল মামুনের চেহারা। বিষণ্ণতায় নুইয়ে পড়া মুখাবয়বে হঠাৎ আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। মামুনকে এরকম উৎফুল্ল দেখে শাওন জানতে চাইল 'সন্তানের জন্য খুব অধীর অপেক্ষায় আছিস বলে মনে হচ্ছে?'

হেসে ফেলল মামুন। তাকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, সে একটু আগে হাউমাউ করে কেঁদেছে। বলল, 'সন্তান যে কী-জিনিস তা বাবা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোদিন বুঝবি না।'

শাওন চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল তার বাবার কথা। সে যেদিন পৃথিবীতে আসে সেদিন কি তার বাবাও এরকম অধীর আগ্রহে প্রহর গুনেছে সারাক্ষণ? বাবার স্মৃতি আবছা-আবছা মনে করতে পারে সে। সেই আবছা স্মৃতির সবটুকুজুড়ে আছে বাবার আদর। বাবা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরতেন। বাবার বুকের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ার কথাও কিছুটা মনে পড়ে তার। বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফেরা—সবকিছু যেন স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসতে চাইছে...

শাওন বলল, 'ভাবিও কি তোর মতোই উদগ্রীব সন্তানের জন্য?'

আবার হেসে উঠে মামুন বলল, 'কী যে বলিস! বাবার চেয়ে একজন মা-ই তার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব থাকে। দশ-দশটি মাস পেটের ভেতরে অসহ্য সব যন্ত্রণা সহ্য করে বড় করে তোলে সন্তানকে। ভাবতে পারিস, কতটা ত্যাগ থাকে তাতে? একবার কী হয়েছে জানিস? তোর ভাবি একদিন আমাকে বলল, 'যদি সন্তান জন্মের সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় সন্তান বাঁচবে না-হয় মা; তখন কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই মাথায় আনবে না। আমার সন্তানই যেন আমার ওপরে প্রাধান্য পায়। আমি না থাকলেও সে যেন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে। সেদিন তার কথাগুলো শুনে আমার কান্না চলে এসেছিল।'

Scanned with CamScanner

শাওন শুনল কথাগুলো। একজন মা তার সন্তানকে এতটা ভালোবাসে? এতটাই ভালোবাসে যে, নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্তানের কথা ভাবতে পারে? অথচ ওই সন্তানের চেহারা পর্যন্ত দেখেনি তখনও। সে আবার ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়। 'আচ্ছা, আমার মা-ও কি আমার আগমনের সময় এমন উদগ্রীব ছিলেন? আমাকেও তো তিনি দশ-মাস পেটে রেখেছেন। সহ্য করেছেন অসহনীয় সব যন্ত্রণা। আচ্ছা, তখন বাবাকে ডেকে আমার মা-ও কি এমন করে বলেছিলেন? সেই কঠিন মুহূর্তে আমিও কি তার কাছে তার জীবনের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলাম?'

কল্পনায় ছেদ পড়ল শাওনের। পাশের অপারেশান থিয়েটার থেকে উচ্চৈঃস্বরে ভেসে আসছে এক নবজাতকের চিৎকার-কান্না। এই কান্নায় বুকটা হয়তো ধড়ফড় করে উঠল মামুনের। সে এক ভোঁ-দৌড়ে চোখের পলকে চলে গেল ওদিকে। মামুনকে এমন পাগলের মতো ছুটতে দেখে খানিকটা অবাক হয় শাওন। সাদা পোশাক পরা একজন নার্স অপারেশান থিয়েটার থেকে বের হয়ে মামুনকে বলল, 'মামুন সাহেব, আপনার মেয়ে হয়েছে।'

মামুনের খুশি আর দেখে কে; খুশিতে সে উচ্চ আওয়াজে কয়েকবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে উঠল। হাসপাতালে কিছু আত্মীয়-স্বজনও এসেছিল ইতোমধ্যে। কাছে যাকে-ই পাচ্ছিল—তাকেই আনন্দে জড়িয়ে ধরছিল মামুন। সন্তানের জন্য মামুনকে এমন উৎফুল্ল দেখে শাওনের ভেতরে এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সেই অনুভূতি শাওনকে চমকিত করে, ভাবিত করে।

[তিন]

বাইরে বেরিয়ে এলো শাওন। সকালের সোনা-রোদ এখনও মিলিয়ে যায়নি। এই মুহূর্তে তার ক্যাম্পাসে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোনো এক কারণে আজকে তার ক্যাম্পাসে যেতে মন চাইছে না কোনোভাবেই। তার স্মৃতিতে শুধু ভেসে উঠছে তার বাবার আবছা চেহারা। মনে পড়ছে মায়ের কথা। আজ সকালেও মাকে সে শাসিয়েছিল। প্রতিদিনই এমন আচরণ করে সে তার মার সাথে। কেন জানি তার ভেতরে খুব অপরাধবোধ কাজ করছে এখন। তার মন চাচ্ছে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে। জড়িয়ে ধরে মামুনের মতো হুহু করে কাঁদতে পারলে তার ভালোলাগত হয়তো...

Scanned with CamScanner

[চার]

ঠক... ঠক... ঠক...

দরজা খুলে দিলেন রাহেলা বেগম। দরজার সামনে শাওনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশ অবাকই হলেন। ওর তো আসার কথা ছিল না এখন। কোনো সমস্যা হয়েছে কি? রাহেলা বেগম খেয়াল করলেন, শাওন তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার সেই দৃষ্টিতে কোনো বিরক্তি নেই। কোনো তাচ্ছিল্য নেই। ছেলের চোখের এই চাহনির সাথে রাহেলা বেগম খুব অপরিচিত। ছেলের কোনো বিপদ হয়েছে কি না—এমন এক অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুক।

হঠাৎ মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল শাওন। রাহেলা বেগমের পা দুটি জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে সে কাঁদতে আরম্ভ করল। খুব অবাক হয়ে গেলেন রাহেলা বেগম। ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করেন তার কী হয়েছে? এমন করছে কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে কি না...

শাওন কিছুই বলছে না। শুধুই কাঁদছে। শিশুদের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকা শাওনকে আদর করে গালে চুমু খায় রাহেলা বেগম। তিনি বুঝতে পারেন শাওনের বোধ জেগেছে। একপ্রকার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন। রাহেলা বেগমের ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে জায়নামায বিছিয়ে দুআ করতে। কেননা, ছেলেকে নিয়ে এভাবেই তার হাজার বছর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়...

Scanned with CamScanner

চেরিফুল

আফীফা আবেদীন সাওদা

[এক]

শীতের সকাল। উইন্টারব্রুকের তুষার-ভেজা রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। গোটা পাড়া ঘুমিয়ে আছে। হিম-শীতল ঠান্ডা বাতাসে অদ্ভুত এক ছন্দ তুলে তিরতির করে কাঁপছে জাপানি চেরি গাছের পাতা। তারই ধার ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলাম খুব সতর্কতায়। তুষার-গলা পিচ্ছিল রাস্তায় বেরসিক জুতো জোড়া প্যাচপ্যাচ আওয়াজ তুলছে। এই বুঝি জেগে গেল ঘুমন্ত উইন্টারব্রুক!

এ এলাকায় এই আমার প্রথম আসা। হোম নার্সিং এজেন্সিতে চাকুরিটা হয়ে যাবার পর প্রথম কাজ পেলাম উইন্টারব্রুকে। আলঝাইমার্স রোগীর দেখাশোনা করতে হবে। রোগীর নাম আহমাদ জোন্স। রেকর্ড ঘেঁটে দেখলাম আশি বছরের এই বৃদ্ধ কনভার্টেড মুসলিম। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম পালন করছেন প্রায় বছর-চল্লিশ হলো।

মুসলিমদের নিয়ে জানাশোনা ছিল না আমার। সত্যি বলতে কোনো ধর্ম সম্পর্কেই শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি আমি। মনের গহীন থেকে কেউ বলে একজন স্রষ্টা তো নিশ্চয়ই আছে। আমি তাতে সায় দিয়েছি বটে, তবে স্রষ্টাকে খোঁজার চেষ্টা করিনি। গহীনের আওয়াজ গহীনেই ধামাচাপা পড়ে আছে তেইশটা বছর।

Scanned with CamScanner

এর মাঝে একজন মুসলিম রোগী পেয়ে খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিন বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছি। আমাদের, মানে আমার আর ছোট ভাই পিটারের ঠাঁই হয়েছিল তখন নানাবাড়িতে। চারপাশে যাকেই পেয়েছি, খ্রিস্টান। কখনও জানা হয়নি—মুসলিমদের রীতিনীতি কেমন ছিল। রোগীর চিকিৎসার সুবিধার্থে একটু-আধটু পড়াশোনা করলাম। জানতে পারলাম মুসলিমরা শূকরের গোশত খায় না, মদ ছুঁয়েও দেখে না। দোকান থেকে আহমাদ জোন্সের জন্য হালাল গোশত কিনেছি তাই। তাকে নিয়ে আমার উদ্বেগে কলিগরা অবাক। তাদের কথা এ রোগী তো আলঝাইমার্সের একদম এডভান্সড স্টেজে চলে গেছে। মাঝে মাঝে নিজেকেই চিনতে পারে না। তার ধর্মীয় রিচুয়াল নিয়ে এত ভাববার কী আছে?

ওদের কথায় আহত হয়েছিলাম খুব। একজন মানুষ স্মৃতিভ্রষ্ট বলে কি তার বিশ্বাস নিয়ে খেলা যায়? বারবার আমার নানীর মুখটা ভেসে উঠছিল। শেষ সময়ে তারও আলঝাইমার্স হয়েছিল। আমাকে আর পিটারকে যখন চিনতে পারতেন না, তখন কী যে কষ্ট লাগত! একদম শিশুর মতোন হয়ে যেতেন আমার নানী। যে-শিশু বলতে পারে না তার ক্ষিদে পেয়েছে, বুঝতে পারে না তাকে বাথরুমে যেতে হবে। স্মৃতি ফিরলে নানী একদম স্বাভাবিক মানুষ। আমাকে আর পিটারকে চোখে হারাতেন। এই মানুষটা যদি জানতেন এমনও দিন গেছে যেদিন তার কাছে আমি আর পিটার ছিলাম অচেনা আগন্তুক, তিনি কি মেনে নিতে পারতেন? মনে হয় পারতেন না।

আহমাদ জোন্স আমার নানীর রোগে ভুগছে। দেখার আগেই মায়া পড়ে গেছে লোকটার জন্য। আজ তার বাড়িতে গিয়েই হালাল বিফের স্ট্যু বানাব। প্রথমে তার আস্থা অর্জন করা চাই। সে যেন না-ভাবে আমার কাছে তার ধর্মীয় অনুভূতি অনিরাপদ। প্রয়োজনে চিকিৎসা-পদ্ধতি পালটে নেব, তবুও তার ধর্মের সাথে সংঘাতে যাব না।

সারবাঁধা চেরিফুলের গাছ পেরিয়ে রাস্তা যেখানে বামে বাঁক নিল, সেখানেই আহমাদ জোন্সের বাড়ি। লাল টালি দেওয়া ছাদের রঙটা জ্বলে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ির দুরাবস্থা দেখে যা ভেবেছিলাম, ভেতরটা তেমন নয়। আমি ঢুকতেই বাতাসে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ইজি চেয়ারে বসা বৃদ্ধ চোখ খুললেন।

'জেসিকা! তোমাকে বলেছি না এত আওয়াজ করে দরজা লাগাবে না।'

রোগীর হিস্ট্রি মোটামুটি মনে ছিল আমার। জেসিকা তার মেয়ের নাম। মারা গেছে বছর দেড়েক হলো।

Scanned with CamScanner

রুম-হিটারের উষ্ণতায় গরম কাপড়ের প্রয়োজন নেই। গায়ের ওভারকোটটা খুলে সোফার একপাশে রাখলাম। বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জানালাম আমি ক্যাসি, তার দেখাশোনা করতে এসেছি।

বৃদ্ধ জোন্স কী বুঝলেন কে জানে, আবার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। আমিও চলে গেলাম রান্নাঘরে। দ্রুত বিফ বের করে মশলাপাতি দিয়ে চুলায় চাপালাম।

জোন্সকে স্ট্যু খাওয়াতে একটু বেগ পেতে হলো। আমি বাঁ-হাতি। তাকে খাওয়াতে বারবার চামচটা বাম হাতে নিয়ে নিচ্ছিলাম। আর জোন্স কেবল ইশারায় ডান হাত দেখিয়ে দিচ্ছিল। আন্দাজ করে নিলাম এভাবেই মুসলিমরা খায়। বাম হাতে খাওয়া নিষেধ।

দুপুরে সাক্ষী হলাম এক অদ্ভুত ঘটনার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কী এক অচেনা ভাষা আওড়াচ্ছেন। খানিক বাদে দুই হাঁটু ধরে উবু হয়ে গেলেন। এরপর আবার দাঁড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অনেকটা ব্যায়ামের মতো, সাথে ভিনদেশি ভাষা। বিকেলে আবারও সেই একই কাজ। পরপর দুই দিন নিয়ম করে এমনটাই করে যাচ্ছেন তিনি। তা-ই নিয়ে কলিগের সাথে কথা বললাম। সে বলল, কোনো মুসলিমের সাথে সরাসরি কথা বলতে। কথায় কথায় এক চ্যাটরুমের সন্ধান পেলাম। সেখানে ধর্ম নিয়ে আলোচনা চলে।

সেই চ্যাটরুম থেকে জানতে পারলাম আহমাদ জোন্স ভিনদেশি ভাষায় যে-ব্যায়ামটা করেন, তা নিছক কাউকে দেখে শেখা নয়। সেটা ছিল মুসলিমদের প্রার্থনা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। যে-মানুষটা নিজের হাতে ঠিকমতো খেতে পারে না, নিজের পরিবারের কথাও ভুলে গেছে, সে ঠিক-ঠিক প্রার্থনা করে যাচ্ছে তার স্রষ্টার কাছে!

সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম তাকে ভালো রাখার উপায়। একমাত্র ইসলামই তার কষ্ট লাঘব করতে পারে! ইসলাম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বাড়িয়ে দিলাম। চ্যাটরুমে একজন আমাকে তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অনুবাদ পড়তে দিল। সেখান থেকে সূরা আন-নাহল যে কতবার পড়লাম! বারেবারে থমকে গিয়েছি এখানে—

.....

কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?[১]

.....

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ১৭।

Scanned with CamScanner

যতবার পড়ি হৃদয় ভেঙেচুরে আসে। সৃষ্টি আর স্রষ্টা সমান হতে পারে না! ভেতর থেকে তাগিদ আসে স্রষ্টাকে খুঁজে নেওয়ার। ধামাচাপা দেওয়া বোধগুলো জ্বালাতন করে খুব।

আমি এক মনে কুরআন পড়ে যাই। আইপডে তিলাওয়াত শুনি। জানি না কেন চোখ বেয়ে অশ্রু নামে।

দিনকে দিন কুরআন আমার কাছে বিস্ময়কর এক গ্রন্থ হয়ে ধরা দিচ্ছে। বৃদ্ধ জোন্স কুরআন শুনলে খুশি হয়, কখনও কাঁদে। অর্থ পড়ে আমিও বুঝে নিই কেন হাসে, কেনই বা কাঁদে। এই ভদ্রলোকের বাড়িতে পা রাখার আগের দিনটা পর্যন্ত আমি ভাবতাম—আমি সুখী, আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত। জরাগ্রস্ত আহমাদ জোন্স আমার ভাবনা বদলে দিয়েছে। জীবনসায়াহ্নে এসেও তার চোখে-মুখে প্রশান্তির ছাপ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে আমায়। সেই প্রশান্তি আমারও চাই। জানি না—কীসের জন্য প্রাণটা আকুল হয়ে থাকে। ভীষণ খালি খালি লাগে। বারেবারে মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই!

[দুই]

চ্যাটরুমে আজকাল বেশিই সময় ব্যয় করি। রোগীর জন্য ইসলামকে জানতে গিয়ে কখন যে নিজের জন্যই জানতে শুরু করেছি, টেরই পাইনি। এখানে সবাই সাহায্য করতে তৎপর। আমাকে স্থানীয় মসজিদগুলোর একটা লিস্ট দেওয়া হলো। সেই লিস্ট ধরে একটা মসজিদে গেলাম।

দিনটার কথা জীবনে ভুলব না আমি। মসজিদে পা রাখতেই সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি! আল্লাহু আকবার—আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! কী যে এক অজানা অনুভূতি! স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকেও কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি আমি। সত্য-মিথ্যা যা-কিছু মিলেমিশে একাকার ছিল, তার সবটা আমার সামনে দু'ভাগ হয়ে ধেয়ে আসছে। যেন বলছে, কোন দিকে যাবে তুমি? টালমাটাল আমি চোখভরা জল নিয়ে মুসলিমদের সালাত দেখলাম। দেখলাম, একদল মানুষ স্রষ্টার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে।

মসজিদের ইমামের সাথে কথা হলো। সখ্য হলো তার স্ত্রীর সাথে। তারা আমাকে কিছু বই দিলেন, আর কিছু অডিও লেকচার।

ইসলাম নিয়ে যা-কিছু জানার ছিল, জেনে নিতে লাগলাম চ্যাটরুম থেকে, কখনও মসজিদ থেকে। ধীরে ধীরে এমন একসময় চলে এলো, যখন ইসলামকে আঁকড়ে

Scanned with CamScanner

ধরা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর নেই।

এক সন্ধ্যায় সেই চ্যাটরুমে গেলাম আবার। মাইক্রোফোনে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'ক্যাসি, তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে?'

'না।'

'আমি কি জানতে পারি—কোন বিষয়টা তোমাকে ইসলামগ্রহণে বাধা দিচ্ছে?'

জবাব দিতে পারলাম না আমি। পরদিন ফজরের সালাত দেখতে মসজিদে চলে গেলাম। ইমামও চ্যাটরুমের সেই ভাইটির মতো একই প্রশ্ন করলেন। কী আমাকে বাধা দিচ্ছে? কী নিয়ে এত দোটানায় আমি? এবারও নিরুত্তর আমি।

চুপচাপ চলে এলাম আহমাদ জোন্সের কাছে। তাকে খাওয়াতে বসলাম। জবুথবু হয়ে ভদ্র ছেলের মতো খেয়ে নিচ্ছেন তিনি। তার শান্ত চোখের তারায় আমার প্রতিচ্ছবি। সে-ছবিতে নিজেকে পড়ে ফেললাম যেন! আমি ভয় পাচ্ছি...আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে ভয় পাচ্ছি! কোনো অজানা আশংকায় নয়, সত্যকে আলিঙ্গান করতে ভয় পাচ্ছি আমি! আমি কি এর যোগ্য? এই বৃদ্ধ মানুষটার মতো প্রশান্ত হৃদয় কি আমার প্রাপ্য?

বিকেলে আবার গেলাম মসজিদে। শান্ত স্বরে ইমামকে জানালাম শাহাদাহ পড়তে চাই। উচ্চারণ করলাম সেই অমোঘ বাণী—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ভেতর থেকে বোঝা নেমে গেল, এখন আমি মুসলিম! মনে হচ্ছিল ছোট্ট অন্ধকার এক গুহায় বন্দি ছিলাম আমি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলতেই গুহামুখের পাথর সরে যেতে লাগল, আর আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম!

মসজিদ থেকে আহমাদ জোন্সের বাড়ির পথ ধরেছি। তাকেই আগে জানাব আমার ইসলাম গ্রহণের কথা। এরপর পিটারকে। এখনও জানি না, সে কীভাবে নেবে। আশা রাখি পাশেই থাকবে আমার।

Scanned with CamScanner

উইন্টারব্রুকের রাস্তাটা নতুন করে দেখছি। প্রথম যেবার এসেছিলাম, তখন শীতকাল। শীত পেরিয়ে এখন বসন্তের মাঝামাঝি। ন্যাড়া রেডউড গাছটাতে পাতা এসেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে জাপানি চেরিগাছগুলো।

চেরিফুল কী অদ্ভুত সুন্দর! সাদাটে ফুলে হালকা গোলাপি আভা। এর মাঝে লাল রঙা রেণু দেখলে ভ্রম হয়। যেন আচমকা উথলে উঠেছে ফুলের বুক চিরে।

চেরিফুলের মিছিলে হাঁটছি আর ভাবছি। গেল শীতেও আমি ছিলাম পথহারা। মাস কতকের ব্যবধানে জীবন কেমন করে বদলে গেল! মনের গহীনে ধামাচাপা দেওয়া সত্যটা ছলকে বেরিয়ে এলো যেন! ঠিক চেরিফুলের রেণুর মতো। একদম হুট করে, আচমকা![১]

[১] গল্পটি একজন নওমুসলিমের ইসলামগ্রহণের সত্য কাহিনি অবলম্বনে লেখা।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় বিয়ে

আনিকা তুবা

[এক]

'দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি...'

'কিন্তু কেন? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না! আমি কখনই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। আপনাকে আরেকজন নারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না। আপনি চাইলে, আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।'

এই তো, কয়েক বছর আগে যখন স্বামীর মুখে শুনেছিলাম, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে আগ্রহী তখন প্রেম ও আবেগ-তাড়িত হয়ে ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলাম। আমার এই জোরালো প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে তিনি কেবল এতটুকু বলেছিলেন, 'ভোগ নয়; মানবতাবোধে তাড়িত হয়েই দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছি। যাকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি, তিনি ষোড়শী কিংবা ধনীর দুলালি নন; বরং সদ্য-তালাকপ্রাপ্তা চার সন্তানের জননী। ছেলে-মেয়ে নিয়ে খুব কষ্টে তার দিন কাটছে। তার অবস্থা এখন এতটাই শোচনীয় যে, রাত পোহালে মনে হয়, রাতটা আরেকটু দীর্ঘ হলেই ভালো হতো। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে আরেকটু সময় ঘুমিয়ে থাকত। আর রাত হলে মনে হয়, ভোরের আলো ফুটলেই হয়তো ভালো হতো, বাচ্চাগুলোর জন্য দু'মুঠো খাবারের হয়তো ব্যবস্থা করা যেত।'

Scanned with CamScanner

আমি বললাম, 'কেন? ওদের বাবা কী করে? সে কি বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে পারে না? তাদের দেখাশোনা করতে পারে না? সে নিজেই যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, তবে আপনি কেন বাইরের মানুষ হয়ে তার বোঝা বইতে যাবেন? তাছাড়া আপনি যদি তাকে কেবল সাহায্যই করতে চান, তবে বিয়ে করা ছাড়াও সেটা করতে পারেন। তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তার জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। সাহায্যের এতগুলো সুযোগ থাকতেও বিয়েই কেন করতে হবে?'

বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি আমি কল্পনাও করতে পারি না—আমার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করতে হবে, আমার প্রতি তার অখণ্ড ভালোবাসাকে খণ্ডিত করে আরেকজন নারী সেটা উপভোগ করবে; আমাকে ছাড়াও তিনি আরেকজন নারীকে স্পর্শ করবেন এবং তাকে ভালোবাসার চাদরে জড়িয়ে স্বপ্নের জাল বুনবেন—অসম্ভব! এটা কিছুতেই হতে পারে না। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

এগুলো ভাবতেই চরম ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানের জ্বালায় আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তার জন্য কী করিনি? স্ত্রী থেকে শুরু করে প্রেমিকা, সেবিকা, মা, ডাক্তার, গৃহিণীসহ—আরও কতজনের ভূমিকা পালন করেছি! এরপরও তিনি কীভাবে আমাকে এতটা অপমান করতে পারলেন? আমার জীবদ্দশায়ই দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে পারলেন?

দ্বিতীয় বিয়ের প্রতি তার এই আগ্রহের কারণে বারবার মনে হচ্ছিল, আমি হয়তো খুব বেশি ভালো না, খুব বেশি সুন্দরী না, কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অল্পবয়সী না; কিংবা তার জন্য আমি মোটেই যথেষ্ট না! এজন্যই তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলছেন।

কিন্তু আমি তার এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম—'আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো। অতএব, আপনি যদি অপরিচিত এক নারীর জন্য আমাদের বিয়ে, সন্তান ও জীবনের ঝুঁকি নিতে চান, তাহলে সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। আমি কিছুতেই যৌথ দাম্পত্যজীবন সহ্য করতে পারব না।'

Scanned with CamScanner

[দুই]

মনে হচ্ছে যেন কতকাল আগের কথা বলছি! এমন একসময়ের কথা—যখন আমি ভেবেছিলাম—এ জীবন অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে; কোনোদিনও শেষ হবে না...। যেন কখনও কিচ্ছু বদলে যাবে না; বদলাতে পারে না; কিন্তু অদ্ভুতভাবে সবকিছুই বদলে গেল।

আমার স্বামী অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। আমার অনড় অবস্থান আর হুমকিতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। আমি জানি না—সেই নারী ও তার বাচ্চাগুলোর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল। বোধহয়, তারা সবাই অন্য কোনো শহরে চলে যায়। তাদের জন্য একটু কষ্ট ও মায়া হয়েছিল বৈকি!

এরপর আমার স্বামী আর কখনই দ্বিতীয় বিয়ের কথা মুখে আনেননি। এ কারণে আমিও ভীষণ আনন্দিত। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে বুকে আগলে রাখার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! কিন্তু তখনও আমরা কেউ জানতাম না যে, আমাদের সময় খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে আসছে...।

একদিন মাগরিবের সালাতের পরে তিনি বললেন—'খুব মাথা ব্যথা করছে; ইশার সালাত পর্যন্ত শুয়ে থাকব।' এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়েন।

কিন্তু হায়! সে রাতে তার আর ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। তার সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে-রাতেই তিনি মারা যান।

তার আচমকা মৃত্যুতে আমি একেবারেই হতবিহ্বল হয়ে পড়ি! যে-মানুষটার সাথে সারাটা জীবন কাটিয়েছি, সে হঠাৎ করেই পরপারে চলে গেল। এরপর কতরাত যে একাকী তার জন্য কেঁদেছি—তা কেউ জানে না। হয়তো বা এক মহাকাল জুড়ে!

[তিন]

সে-সময় কোনোকিছু দেখাশোনা করে রাখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। অযত্নে, অবহেলায় একে একে সব হারাতে শুরু করলাম। প্রথমে আমাদের গাড়ি, এরপর দোকান, এরপর বাড়ি।

শেষমেশ তিন সন্তান-সহ আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হঠাৎ এতগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ওদের বাড়িটি গিজগিজ করতে লাগল। আমার

Scanned with CamScanner

ভাবিও দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। খুব ইচ্ছে হতো, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সে-সময় আমার দরকার ছিল একটি চাকরি। কিন্তু বিশেষ কোনো কাজে আমার কোনো দক্ষতা ছিল না।

এভাবে মানুষের দয়ায় কতদিন পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম।

যখন আমার স্বামী বেঁচে ছিলেন আমরা কত আরামে ছিলাম। ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজনই হতো না; কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরে জীবন এত কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে, আমি প্রতিটি দিন তার অভাব বোধ করতাম। হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে তাকে অনুভব করতাম। সমস্ত স্মৃতিজুড়ে তাকে খুঁজে বেড়াতাম। কী করে মানুষের জীবন এত ভয়ানকভাবে পাল্টে যায়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না!

এভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন আমার ভাই আমাকে ডেকে তার এক কলিগের কথা বললেন। তিনি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ। চমৎকার আচার-ব্যবহার। দ্বীনদারীও প্রশংসনীয়। তিনি চান, আমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী হই। আমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো দ্বিতীয় স্ত্রী কথাটি শুনলাম; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি কত ভিন্ন।

একদিন আমার ভাইয়ের বাসায় আমাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে তাকে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। তার প্রতিটি ব্যাপারই খুব ভালোলাগছিল। তিনি আমাকে বললেন, তার প্রথম স্ত্রী জানেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। তবে সে এর বিপক্ষে। তিনি এটাও বললেন, দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটি তার জানা নেই; তবে তার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরেই এখন তার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।

সে-রাতে আমি ইস্তিখারা-সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাচ্ছিলাম—যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার মনে পড়ল, আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এভাবেই আমার সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করছিল। মনে পড়ে গেল, আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটি উপলব্ধি হলো।

বারবার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে স্থান দিইনি; তাহলে আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান দেবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।

Scanned with CamScanner

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিল! জীবনে একবারও আমার মনে হলো না যে, আমি যে-কাজটি করছি তা কতখানি ভুল? আমি সব সময় ভেবে এসেছি—এমন করাটাই ঠিক ছিল।

কিন্তু এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজন যখন এবার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম, কতটা ভুলে-ই না আমি ছিলাম! আমি আরেকজন নারীর স্বামী-পাবার অধিকার অস্বীকার করেছিলাম।

আমি দুআ করতে থাকলাম, যেন তার স্ত্রী আমাকে মেনে নেন...।

কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারটি মেনে নিতে তার স্ত্রীর খুবই কষ্ট হচ্ছে; তবুও তিনি আমার সাথে দেখা করতে আগ্রহী।

[চার]

আজ তার স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাতের দিন। আমি তার বাসায় ড্রইং রুমে বসে আছি। ভাবছি, দ্বিতীয় বিয়ে বিষয়টি কেমন! কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। আমার স্বামীর সাথে আমার বলা কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল—

'আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না! আমি কখনই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। আপনাকে আরেকজন নারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না। আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।'

বসে বসে বোরিং ফিল করছিলাম। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করছিলাম, 'আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, তার স্ত্রীর দিলে আপনি রহম পয়দা করুন, সহীহ বুঝ দান করুন। ইত্যাদি..।'

তিনি রুমে এলেন। তার অশ্রু ছলছল চোখ স্পষ্টতই বলছিল যে, তিনি আমার মতোই স্বামী অন্তপ্রাণা একজন নারী। তিনিও আমার মতো তার স্বামীকে খুব ভালোবাসেন। তাকে হারাতে খুব ভয় পান। তিনি আমার হাত দুটি ধরে বললেন, 'বোন আমার! আপনি যতই অসহায় হোন না কেন, আমার জন্য এটি মেনে নেওয়া যে ভীষণ কঠিন! তারপরও দুআ করি, যেন আমরা দুজন আপন বোনের মতো থাকতে পারি।'

Scanned with CamScanner

আমি হুহু করে কেঁদে উঠলাম। আমার এই কঠিন সময়ে প্রয়োজন ছিল একটি ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ের এবং স্নেহমাখা হাতের। যে-হাত আমাকে বুকে জড়িয়ে নেবে এবং যে-ভালোবাসা আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছাটিকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার স্ত্রীর উদারতায় আমি সেটুকু পেয়ে যাই।

তার স্ত্রী আমার জীবনে এমন একজন নারীর দৃষ্টান্ত, যেমন-নারী আমি নিজে কখনও হতে পারিনি। আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। একসময় ভাবতাম, কেউ তার স্বামীকে নিশ্চয়ই আমার মতো করে এত বেশি ভালোবাসে না। কিন্তু তার স্ত্রীকে দেখে ধারণা পাল্টে যায়। এই মানুষটির কাছ থেকেই আমি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আসল পরিচয় জানতে পারি।[১]

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।

Scanned with CamScanner

অশ্রুভেজা ডায়েরি

আফীফা আবেদীন সাওদা

জানুয়ারী ১৯৯১

রাত বাজে আড়াইটা। মেঝেতে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ক্ষান্ত দিলাম। ঘুম আর আসবেই না। চোখটা লেগে এসেছিল একবার। শুনতে পেলাম বিছানা থেকে মা কোঁকাচ্ছেন, 'শিউলি... ও শিউলি...'

আমি উঠতে-না-উঠতেই বিছানা ভাসিয়ে ফেললেন মা। তাকে পরিষ্কার করালাম, বিছানা পরিষ্কার করলাম। চাদর, কাঁথা সব ধুয়ে দিলাম যাতে সকালের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। যত দ্রুত সম্ভব বিছিয়ে দিতে হবে। মা আমার খালি তোশকে রাত কাটাচ্ছেন। এই রাতের বেলা চাদরের জন্য ভাইয়া-ভাবির ঘুম ভাঙানো যাবে না।

প্রায়ই এমন হয়। একটাই সান্ত্বনা, এই শীতের রাতেও দরদর করে ঘামেন আমার মা। লেপ-কম্বল লাগে না। কখনও-সখনও কাঁথা গায়ে দেন, আবার আমাকে ডাকেন কাঁথাটা সরিয়ে দিতে।

আমি কাঁথা সরিয়ে দিই। ঘামে ভেজা মাকে তালপাখা দিয়ে বাতাস করি। মাঝে মাঝে অতি সাহস করে ফ্যান ছেড়ে দিই। শীতে কষ্ট পাবার ভয় আমার নেই। ভয়টা ভাই-ভাবিকে নিয়ে।

এক রাতে ফ্যান ছেড়েছিলাম বলে কী তুলকালাম! পুরাতন ফ্যানের ঘটঘট আওয়াজ শুনে ভাই দৌড়ে এলো।

Scanned with CamScanner

'এই শীতের রাতে ফ্যান কেন? বিদ্যুত বিল বাড়াতে চাস? ভাইয়ের সবটা খেয়ে-পরেও পোষাচ্ছে না?'

বদ্ধ পুকুরের শান্ত পানির চেয়েও শান্ত গলায় বলেছিলাম, 'তোমারটা খাচ্ছি না। বাবা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তাতে আমার খাওয়া-পরার খরচ উঠে আরও থেকে যাবে। আমি আর কতটুকুই খাই, কতটুকুই বা পরি? দুই ঈদে একটা করে জামা পাই, তাও মামার কাছ থেকে। তোমার থেকে কিছুই নিচ্ছি না। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাও।'

ততক্ষণে ভাবিও এসে হাজির। চুপ থাকলেই পারতাম। মুখে মুখে তর্কের অপরাধে জল অনেক দূর গড়ালো। সে-রাতে কেউ ঘুমায়নি। বাড়ির বহু পুরোনো ইতিহাস, কার কত অবদান, কে বসে খায় আর কে ঘাম ঝরায় ইত্যাদি তর্কে রাত পেরিয়ে ভোর। তর্কে জিতল ভাই আর ভাবি। আমার শোচনীয় পরাজয়। প্রমাণিত হয়ে গেছে, এ সংসারে আমি শুয়ে বসে কেবল অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছি। সেইসাথে পিতৃসম বড়ভাইয়ের মুখে মুখে তর্ক করে তার প্রতিদান দিচ্ছি। দুনিয়ায় যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেই মা-ও কথা বললেন না পাক্কা দুই দিন।

এরপর থেকে উচিত কথা গিলে ফেলতে শিখেছি। চুপচাপ শুনে যাই। যে যা বলে মেনে নিই। তালপাখা নাড়াতে নাড়াতে হাতটা অবশ হয়ে আসলে সাহস করে ঘটঘটে ফ্যানটা একটুখানি ছেড়ে দিই। আমার সাহসের দৌড় অতটুকুই।

মনকে মানিয়ে নিয়েছি। বাবার রেখে যাওয়া বাড়িতে যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারছি সে-ই ঢের। পশ্চিমের আলো বাতাসহীন ঘরটা আমাদের। আমার আর মায়ের। আমরা দুজন এ ঘরেই সংসার পেতেছি।

দরজার ওপারে আলাদা একটা জগত। আলাদা সংসার। সেখানে ভাই, ভাবি আর আমার আদরের ভাতিজি তুলতুলির বসবাস। সে সংসারেও আমার একটা অবস্থান আছে বটে! আমি সেখানকার বেতনবিহীন কাজের বুয়া। সারাটা দিন দৌড়ে কাটে আমার। তুলতুলি এক পেরিয়ে দুইয়ে পা রাখল। দিনের অনেকটা সময় তাকে দেখে রাখতে হয়।

ভাবির মাস্টার্স প্রায় শেষের পথে। এরপর চাকরিতে ঢুকে যাবে। তার ছোট চাচা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাস্টার্সটা শেষ করলেই জয়েনিং। সে সময় তুলতুলিকে হয়তো সারাদিন দেখে রাখতে হবে। কাকে ছেড়ে কাকে দেখব? মাকে, নাকি তুলতুলিকে?

Scanned with CamScanner

অগাস্ট ১৯৯১

বহুদিন পর একটু অবসর পেলাম। তুলতুলিকে নিয়ে ভাবি গেছে বাপের বাড়ি। আজ বিকেলেই গেল। যাবার আগে মায়ের সাথে বেশ গল্প করল দেখলাম। আমি অবশ্য ব্যস্ত ছিলাম তুলতুলিকে গোসল করাতে।

গোসল শেষে রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। মনটা বেশ উড়ুউড়ু। এতদিনের স্বপ্ন পূরণের বার্তা পেয়েই হয়তো! বাবা মারা যাবার পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ আসে না বললেই চলে। বেঁচে থাকতে একের পর এক সম্বন্ধ আসত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। তখন মাত্র ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছি। একে একে সব প্রস্তাব নাকচ করে দিতেন বাবা। পড়াশোনা শেষ করে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দিতে চান না তিনি।

ফুফুদের দেখেছেন সংসারে একটা পরিচয়ের অভাবে, ডিগ্রির অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করতে। ভাই হিসেবে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তার। মেয়েকেও সেই একই জীবনের দিকে ঠেলে দিতে চাননি।

যে-সমাজের মানদণ্ড এত নীচ; যে-সমাজ ডিগ্রি থাকলেই, চাকরি থাকলেই মাথায় তুলে রাখে, নতুবা নয়; সে-সমাজকে কেন যেন আমরা শুধরে যেতে বলি না। উল্টো সমাজের মানদণ্ডে উতরে যেতে নিজেকেই কারাদণ্ড দিয়ে বসি।

ডিগ্রি নিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, আপত্তিও ছিল না। ওদিকে জীবনসঙ্গীর অভাবটাও তাড়িয়ে বেড়াত। ওই যে বললাম—সমাজের কথা, যা সুচতুরভাবে ডিগ্রি আর বিয়ের মাঝে সংঘাত ঘটিয়ে দিয়েছে। হয় ডিগ্রি, নয়তো বিয়ে।

বাবা মারা যাবার পর মা পড়ে গেলেন বিছানায়। বাবার স্বপ্ন পূরণ হলো না আর। আমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘরে রয়ে গেলাম মায়ের দেখাশোনা করতে। অসুস্থ মায়ের যতক্ষণ হুশ আছে ততক্ষণ আমার জন্য আক্ষেপ। কেন যে সম্বন্ধগুলো বাতিল করে দিয়েছিলেন বাবা! আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখেন মা। ভয় পান, তার কথা ভেবে না-জানি আজীবন কুমারী থেকে যাই।

'মা রে, তুই আমার জন্য চিন্তা করিস না। আল্লাহ আছেন। তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।'

প্রতিদিন সকাল-বিকাল একই কথা জপেন। একজন সঙ্গীর অভাবে আমারও প্রাণ কাঁদে। মায়ের চিন্তায়ও ঘুম আসে না। আমি চলে গেলে ভাই-ভাবি কি মাকে

Scanned with CamScanner

দেখবে? কত রকমের স্বপ্ন দেখি। বিয়ের পর স্বামীকে বলে মায়ের জন্য একটা নার্স রেখে দেব। জটিল সব টানাপোড়েনে দিন কাটে। সমস্যার শেষ নেই, সমাধান অজানা।

গতকাল বিকেলে সোহেলী আপা এলো বাড়িতে। আমার জন্য সম্বন্ধ এনেছেন। পাত্রপক্ষের সবদিকই আমাদের পরিবারের সাথে মিলে যায়। আপত্তি করবার জায়গা নেই। এতদিন টুকটাক যে ক-টা সম্বন্ধ আসত, ভাই-ভাবি নাকচ করে দিয়েছেন নানান ছুতোয়। এটা মেলে, তো সেটা মেলে না। এই পাত্রের বেলায় ভাইয়াও বলে বসল, 'ছেলে তো বেশ ভালোই!'

এরপর বিয়ে নিয়ে কদ্দূর কথা হয়েছে জানি না। আজ দুপুরে ভাবি কি আমার বিয়ে নিয়েই আলাপ করছিল? জানা নেই। রান্নাবান্না সেরে, ঘরদোর গুছিয়ে অবসর পেলাম পড়ন্ত বিকেলে। এক কাপ চা নিয়ে মায়ের মুখোমুখি বসেছি। গতকাল বিয়ের সম্বন্ধ আসার পর থেকেই মায়ের মুখটা ঝলমল করছিল। রুগ্ন-ভগ্ন শরীরের সব কষ্ট ছাপিয়ে মেয়ের একটা গতি হচ্ছে সেই আনন্দ দেখেছিলাম তার চোখে-মুখে। অথচ আজ যেন কোথায় কী নেই।

চোখটা কি চিকচিক করছে মায়ের? এগিয়ে এসে হাত দুটো ধরলাম। এই হাতে একা সংসার সামলেছেন একসময়। আর এই হাত এখন কতটা অসহায়!

হাত ধরতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মা।

'মা রে তুই আমার আদরের মেয়ে! শ্বশুরবাড়িতে তোর কোনো কষ্ট সইতে পারব, বল? এই বিয়েটা করিস না মা।'

এক দিনের ব্যবধানে মায়ের আমূল পরিবর্তন। থমকে গেলাম। চোখের সামনে মেয়ের কষ্ট সইতে পারেন যিনি, চোখের আড়ালে শ্বশুরবাড়ির কষ্টে তার এত ভয়!

ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

ভাবির ছোট বোন শিল্পীর বিয়ে হলো আমাদের বাড়িতে। ভাবির আবদার। তাদের সেই ভাড়া-বাড়িতে বিয়ের আয়োজন সম্ভব না। আমাদের বাবার রেখে যাওয়া বাড়িটা ভাঙাচোরা হলেও নিজের বাড়ি তো! বাড়িওয়ালার খবরদারি নেই, যখন তখন নোটিশেরও ভয় নেই।

Scanned with CamScanner

এই কয়দিন গায়ে হলুদের খাটাখাটনি করে ক্লান্ত-শ্রান্ত আমি। গা এলিয়ে একটু শোবার ফুসরত মেলেনি। ফুল দিয়ে ঘর সাজানো, আলপনা আঁকা; সব নিজ হাতে করেছি। সাথে ছিল তুলতুলি। ফুপির কোল ছাড়ে না।

চারিদিকে কী আনন্দ, কী হইচই! সবার চোখে-মুখে খুশির জোয়ার। কেবল আমারই ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল ভীষণ। নাহ, অন্যের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমার হচ্ছে না—এমন ঈর্ষা থেকে নয়। পাত্রের নাম-ধাম জেনে গিয়েছিলাম। সেই থেকে শরীরের সাথে সাথে ভারী মনটাকেও টেনে নিয়ে চলছি।

পাত্র সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধ আমার জন্য এসেছিল, যার ব্যাপারে আমার উন্নাসিক ভাইও বলেছিল, 'ছেলে তো বেশ ভালোই।'

একে একে সব রহস্যের জট খুলে গেল। সম্বন্ধ আসবার পর কেনই বা আমার ব্যস্ত ভাবি মায়ের সাথে এত গপ্প জুড়ে দিল? কেনই-বা তড়িঘড়ি করে বাপের বাড়ি ছুটল! মাকে ভাবি কী বলেছিল—তা জানি না। কেবল ফলাফলটা জানি!

পৃথিবীতে কিছু রহস্যের জট না খুললেই বুঝি ভালো! এক ধাক্কায় সব রহস্য ভেদ হয়ে যাবার ভার সইতে পারলাম না। বিয়েবাড়ির হই হুল্লোড় শেষ হতেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কিছুই ভালো লাগে না আর। মায়ের ওপরও ভীষণ রাগ হয় মাঝে মাঝে। পরক্ষণেই ভাবি—কতটা অসহায় আমার মা! কতটা অসহায়! বিছানায় পড়ে-থাকা মা আমার! তার ওপর রাগ করে কী লাভ!

নভেম্বর ১৯৯৫

ট্রাংক খুলে কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম। হুট করে পেয়ে গেলাম ডায়েরিটা। পেয়েই যখন গেলাম, আবার না-হয় লিখি।

মা চলে গেছেন বছরখানেক হলো। যখন তখন 'শিউলি শিউলি' বলে কেউ ডাকে না আর। প্রথম প্রথম খুটখাট শব্দেও জেগে যেতাম ঘুম থেকে। মা কি টয়লেটে যাবে? পানি খেতে চায়? ঘুম ঘুম চোখে শূন্য বিছানা দেখে আঁৎকে উঠতাম। মা কই?

এখন অবশ্য নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবি অফিসে চলে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। ভাইও তাই। এত বড় বাড়িতে আমি আর তুলতুলি একা। এই সময়টা মায়ের অভাব খুব অনুভব করি। মা থাকলে কারণে-অকারণে ডেকে ডেকে হয়রান করত।

Scanned with CamScanner

সেই হয়রানির জন্য মন কাঁদে।

দিনের অর্ধেকটা কাটে তুলতুলির সঙ্গে। সে কখনও ফুপি কখনও শিউলি ডেকে মায়ের অভাব পূরণ করে।

জীবন এভাবেই কেটে যাচ্ছে। হাতে অখণ্ড অবসর। বারান্দা দিয়ে মানুষের যাতায়াত দেখি। হট-প্যাটিসওয়ালা কাঁচের বাক্সে করে প্যাটিস নিয়ে যায়। ছোট্ট গোল হাওয়াই মিঠাই কিনতে এ বাড়ি ও বাড়ির বাচ্চারা পুরোনো হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে হাজির হয়। কাগজে করে চারটা হাওয়াই মিঠাই আমিও কিনেছিলাম। একটা ট্যাপ-খাওয়া কানা পাতিলের বিনিময়ে। গোলাপি মিষ্টি হাওয়াই মিঠাই মুখে দিতেই গলে যায়। আমি খাই, তুলতুলি খায়। জিভে রঙ লেগে মাখামাখি হয়। সেই রঙ তুলতে কতরকম চেষ্টা! ভাবিকে জানানো যাবে না কিছুতেই!

রাস্তায় লোকের অভাব নেই। এতকিছুর মাঝেও সদ্য বিয়ে হওয়া মেয়েটা আর ছেলেটাকে চোখে পড়ে যায়। আমি ওদের ঠিক ঠিক চিনে ফেলতে পারি। একদিন আমারও হবে—সে আশ্বাস আর দিই না নিজেকে। বয়স পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে। বিয়ের প্রস্তাব আসে না আর। আসলেও আমার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। আগে মা ছিল; যার যত প্রস্তাব—লোকে এসে মাকে দিয়ে যেত। এখন মা নেই। প্রস্তাব এলো না গেল সে খবর জানি না।

ভাইয়া-ভাবির ভাবসাবে মনে হয় না আমার বিয়ে নিয়ে কোনো আশা আছে। বেতনবিহীন কাজের বুয়া যে-আদরে তুলতুলিকে বড় করছে, সেই আদর বেতনভুক্ত বুয়া দিতে পারবে না।

মাঝে মাঝে মন চায় বলি, ঘর জামাই-ই না-হয় হলো! তবুও আমায় একা রেখো না, প্লিজ!

সংকোচে আর লজ্জায় বলা হয় না। নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলি কী করে!

জানুয়ারী ২০১৯

প্রায় দুই যুগ পরে ডায়েরি হাতে তুলে নিলাম। ধুলোর আস্তর পড়া ডায়েরি। উইপোকা কাটা ডায়েরি। আগে সময় পেলেই লিখতে বসে যেতাম। একদিন ডায়েরিটা মায়ের পুরনো সিন্দুকে রেখে তালা মেরে দিলাম। আর লিখব না। কী হবে লিখে? চোখের সামনে শুধু অসীম শূন্যতা দেখি। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই।

Scanned with CamScanner

মা মারা যাবার পর তুলতুলির পেছনে জীবনটা ব্যয় করে দিলাম। চোখে হারাত আমাকে। বড় হতে হতে ফুপির দাম কমে গেল। সেকেলে ফুপি শুধু সীমা বেঁধে দেয়। ভালো-মন্দের সবক দেয়। আদেশ-নিষেধে আগলে রাখতে চায় সারাটা ক্ষণ। স্বাধীনতার স্বাদ পেতে আমাকে একসময় দূরে ঠেলে দিল সে।

ছোট্ট বুড়িটা আর ছোট নেই। বছর চারেক আগে জিআরই টোফেল দিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড। আমেরিকায় যাবে পিএইচডি করতে। মেয়ের জন্য যোগ্য-পাত্র খুঁজে পায় না ভাই-ভাবি। একা একা বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, ফুপি হয়ে আমিই বাদ সাধতে গেলাম। বললাম, বিয়েটা করে যা।

আমার কথা হালে পানি পায়নি। একা একাই পড়তে চলে গেল। তুলতুলির বয়স এখন ঊনত্রিশ। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান তার বাবা-মা। আমেরিকা প্রবাসী উপযুক্ত পাত্রের অভাব। লোকে যা একটু আগ্রহী হয়, বয়স শুনে পিছিয়ে যায়। বায়োডাটাতেই এত বয়স, আসলে না জানি কত!

এর মাঝেই ভাতিজি আমার বিছানায় পড়ে গেল। পিঠে অসম্ভব ব্যথা হয়। চলাচল করতে অসুবিধা। আজ খবর এলো মেরুদণ্ডের হাড়ে যক্ষা হয়েছে তুলতুলির। জীবনে শুনিনি এমন রোগের কথা।

আমার আদরের তুলতুলি! আমার মতোই নিঃসঙ্গ জীবনে নাম লেখাতে চলছে। নিজ-হাতে বড় করেছি ওকে। কখনও এতটুকু কষ্ট পেতে দিইনি। ওর মা-বাবার থেকে ওকে কম ভালোবাসিনি। বদদুআ দেবার প্রশ্নই আসে না! তবে কি বুকচেরা দীর্ঘনিঃশ্বাসও তাঁর দরবারে কবুল হয়ে যায়!

বুকটা খাঁখাঁ করছে। দুনিয়ায় আমার একমাত্র সঙ্গী এই ডায়েরিটা। নিজে থেকে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম। আজ উপচে-পড়া-দুঃখ সামলাতে না পেরে আবার হাতে তুলে নিলাম।

ও ঘর থেকে ভাবির আর্তনাদ ভেসে আসছে—'ও আল্লাহ, জীবনে তো কারও ক্ষতি করিনি! আমার মেয়েকেই কেন এত বড় বিপদ দিলে?'

সত্যিই? সত্যিই কারও ক্ষতি হয়নি? আমার অশ্রুভেজা ডায়েরি যে ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়![১]

---

[১] গল্পটির থিম Islamic Matrimony পেইজ থেকে নেওয়া। লিংক : https://bit.ly/2Y7ck8s.

Scanned with CamScanner

সত্যিকারের মনস্টার

আলী আব্দুল্লাহ

রুস্তম মমতা-মাখা চোখে তার নয় বছরের মেয়ে ফারিজার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। দেড় বছর আগেও যখন ছোট ছেলে ফাইয়াজের জন্মের সময় ফারিজার মা মারা গেল তখনও এতটুকু ছিল ফারিজা। স্ত্রীর মৃত্যুশোকে রুস্তম যখন কাঁদছিল ফারিজা তখন বাবার চোখ মুছে দিয়ে বলেছিল, 'কাঁদছ কেন বাবা? আম্মু তো আছেই। আকাশের ওপরে আছে। সেখানে গড আম্মুকে দেখে রাখবেন। তুমি চিন্তা কোরো না।'

মা-কে হারানোর পর ছোট্ট ফারিজা এই দেড় বছরে অনেক বড় হয়ে গেছে। ছোট ভাই ফাইয়াজকে খাওয়ানো, তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, তাকে আদর করা, তার দিকে খেয়াল রাখা—এই সব ফারিজাই করে। মেয়েটি এতটুকু বয়সে এগুলো কীভাবে করছে তাই ভেবে বিস্মিত হয় রুস্তম। দেশের চলমান যুদ্ধাবস্থায় নানা রকম দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতে হয় রুস্তমকে। তাই অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও নানান ঝামেলার কারণে মেয়েটিকে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। একটু আদরও করা হয় না তাকে। অবসর পেলে ছোট ছেলে ফাইয়াজকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে হয়। মা-মরা মেয়েটিরও তো কিছু আদর পাওনা আছে! রুস্তম আদর জড়ানো কণ্ঠে মেয়েকে ডাকে—'মা ফারিজা!'

'জি বাবা!'

Scanned with CamScanner

ফারিজা বাড়ন্ত চুলের ঝুঁটি দুটি দোলাতে দোলাতে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। রুস্তম বলে, 'একটি কবিতা শোনাও তো মা।'

'কী কবিতা শোনাব?'

'যেকোনো কবিতা; যেটি তোমার ইচ্ছে করে শোনাতে।'

ফারিজা তার কোমল হাতে চোখের সামনে চলে আসা বেয়াড়া কোকড়া চুলগুলো সরিয়ে নেয় আলতো করে। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে—বাবা কবিতা তো মনে করতে পারছি না। কী করি?'

'হুম। তাহলে একটি গল্প শুনিয়ে দাও।'

'গল্প? আচ্ছা, মনে করছি, একটু দাঁড়াও।'

ফারিজা আনমনা হয়ে গল্প মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু সাথে সাথেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'গল্প না বাবা একটি ছোট্ট ছড়া মনে পড়েছে। ইংরেজি ছড়া। সেটি শোনাই?'

'ঠিক আছে শোনাও।'

ফারিজা গলা পরিষ্কার করে মিষ্টি করে বলে—

The world is so full
Of a number of things,
I'm sure we should all
Be as happy as kings.

'বাহ! অসাধারণ হয়েছে তো। এই ছড়া তুমি কীভাবে শিখলে?'

'ইন্টারনেট থেকে পড়ে শিখেছি।'

'ইন্টারনেট থেকে আর কী কী শিখেছ?'

'অনেক কিছু শিখেছি বাবা। কবিতা শিখেছি গান শিখেছি, ধাঁ-ধাঁ শিখেছি।'

রুস্তম চোখ বড় বড় করে অবাক হবার ভঙ্গিতে বলে, 'তাই নাকি?'

Scanned with CamScanner

ফারিজা হাসি-মুখে 'হ্যাঁ'-সূচক মাথা নাড়ে।

ফারিজার চোখ চক চক করছে। বাবাকে মুগ্ধ হতে দেখে তারও আনন্দ হচ্ছে।

'ছড়াটি তোমার ভালো লেগেছে, বাবা?'

'অনেক ভালো লেগেছে মা।'

'থ্যাংক ইউ।'

রুস্তম মুচকি হাসে। ফারিজার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে,

'বলো তো বাবা, এটি কার লেখা?'

'আই গেস, এটি তুমি নিজেই লিখেছ?'

ফারিজা বাবার কথা শুনে হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়ছে। তার হাসি দেখে মনে হচ্ছে এমন কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি।

রুস্তম অবাক দৃষ্টিতে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কী সুন্দর হাসি! এই একটি হাসির জন্য সে পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে। রুস্তম শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি লেখনি মা?'

ফারিজা আবার এক গাল হেসে বলল, 'না বাবা। আমি কেন লিখতে যাব। ইন্টারনেট থেকে পড়ে শিখেছি বললাম না! এটি লিখেছেন রবার্ট লুইস স্টিভেন্সন। তাকে চেন বাবা?'

'না মা, চিনি না। কবি-সাহিত্যিক তেমন কাউকেই আমি চিনি না।'

'হুম। তোমার চেনার দরকারও নেই বাবা। তুমি তো সারাদিন বিমান নিয়ে উড়ে বেড়াও, পঁচা মানুষগুলোর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করো। তুমি আমার সুপারহিরো, বাবা।'

রুস্তম মিহি করে হাসল। ফারিজা বলল, 'বাবা জানো, তিনি একজন স্কটিশ কবি। অনেকদিন আগে বাচ্চাদের জন্য তিনি এই ছড়াটি লিখেছিলেন। আমার খুব প্রিয়।'

'ও আচ্ছা।'

Scanned with CamScanner

রুস্তমের চোখে পানি চলে আসছে। তার মেয়ে শুধু যে মায়াবতী হয়েছে তা-ই নয়; সে অসম্ভব বুদ্ধিমতীও। এইটুকুন বয়সে সে কেমন করে বড়দের মতো কথা বলছে! যে-ঘরে মা থাকে না সে-ঘরের মেয়েরা নাকি দ্রুত বড় হয়ে যায়। ফারিজার ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটছে?

'বাবা, একটি কথা জিজ্ঞেস করি?'

'বলো, মা। কী কথা?'

'তুমি প্লেন নিয়ে উড়ে উড়ে সুপারহিরোর মতো যাদের মারো ওই যে বড় বড় চুল দাড়িওয়ালা লোকগুলো—ওরা কি মানুষ, না মনস্টার?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় ওরা মনস্টার।'

'হ্যাঁ মা, ওরা পঁচা। মনস্টারের মতোই পঁচা'

'আচ্ছা বাবা, মনস্টার যেমন মানুষের রক্ত খায় ওরাও কি সে-রকম খায়? ওরা কি আমাদের সামনে পেলে আমাদের রক্ত খেয়ে ফেলবে।'

রুস্তম এইবার হাসি আটকে রাখতে পারল না। একগাল হেসে বলল, 'কেন মা? তুমি ভয় পাচ্ছ? ভয় পেয়ো না। ওরা কিছুই করতে পারবে না। আমি ওদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছি।'

ফারিজা খুশিতে হাতে তালি দেয়। 'ভালো করেছ, বাবা। মেরে ওদের একদম তক্তা বানিয়ে দেবে।'

ফারিজা হাসছে। প্রাণ খুলে হাসছে। মেরে তক্তা বানানোর ব্যাপারটায় সে খুব মজা পেয়েছে। সে বাবাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন শোবার ঘর থেকে ফাইয়াজের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। ফারিজা জিভে কামড় দিয়ে বলল, 'ইশ! ফাইয়াজকে ফিডারে দুধ দিয়ে আসতে ভুলে গেছি। আমি এখন যাই বাবা। ফাইয়াজকে খাওয়ানোর পর আমি একটু ট্যাব দেখব।'

'ট্যাবে কী দেখবে?'

'ইউটিউবে স্টার ওয়ার্স-এর ফ্যান ফিকশন কার্টুন আছে। তাই দেখব।'

Scanned with CamScanner

রুস্তম হাসিমুখে অনুমতি-সূচক মাথা নাড়ল। বাবার অনুমতি পেয়ে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ফারিজা। রুস্তম তার শরীর চেয়ারে এলিয়ে দিল। সে খুবই পরিশ্রান্ত। তার বিশ্রামের দরকার। তবে মেয়েটার সাথে কথা বলে অনেকটাই ভালো লাগছে। সতেজ লাগছে। গত দুদিনে বেশ ধকল গেছে। পুরো মিশনে রুস্তমই ছিল সব থেকে বেশি তৎপর। আজ আর আগামীকাল তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

এই বিশ্রামের সময়গুলোতে রুস্তমের সব থেকে বেশি যে ব্যাপারটা খারাপ লাগে, তা হলো, তার হাতে কোনো কাজ থাকে না। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় বসে পার করে দেয়। ইচ্ছে করলে অফিসের কলিগদের সাথে কথা বলা যায়। অফিসে গিয়ে ঘুরে আসা যায়; কিন্তু রুস্তম তা করে না। ছুটির দিনে সে অফিসের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে। ঘরের সময়টুকু সে ঘরেই ব্যয় করতে পছন্দ করে। এখন অবশ্য বেশ একা লাগছে, একটি টেলিভিশন থাকলেও দেখা যেত। রুস্তমের ঘরে টেলিভিশন নেই। এই যুদ্ধাবস্থায় তাদের অনেক কিছু করা নিষেধ। যেমন—টেলিভিশন দেখা নিষেধ, ইন্টারনেটে ইউটিউব ব্রাউজ করা নিষেধ। অনেক সাইট সরকার বন্ধ করে রেখেছে। তাদের ভালোর জন্যই করা হয়েছে এবং রুস্তম সরকারের নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত সম্মান করে। যেসব বিধি-নিষেধ তাদের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলোকে সে খুবই যৌক্তিক বলেই মনে করে।

সে তার দেশের প্রতি, তার প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগত এবং সে তার প্রেসিডেন্টের কথা মেনে চলাকে তার ধর্মের অংশ মনে করে। তাদের দেশ-প্রধানের প্রতি তার ভক্তি অসীম; কিন্তু এরপরেও রুস্তম একটি ছোট্ট অন্যায় করে ফেলেছে। সে একটি ছোট্ট নিয়ম ভঙ্গ করেছে। আর এটি সে করেছে ফারিজার জন্য। ইউটিউব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কায়দা করে সে ফারিজার ট্যাবে ইউটিউব দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও এটি অন্যায়; কিন্তু ইউটিউব দারুণ পছন্দ মেয়েটির। মেয়ের জন্য এই ছোট্ট অন্যায়টুকু সে করেছে এবং এই এটি করে তার ভালো লাগছে।

রুস্তমের অফিসের বিশেষ মোবাইলটি বেজে উঠল। ছুটির দিন রুস্তম ঘরের ল্যান্ড ফোনের লাইন খুলে রাখে। নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল বন্ধ রাখে। যাতে কেউ তাকে বিরক্ত করতে না পারে। কিন্তু এখন যে মোবাইলটি অনবরত বেজে চলছে এই মোবাইলটি বন্ধ করে রাখার ক্ষমতা রুস্তমের নেই। এটি বিশেষ একটি মোবাইল। এই মোবাইলে শুধু দু-একজন বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেউ-ই ফোন করে না এবং তারাও ফোন করেন বিশেষ বিশেষ কারণে। ছুটির দিনে এই ফোনের রিং বাজা একটি আতংকের

Scanned with CamScanner

ব্যাপার। যেকোনো সময় বলা হতে পারে—ছুটি শেষ, বিমান বন্দরে চলে আসো।'

রুস্তম আলতো করে মোবাইলটি কানে ধরল।

'হ্যালো।'

'হাই রুস্তম, কেমন আছ?'

জেনারেল ফাহদ জাসিম ফোন করেছেন। নিশ্চই অত্যন্ত জরুরী কোনো বিষয়। হয়তো এখনই তাকে অফিসে যেতে হতে পারে। রুস্তম সোজা হয়ে বসল। শান্ত গলায় বলল, 'জি স্যার। ভালো আছি।'

'ছুটি কেমন কাটছে তোমার?'

'জি স্যার। ভালো।'

'গুড। শোনো রুস্তম, তোমার জন্য গুড নিউজ আছে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ স্বয়ং তার সাথে কথা বলবেন! অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার। উত্তেজনায় রুস্তম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যদিও ফোনে ওপাশ থেকে প্রেসিডেন্ট তাকে দেখছেন না। তারপরও এরকম মানুষের সাথে আয়েশ করে বসে কথা বলা যায় না। রুস্তম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। ফোনের ওপাশ থেকে মিহি একটি গলা ভেসে এলো, 'হাউ আর ইউ রুস্তম?'

'ফাইন স্যার। হাউ আর ইউ?'

'আই এম গুড। লিসেন, লাস্ট দিন গৌতায় তুমি যে পারফরমেন্স দেখিয়েছ এর জন্য উই আর প্রাউড অব ইউ। তোমার জন্য বিশেষ কিছু পুরস্কার আছে। টক টু ইউর সিনিয়র। সে তোমাকে ডিটেইল জানিয়ে দেবে।'

'ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।'

'বেস্ট অফ লাক।'

Scanned with CamScanner

গত দুদিন রুস্তম গৌতায় এয়ার রেইড দিয়েছে এবং বরাবরের মতোই সে তার মিশন সব থেকে সফলভাবে এবং কম সময়ে সম্পন্ন করেছে। গৌতায় কেমিকেল ওয়েপন ব্যবহার করে ম্যাস ডিস্ট্রাকশন চালানো হয়েছে। আশা করা যায়, আলেপ্পোর মতো গৌতাও খুব তাড়াতাড়ি তাদের কুক্ষিগত হবে। জেনারেল ফাহদ জেসিম ফোন নিয়ে বললেন, 'রুস্তম শোনো, প্রেসিডেন্ট তোমার ওপরে অনেক খুশি। এই জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি তোমার সাথে কথা বললেন। তুমি তো জানো, তিনি কারও সাথে এভাবে কখনও কথা বলেন না।'

'জি স্যার, আমি জানি।'

'শোনো, একটি বিগ এমাউন্ট অফ মানি তোমাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। তবে এমাউন্টটি এখন বলব না। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারো। ছুটি কাটিয়ে অফিসে আসো, তখন বলব।'

জেনারেল কথাটি বলে বেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার রসিকতা করে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। রুস্তম বলল, 'ইয়েস স্যার। এসেই শুনব।'

জেনারেল ফাহদ হাসিমাখা মুখে বললেন, 'তোমার জন্য আরও একটি সুসংবাদ আছে। একটি ছুটির ব্যবস্থা করেছি আমি তোমার জন্য। আগামী মাসে তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে দেশের বাইরে ঘুরে আসতে পারবে। তোমার ওপর থেকে দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিচ্ছি আগামী মাসে। এটি আমার পক্ষ থেকে উপহার।'

রুস্তমের মন ভালো হয়ে গেছে। মেয়েটিকে নিয়ে সে সুইজারল্যান্ড দেখতে যাবে। যুদ্ধ-বিদ্রোহে এই মা-মরা মেয়েটিকে কোথাও সে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেনি কোনো আনন্দ দিতে পারেনি। রুস্তম শক্ত মানুষ, চোখে তার সহজে পানি আসে না। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে চোখ ভিজে যাবে। সে তার জেনারেলের প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে। রুস্তম আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল, 'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'ইউ আর ওয়ান অব আওয়ার বেস্ট হ্যান্ড। আমরা তোমাকে আরও অনেকদিন সার্ভিসে চাই, রুস্তম। ঠিক আছে রাখছি। টেইক গুড কেয়ার অব ইউর সেলফ।'

'ইয়েস স্যার।'

জেনারেল ফাহদ কল কেটে দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

রুস্তমের আনন্দ হচ্ছে। তার রীতিমতো উল্লাস করতে ইচ্ছে করছে। সম্ভব হলে সে এখন একটি লাফ দিত। বয়স হয়েছে এবং বয়স তার লাফ-ঝাঁপ নিয়ন্ত্রণ করছে। আনন্দ এমন একটি বিষয়—যা একা উপভোগ করা যায় না। আনন্দ উপভোগ করতে হয় সবাইকে নিয়ে। তাহলে আনন্দ বাড়ে। আর রুস্তমের সবাই বলতে তার মেয়ে ফারিজা আর তার দেড় বছরের ছেলে ফাইয়াজ। ফারিজা নিশ্চয়ই তার ঘরে বসে ইউটিউব দেখছে। রুস্তম ধীর পায়ে ফারিজার ঘরে প্রবেশ করে। ফাইয়াজ বিছানায় শুয়ে দুই আঙুল মুখে দিয়ে খেলছে। তার পাশে উবু হয়ে শুয়ে ট্যাব দেখছে ফারিজা। রুস্তম মায়া জড়ানো গলায় ডাকছে, 'ফারিজা।'

ফারিজা ঘুরে বাবাকে দেখে। তার মুখ মলিন। চোখে পানি।

রুস্তমের বুক ধক করে ওঠে। মেয়ের মলিন মুখ তার মোটেও ভালো লাগে না। একটু আগেও মেয়েটি হাসিমুখে কথা বলেছে। এখনই মুখ এত মলিন করে বসে আছে কেন। রুস্তম জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মা? তুমি কি কাঁদছিলে?'

ফারিজা কথার জবাব না দিয়ে উঠে বসল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'বাবা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি।'

'করো মা।'

'বাবা, তুমি তো প্লেইন নিয়ে উড়ে উড়ে সব খারাপ মানুষ আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও আর মনস্টারগুলোকে মেরে ফেল—যাতে সব ভালো মানুষ আনন্দে থাকতে পারে, তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ মা। যাতে করে তুমি-আমি-আমরা সবাই একসাথে আনন্দে থাকতে পারি।'

'আচ্ছা বাবা, সেদিন তো গৌতায় খারাপ মানুষদের মারতে তুমিও গিয়েছিলে, তাই না?'

রুস্তমের ভ্রু কুঞ্চিত হয়। মেয়ে এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছে। রুস্তম নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, 'কেন মা, কী হয়েছে বল তো?'

'কিছু হয়নি বাবা। গৌতার খারাপ মানুষ তাড়াতে বিমান নিয়ে তুমিও গিয়েছিলে না?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

Scanned with CamScanner

'ওদের সবার ওপরে তোমরা কেমিকেল ওয়েপন ব্যবহার করেছ, ঠিক বলছি না, বাবা?'

রুস্তম বিরক্ত হচ্ছে। সে বিরক্ত মাখা গলায় বলল, 'তোমার এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই ফারিজা।'

ফারিজা চিৎকার করে বলল, 'আছে বাবা, অবশ্যই আছে।'

রুস্তম অবাক হয়ে তার মেয়েকে দেখছে। মেয়ের চোখ টকটকে লাল। এই প্রথম ফারিজার দিকে তাকাতে রুস্তমের ভয় লাগছে। সে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

ফারিজা তার ট্যাবটি রুস্তমের দিকে এগিয়ে দিল। রুস্তম দেখল ফারিজার বয়সী একজন ছোট্ট মেয়ের ছবি। যার কোলে ঠিক তার ফাইয়াজের বয়সী একজন ছেলেশিশু। শিশুটির মুখে মেয়েটি একটি অক্সিজেন মাস্ক চেপে ধরে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে—উদ্ভ্রান্ত।

রুস্তমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল—কী হয়েছে। ফারিজাকে সে যুদ্ধের স্পর্শকাতর খবরগুলো থেকে সবসময় আলাদা রাখতে চেয়েছে। তা আর সম্ভব হলো না। রুস্তমের এখন খুব ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি এই ছবি আমাকে দেখাচ্ছ কেন?'

'বাবা, শোনো এই কিশোরী বোনটি তার শিশু ভাইটিকে কোলে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে চুপচাপ মরে গেছে। তখনও কিন্তু গ্যাস মাস্কটি ভাইয়ের মুখে ধরা ছিল, যাতে ভাইটি অন্তত বেঁচে যায়। কোমল বোনটি মারা যাবে জেনেও অক্সিজেন নলটি নিজে না নিয়ে তার ভাইকে লাগিয়ে রেখেছিল। এমনকি মরার পরেও ঠিক একইভাবে ধরে রাখা ছিল। বাবা, এই শিশু মেয়েটিও কি খারাপ মানুষ? এরাও কি মনস্টার?'

রুস্তম কিছু বলল না। ফারিজা বলল, 'তোমরা গৌতায় বম্বিং করে খারাপ মানুষদের তাড়াওনি; বরং হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু-কিশোরকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছ, বাবা। আমি সব দেখেছি। তোমাদের অন্যায় আমি দেখেছি।'

'ফারিজা শান্ত হও।'

Scanned with CamScanner

ফারিজা শান্ত হচ্ছে না। সে আরও উত্তেজিত হচ্ছে। তার চোখ এখন রক্তিমবর্ণ। সে আবার বলল, 'বাবা, তোমরা তো হত্যাকারী—খুনি। যুদ্ধের নামে তোমরা হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছ। খারাপ মানুষ মনস্টারদের মারার কথা বলে তোমারা নিষ্পাপ বাবুদের মেরে ফেলছ। তুমি মেরে ফেলেছ বাবা। আমরা যদি গৌতায় থাকতাম—তাহলে তুমি আমাদেরও মেরে ফেলতে বাবা। কি বাবা, আমাদেরও মেরে ফেলতে না?'

'চুপ করো ফারিজা।'

'না, আমি চুপ করব না।'

রুস্তম ফারিজাকে নিজের কাছে নিয়ে আদর করে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ফারিজা সাথে সাথে চিৎকার করে বলল, 'না বাবা। সাবধান! তুমি আমাকে ছোঁবে না। তোমার হাতে রক্ত! তোমার হাতে রক্ত!!'

রুস্তমের অসহায় লাগছে। এই প্রথম তার চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সে অসহায়ের মতো বলল, 'মা, এমন কেন করছ? আমার হাতে কোনো রক্ত নেই মা, দেখো।'

'আছে বাবা। ওই যে রক্ত তোমার দু'হাত-ভর্তি রক্ত! কী বাজে গন্ধ আসছে তোমার হাত থেকে। এই হাত দিয়ে তুমি আমাকে ছোঁবে না বাবা। যদি তুমি আমাকে ছোঁও তাহলে আমি এই জানালা দিয়ে নিচে লাফ দেবো।'

এই কথা বলেই ফারিজা জানালা খুলে তার ওপরে দাঁড়িয়ে গেল। বারো তলার জানালা খোলার সাথে সাথে বাইরের লূ-হাওয়া রুস্তমের গা ছুঁয়ে গেল। সাথে সাথে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল রুস্তমের। কী হচ্ছে এসব! ফারিজাকে না ধরতে পারলে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। রুস্তম কৌশল অবলম্বন করে ফারিজার দিকে এগিয়ে গেল। যাতে মোক্ষম সময়ে তাকে ধরে জানালা দিয়ে নিরাপদে নামিয়ে আনা যায়। রুস্তম ফারিজাকে জিজ্ঞেস করল, 'ফারিজা, এসব তুমি কী করছ?'

ফারিজা জানালার ওপরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যা আমার করা উচিত তাই করছি বাবা। তোমার হাতে লেগে আছে হাজার হাজার শিশুর রক্ত! আমি আর সহ্য করতে পারছি না, বাবা।'

'ফারিজা, পাগলামি করো না। জানালা থেকে নেমে এসো মা। নেমে এসো বলছি।'

Scanned with CamScanner

'না, বাবা। আমি তোমার সাথে আর থাকব না। তুমি আমার সুপারহিরো না। তুমি একজন খারাপ মানুষ। প্রচণ্ড খারাপ মানুষ তুমি! তুমি যাদের মারো তারা মনস্টার না বাবা। তুমি মনস্টার! তোমরা সবাই মনস্টার! আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

ফারিজা চোখ বন্ধ করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, সে এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে। চোখ খোলা অবস্থায় নিচের পিচঢালা রাস্তা চোখে পড়েছিল। সেখানে চলন্ত গাড়িগুলো পিঁপড়ের মতো লাগছিল। এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু গরম একটি হাওয়া এসে ফারিজার গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ফারিজার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। এখন শুধু ছোটভাই ফাইয়াজের কথাই মনে পড়ছে। সে না থাকলে ফাইয়াজকে কে দেখবে। ফাইয়াজ একা হয়ে যাবে। ফারিজা তার দু'হাত প্রসারিত করে। কেন জানি তার মনে হয় দু'হাত ডানার মতো মেলে লাফিয়ে পড়লে সে পাখিদের মতো করে উড়তে পারবে। ফারিজার মন হঠাৎ ভালো হয়ে যায়। সে শুনতে পায় রুস্তম তাকে ডাকছে। ফাইয়াজ কাঁদছে। এখন আর কিছু যায় আসে না। ফারিজা ডানা মেলে উড়তে চায়। সে প্রস্তুত। সে আজ আকাশ ছুঁয়ে দেখবে।

Scanned with CamScanner

মায়ের দুআ

নুসরাত জাহান

[এক]

আমার ভাইয়া তখন চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে সেনা-ট্রেনিং নিচ্ছে। ট্রেনিং চলাকালে একদিন সে চোখে আঘাত পায়। আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, ডাক্তারগণ আশংকা করেন, আঘাতপ্রাপ্ত চোখটি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে; কিংবা অন্তত বাকি জীবন খুব পাওয়ারফুল চশমা পরে থাকতে হবে।

তখন মোবাইল ফোন সহজলভ্য ছিল না। সহায় ছিল হাতে লেখা চিঠি; নয়তো মেঝ-মামার অফিসের ল্যান্ড ফোন।

ভাইয়ার এ দুর্ঘটনার খবর মামা আমার মাকে জানান দুই দিন পরে। কারণ একটাই— মা ব্লাড প্রেশারের রোগী। তাছাড়া ভাইয়াই স্বামীহারা বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। কাজেই আকস্মিক এই দুর্ঘটনা ও মানসিক আঘাত সহ্য করা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়তে পারে। এদিকে লক্ষ্য করেই মামা মাকে ভাইয়ার দুর্ঘটনার খবর দেননি।

যা-ই হোক মা যেদিন দুর্ঘটনার খবর জানতে পারেন, সেদিনই চিটাগাঙের উদ্দেশ্যে ট্রেনের টিকিট কাটেন। পরদিন ভোরে ট্রেন। গভীর রাতে বিড়বিড় শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দেখি, মা জায়নামাযে সিজদারত। অঝোরে কেঁদে চলেছেন আর নিজের সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল

Scanned with CamScanner

আলামীনের কাছে ভাইয়ার সুস্থতা চাইছেন। এত বেশি কেঁদেছেন যে, তার চোখ দুটো একেবারে ফুলে গেছে। সেদিন, কেন জানি মনে হচ্ছিল, ভাইয়ার কিছু হবে না। ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

হলোও তাই। পরবর্তী সময়ে ভাইয়ার চোখ খুব ভালোভাবে রিকোভার করে। সুস্থ হওয়ার পর তাকে একদিনও চশমা পরতে হয়নি। আলহামদু লিল্লাহ।

[দুই]

সেদিন সোমবার জাওয়াদ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় মারাত্মক আঘাত পায়। এরপর সিভিয়ার লেভেলের হেড ইনজুরির বেশ কয়েকটি সিম্পটম দেখা দেয়। তাই অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দ্রুত ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাথে ওর বাবাও যায়। আমি যেতে পারিনি। কোলে পাঁচ মাসের শিশুসন্তান আর সাথে সাড়ে তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি। স্ট্রেচারে করে জাওয়াদকে নিয়ে যেতে দেখছি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে জাওয়াদের আব্বু ফোন করে জানায়, জাওয়াদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। ও কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। অনেকটা কোমায় চলে যাওয়া রোগীর মতো। চোখ খুলছে না কিছুতেই! দশ থেকে বারোজন ডাক্তার-নার্স জাওয়াদকে ঘিরে পর্যবেক্ষণ করছে। ব্রেইনে ইন্টারনাল ব্লিডিং টাইপের সিরিয়াস কিছুর আশংকা করা হচ্ছে। এমন হয়ে থাকলে ওকে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হতে পারে। আপাতত ডাক্তাররা সিটি স্ক্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুমি দুআ করো। তুমি তো মা। আর মায়ের দুআ তিরের বেগে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। সুতরাং, তুমি দুআ করো, জাওয়াদের রিপোর্ট যেন ভালো আসে। ওটার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে জাওয়াদের আব্বুর গলা ধরে আসে। শেষ কথাটা বলার সময় অবাধ্য কান্নারা তাকে পরাস্ত করে ফেলে। অস্ফুট আওয়াজে সালাম দিয়ে তিনি কোনো রকম ফোন রেখে দেন।

আমি বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে সালাতে দাঁড়াই। সেদিন ভাইয়ার জন্য মায়ের দুআর কথা খুব করে মনে পড়তে থাকে। আমি সিজদায় গিয়ে অঝোরে কাঁদি আর বলি—

'ইয়া রাহমানুর রাহীম, একজন মায়ের ডাকে আপনি কীভাবে সাড়া দেন, একজন অসহায় মায়ের দুআ আপনি কত দ্রুত কবুল করেন, কত মমতায় আপনি একজন নিরুপায় মায়ের দুঃখকে সুখে পরিণত করেন—তা আমি নিজ চোখে দেখেছি।'

Scanned with CamScanner

ইয়া আল্লাহ, আজ আমিও এক অসহায় মা। অবনত মস্তকে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আমার সন্তানের মুখে আপনি ভাষা দেননি। জন্মসূত্রেই সে অপূর্ণাঙ্গ। আমরা আপনার সিদ্ধান্তকে সর্বোত্তম মনে করেছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। অতএব, আপনি ভালো মনে করলে আমার জাওয়াদকে সুস্থ করে আমার কোলে ফিরিয়ে দিন। আর যদি আপনি এর চেয়ে উত্তম কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন; তবে সেটা আমাদের জন্য আপাত কষ্টকর হলেও আমরা তাতে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করব। আপনি আমাদের তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই আপনার পরিকল্পনা অনুসারেই আমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হই।'

সিজদা থেকে উঠে সালাত শেষ করে চুপচাপ বসে আছি। কিছুক্ষণ পরে হাজব্যান্ডের ফোন আসে। জাওয়াদের বাবা খুশিতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'তোমার দুআ কবুল হয়েছে। জাওয়াদ চোখ খুলেছে। আমাকে দেখছে। আল্লাহু আকবর! ডাক্তার-নার্স—সবাই দৌড়ে চলে এসেছে।'

অতি উত্তেজনায় ফোনটি তিনি একজন নার্সকে ধরিয়ে দেন। নার্স উচ্ছ্বাসের সাথে আমাকে বলে, 'মেম চিন্তা করবেন না। জাওয়াদ চোখ খুলেছে। আমাদের সবাইকে দেখছে। হোপফুলি হি উইল বি ফাইন সুন।'

তৎক্ষণাৎ আমি মহান আল্লাহকে শুকরিয়া জানানোর জন্য দ্বিতীয়বার সালাতে দাঁড়ালাম। এবার সিজদায় আর কিছুই বলতে পারছিলাম না। তবে আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার অব্যক্ত কথাগুলো বুঝে নিয়েছেন। জাওয়াদকে তিনি বিপদমুক্ত করে আমাদের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ।

জাওয়াদকে আজ বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, ওর মাথায় যে-ফ্র্যাকচার হয়েছে, তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনি জোড়া লেগে যাবে। আপাতত ভয়ের কিছু নেই, ইন শা আল্লাহ।

আমার কাছে আমার এবং আমার মায়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা দুটি মায়ের একনিষ্ঠ দুআ কবুল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

Scanned with CamScanner

আঁধার মাঝে আলোর পরশ!

সিহিন্তা শরীফা

[এক]

রাত তখন দশটা। বেডসাইড টেবিলের ওপরে মুঠোফোনটা রাখা। রিংটোন বেজেই চলছে একটানা। বিছানায় একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল সিয়াম। মোবাইলের রিংটোনের শব্দে কানে জ্বালা ধরে গেছে। এমন মধুর ঘুমের সময়ে ফোন করে কাউকে মানুষ জ্বালাতন করে? একপ্রকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ বন্ধ অবস্থায় মোবাইলটার দিকে হাত বাড়াল সে। হাতে লেগে সেটা ধপাস করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। কুড়িয়ে নিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে সময় দেখে নিল সিয়াম।

সময়টাকে ঠিক 'মধ্যরাত' বলা চলে না। তবে, একেবারে যে সন্ধ্যে তা-ও না। এ-দুইয়ের মাঝামাঝি। এমন সময়ে সিয়াম সাধারণত বাসায় থাকে না। থাকলেও ঘুমায় না অন্তত। আজ যে কী মনে করে বাসায় এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছে—তা আর এখন মনে নেই তার। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই চোখভাঙা ঘুম নেমেছিল।

ফোনটা আবারও বাজতে শুরু করেছে। ফোনের রিংটোনে সেট করা গানটা সিয়ামের খুব পছন্দের হলেও এই ঘুম ঘুম অবস্থায় সেটাও শুনতে বিরক্ত লাগছে তার। সাকিবের ফোন।

'দোস্ত কই তুই?'

'আছি, কেন কী হয়েছে?' বিরক্ত গলায় বলল সিয়াম।

Scanned with CamScanner

'সেই কখন থেকেই ফোন দিচ্ছিলাম। কোথায় ছিলি?'

'ঘুমোচ্ছিলাম'। ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিল সিয়াম।

'বাহ! স্যারের দেখছি নতুন অভ্যাস হয়েছে! নিশাচর পাখি তুমি ভুলে বেমালুম! দিনের বদলে তুমি রাতে দাও ঘুম!'—অনেকটা কৌতুক করেই বলল সাকিব।

'এত কথা না বলে কী বলবি তাড়াতাড়ি বল।'

'আড্ডা দিবি না আজ?'

'নাহ।'

'কেন?'

'আমার আপু এসেছে আজ। থাকবে কয়েকদিন। এই কয়েকদিন রাতে বাইরে বেরোনো যাবে না।'

'যাব্বাবাহ! তুমি বাপু এত ভালো ছেলে হলে কবে থেকে?'

সাকিবের শেষ কথাটার কোনো জবাব দেয় না সিয়াম। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে বিছানায় উঠে বসে। অন্ধকার ঘর। সে চাইলেই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে পারে। তবুও আজ তার বাইরে যেতে মন চাচ্ছে না। কেন চাচ্ছে না—কে জানে! এটা কি আপুর প্রতি তার শৈশব-কৈশোরের শ্রদ্ধার জন্যে? বড় বোনের যে আদর-মমতা, শাসন আর ভালোবাসা সে পেয়ে এসেছিল, সেই সম্মানের তাগিদে? সিয়াম জানে না। আপু বিয়ের পর দেশের বাইরে চলে যায়। এরপর থেকেই সময়ের সাথে সাথে ভাই-বোনের সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। এখন কেন যেন চাইলেও আর আগের মতো আপুর সাথে সহজ হতে পারে না সে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ল্যাপটপটা নিয়ে বসল সিয়াম। ফেইসবুকে আসতেই রাইয়ানকে একটিভ পাওয়া গেল। সাথে সাথেই ম্যাসেজ দিল রাইয়ান।

'আছিস?'

'হু।'

'কী করছিস?'

Scanned with CamScanner

'ঘুম আসছে না। এমনি জেগে বসে আছি।'

'সাকিব নাকি ফোনে পাচ্ছে না তোকে। তোর বাসায় যেতে চাচ্ছিলাম আমরা।'

'এত রাতে আসা লাগবে না তোদের। সাকিবের সাথে কথা হয়েছে আমার। আপু দেশে এসেছে। কয়েকদিন থাকবে এখানে।'

'ওহ! তাহলে চল ডটা খেলি। আমারও ঘুম চলে গেছে।'

'ওকে।' সিগারেটটা ফেলে হেডফোন তুলে নিল সে।

[দুই]

'সিয়াম কোথায়, মা?' নাশতার টেবিলে ভাইকে না দেখে জানতে চাইল সীমা।

'ঘুমাচ্ছে।'

'এখনও? এত বেলা অবধি কেউ ঘুমায়? বেশ বদ-অভ্যাস বাঁধিয়েছে তো তোমার ছেলে। দাঁড়াও, ডেকে তুলছি আমি।'

'আহহা! কই আর বেলা হলো? ছুটির দিন আজ। তাই হয়তো একটু বেশি ঘুমোচ্ছে। তুই আর ওকে জ্বালাতন করতে যাস না। তুই খেয়ে নে।'

'অদ্ভুত! ছুটির দিন বলে কি দিনের বারোটা অবধি ঘুমানো লাগবে? ছুটির দিনে কত কাজ করা যায় জানো? অন্তত পুরো সপ্তাহের পড়াগুলো তো রিভাইস করা যায়। আজকালকার ছেলেরা পড়াশোনায় এত ফাঁকিবাজ হয়েছে না! দাঁড়াও, ওকে আমি এক্ষুনি তুলে আনছি। কতদিন পর বাড়ি এলাম। ভাই-বোন মিলে একসাথে একটু নাশতাও করব না?'- বলতে বলতে সিয়ামের ঘরের দিকে হাঁটা ধরল সীমা। অনেকক্ষণ দরজায় নক করল; কিন্তু না, সিয়ামের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। বেঘোরে ঘুমোচ্ছে সে।

'মা, সিয়ামের ব্যাপারে কিছু জানার ছিল।' - চা খেতে খেতে বলল সীমা।

'বল।'

'তার ব্যাপারে কি যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখছ তোমরা?'

Scanned with CamScanner

সীমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন তার মা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম খোঁজ-খবর?'

'এই তো, ও কার সাথে মিশছে, নিয়মিত ক্লাসে যায় কি না, পড়াশোনা কেমন চলছে তার।'

'তোর হঠাৎ এমন অদ্ভুত প্রশ্ন মাথায় এলো কেন, বল তো?'

প্রশ্নগুলো খুব যে অদ্ভুত—তা নয়। একজন বড় বোন তার ভাইয়ের পড়াশোনা ও চলাফেরা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই পারে। মায়ের কাছে সীমার প্রশ্নগুলো অদ্ভুত ঠেকল কেন—সে ব্যাপারে অবশ্য সে মাথা ঘামাল না। বলল, 'সিয়ামের চাল-চলন আমার খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

তার মা নিজের জন্য কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'যা বলতে চাইছিস স্পষ্ট করে বলে ফেল।'

সীমা এবার বলেই ফেলল, 'আমার কি মনে হয় মা, সিয়াম সম্ভবত নেশা-টেশা করা শুরু করেছে।'

মিসেস নুসরাত, অর্থাৎ সীমার মায়ের তো পারলে হেঁচকি উঠে যায়। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হলেন বলে মনে হচ্ছে। মুখের কাছ থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে বললেন, 'কি যা-তা বলছিস বল তো?'

'যা-তা বলছি না মা। আমার ঘোর সন্দেহ হচ্ছে। গতকাল রাতে ওর সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ওর চোখগুলোর দিকে কখনও তাকিয়েছ? রক্তজবা ফুলের মতোন লাল টকটকে। দেখে তো আমার ভয়-ই লাগল।'

নুসরাতের মনে হচ্ছে তার মেয়ে এখন বাড়াবাড়ি ধরনের কথা বলছে। বাচ্চা একটা ছেলের ব্যাপারে যা নয় তা-ই বলে যাচ্ছে সে। চোখ লাল হওয়ার অর্থই কি সে নেশাগ্রস্ত? রাতজেগে পড়াশোনা করলেও তো চোখ লাল হয়। ঘুমের সমস্যা হলেও চোখ লাল হতে পারে। কত কারণেই মানুষের চোখ লাল হয়; কিন্তু না, তার মেয়েটার নাকি ঘোর সন্দেহ হচ্ছে তার ভাই নেশা-টেশা করা আরম্ভ করেছে। যত্তোসব! মন চাচ্ছে মেয়েটাকে দু'চারটে কথা শোনাতে; কিন্তু শোনালেন না। কতদিন পর বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। মেয়ের প্রতি অনেকটা দয়াবশতই চুপসে গেলেন নুসরাত। নরম স্বরে, স্বাভাবিক গলায় বললেন,

Scanned with CamScanner

'তুই যে-রকম ভাবছিস ব্যাপারটা তা নয়। ক্লাস না থাকলে তোর ভাই তো বাসা থেকেই বের হয় না। মাঝে মাঝে তার বন্ধুরা আসে। তাদের সাথে রাতভর আড্ডা দেয়। কখনও বাসায়, কখনও ছাদে। কম্পিউটারে গেইমস খেলে, গান-বাজনা করে, এই তো। এতে তো সমস্যা দেখি না কোনো।' টেবিল থেকে প্লেইটগুলো তুলতে তুলতে বললেন মিসেস নুসরাত।

'সমস্যা তো এখানেই মা। তোমরা মায়েরা ছেলেদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করো। তোমাদের চোখে ওরা সব সময় ভালো, ওদের যে-কোনো খারাপ কাজ চোখের সামনে পড়লেও তোমরা অজুহাত খাড়া করে ফেল। একজন টগবগে যুবক সারাক্ষণ ঘরের দরজা লাগিয়ে বসে থাকে। তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে মা, যে ও বন্ধুদের নিয়ে শুধু গেইমস খেলছে, নেশা করছে না? চোখ দুটো কেমন লাল হয়ে থাকে, খেয়াল করেছ? কী ধরনের গেইম খেলে, দেখেছ কখনও? জানো, একা একা ইন্টারনেটে কত নোংরা জিনিস দেখে এই বয়সী ছেলেরা?' অনেকটা উত্তেজিত গলায় বলে গেল সীমা।

'এসব কী বলছিস তুই!'

'মা, তুমি ওর মধ্যে আচরণগত পরিবর্তনগুলো খেয়াল করোনি? আগে তো আমার ভাইটা এমন ছিল না! ঘরের দেওয়ালে লাগানো পোস্টারটাই দেখো না, কী ভয়ংকর একটা ছবি!' চায়ে শেষ চুমুক দেয় সীমা।

'আমার ফুলের মতোন ছেলেটাকে তুই শুধু শুধু সন্দেহ করছিস সীমা! ছেলে আমার এতটা বেয়াড়া হয়নি যে, তার বদ-অভ্যাস আমার চোখ এড়াবে। যাহোক, তোর মুখে আর এসব কথা শুনতে চাই না আমি'—নাশতার টেবিল থেকে উঠে যেতে যেতে কথাগুলো মেয়ের দিকে প্রায় ছুড়ে দিলেন তিনি।

মায়ের এমন আচরণকে কোন অভিধায় ফেলবে সীমা? নির্লিপ্ততা? ঔদাসীন্য? নাকি কেবলই ছেলের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহের অবাধ আস্কারা? ভেবে কূল পায় না সে।

[তিন]

হ্যাঁ। সীমাকে অনেকটাই সম্মান করে সিয়াম। সম্মানটা বড় বোনের জন্য ছোট ভাইয়ের; কিন্তু তাই বলে ভাইয়ের ওপর এহেন কর্তৃত্ব খাটাতে আসাটা নিতান্তই বাতুলতা বৈকি' - ভাবল সে। সীমার সমসাময়িক কর্মকাণ্ডে সিয়াম যেমন বিরক্ত,

Scanned with CamScanner

তেমনই বিস্মিত। বলা-কওয়া ছাড়াই সেদিন রুমে ঢুকে পড়ে সীমা। সিয়াম তখন কানে হেডফোন লাগিয়ে কম্পিউটারে গেইম অফ থ্রোনসে নিমগ্ন। আপুকে আসতে দেখেই সেদিকে মুখ তুলে তাকায় সে।

সীমা ওর পাশে এসে বসল। বলল, 'তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলো।'

ভাইয়ের বিগড়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে ঘোরতর সন্দেহ সীমা করছিল সেটা আর মুখ ফুটে বলতে পারে না সে। কেবল সন্দেহের বশেই তো কাউকে আর জেরা করা যায় না। তাও, ইনিয়ে-বিনিয়ে মূল ব্যাপারটা যতটা বলে ফেলা যায় আর কি!

সীমা বলল, 'তোদের কলেজে মসজিদ আছে?'

বিস্মিত হয় সিয়াম। ভুঁরু কুঁচকে বলল, 'হুঁ'।

'বেশ! নামায-কালাম তো মনে হয় না পড়িস। আগামীকাল থেকে দুপুরের সময় কলেজের মসজিদেই যোহরের নামায পড়বি। ফজরের নামাযে আমি ডেকে দিয়ে যাব। একজন মুসলিমের প্রকৃত পরিচয় হলো তার নামাযে। নামায মুসলিম আর অমুসলিমের মধ্যকার পার্থক্য, বুঝলি? শুধু কি নামে মুসলিম হলেই হবে? কাজে-কর্মে মুসলিম হতে হবে না? আর হ্যাঁ, অত রাত করে ঘুমাবি না আর। আর্লি ঘুমাবি, ওদিকে আর্লি জাগবি। জীবনটাকে একটু ভিন্নভাবে সাজিয়েই দেখ না...' - অনেকটা লেকচার দেওয়ার মতো করেই কথাগুলো বলে গেল সীমা। সিয়াম কিছুই বলেনি। গেইম খেলার সময় কেউ কথা বলতে আসলে খুব বিরক্ত বোধ করে সে। উদাস মুখে মেঝের দিকে চেয়ে ছিল কেবল। কী বলবে ও? এখন পর্যন্ত তার মা'ও তাকে কোনোদিন এভাবে উপদেশ-বাক্যে জর্জরিত করতে পারেনি। হয়তো 'অনেকদিন পর বোন এসেছে' ভেবে তার মায়ের মতো দয়া করেই চুপ করে রইল সে।

[চার]

'মা দেখে যাও, তাড়াতাড়ি এদিকে এসো!'- চিৎকার করে মা'কে ডাকতে থাকে সীমা।

সেদিন সিয়াম বের হয়ে যাওয়ার পর সীমা ওর ঘরে এসেছিল ঘরটা গুছিয়ে দিতে। মা এসে দেখলেন সিগারেটের টুকরো আর ছাইভর্তি ছাইদানি হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে।

Scanned with CamScanner

'কী হয়েছে রে?'

'এই যে দেখো, তোমার আদরের ছেলের ঘরে পাওয়া গেছে এসব।'- নিজের সন্দেহের পক্ষে যেন জোরালো প্রমাণ পেয়ে গেছে সীমা।

খুব একটা পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতেই মা বললেন, 'ওর বন্ধুরা খায় নিশ্চয়ই। এটা হয়তো ওদের জন্যই রাখা।'

'ওর বন্ধুরা খায় নিশ্চয়ই। এটা হয়তো ওদের জন্যই রাখা'- মায়ের এমন গা-ছাড়া ভাব এবং সরল বাক্যে প্রাণটা দুরুদুরু করে ওঠে সীমার। বুকের কোথাও যেন সে কষ্ট অনুভব করে। এই কষ্ট কি ওর আদরের ভাইয়ের অধঃপতনের জন্য, নাকি চোখের সামনে থেকেও ছেলের অপরাধ বুঝতে না পারা তার মায়ের জন্য?

ভেবেছিল, এবার বাপের বাড়িতে অনেকদিনই থাকবে সে। সেই শখ আর পূরণ হলো না। এখানে সবকিছু দেখতে দেখতে কেমন যেন বুকটা ভারী হয়ে উঠছিল। যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে। ভাইয়ের অধঃপতনের জ্বালায় হোক কিংবা মায়ের বিচারহীন আস্কারার জন্যই হোক—সেবার আর বাপের বাড়ি থাকা হলো না তার।

বাবা-মা'র উদাসীনতা, আস্কারা আর অতি অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই যে আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরা উচ্ছন্নে যায়, সে কথা এতদিন কাগজে-কলমে পড়েছে সীমা। এবার নিজ চোখে দেখে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো যেন। সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য বাবা-মা'র উপযুক্ত নির্দেশনা যে কতটা জরুরী, এবং সেই নির্দেশনা যে সবার আগে নিজের জীবনেই বাস্তবায়ন করা কর্তব্য—সে ব্যাপারে এখন শতভাগ নিশ্চিত সে। নাহ, নিজের সন্তানকে এভাবে বড় করবে না সে। সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ, আদর্শ মুসলিম বানাতে তাকে যত কাঠখড় পোড়াতে হয় সে পোড়াবে। আর যা-ই হোক, তার মায়ের মতো চরম উদাসীন আর সন্তানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না সে।

হ্যাঁ, সন্তানকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা বা তাদের সবকিছুতে কড়াকড়ি, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেমন ঠিক নয়; একেবারে পুরোপুরি ছাড় দিয়ে রাখাও অনুচিত। উঠতি বয়সে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সন্তান বাবা-মার নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। বয়স বেড়ে গেলে সে-সীমা অতিক্রম করে ফেললে পরে আর ফেরানো সম্ভব হয় না।

Scanned with CamScanner

[পাঁচ]

প্রাক্টিস প্যাড থেকে ফিরে গিটারটা একপাশে রেখে ধপাস করে বসে পড়ল সিয়াম। আজ বেশ ভালো জ্যামিং হয়েছে। মার কাছে শুনেছে, আপু নাকি আজ সকালেই চলে গেছে। হঠাৎ বেডসাইড টেবিলে চোখ পড়তেই দেখল একটা বই রাখা সেখানে। হাতে নিয়ে প্রচ্ছদটা দেখেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল সে। এটা নিশ্চয়ই আপুর কাজ। এই বাসায় এধরনের বই-টই কেউ পড়ে না। সিয়ামও পড়বে না।

আপুর কথা মনে হলো হঠাৎ। কতদিন পর এসেছিল। ভালো করে কথাও হলো না। আবার কবে আসবে কে জানে। আনমনে বইটা হাতে তুলে পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল সে। আচমকা দরজায় নক শুনে চমকে উঠল। মা খেতে ডাকছেন। খাবার নিয়ে টিভির সামনে বসে গেল সিয়াম। ম্যাচ প্রায় শেষের দিকে। বাংলাদেশ আজ হেরে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

টুং টাং বেজেই চলেছে নোটিফিকেশনের ডাকাডাকি। ম্যাসেঞ্জারে ওর বন্ধুদের গ্রুপে কী এক অশ্লীল জোকস নিয়ে হাসাহাসি করছিল সবাই। রাতে বিছানায় শুয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে নীরবে ওদের কথোপকথন দেখে যাচ্ছিল সিয়াম। কেন যেন ভালো লাগছে না আজ এসব আর। লুবাবা ম্যাসেজ দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। কী লিখেছে না দেখেই কী যেন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

নিকষ আঁধারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধের মতো হাতড়ে সামনে এগোচ্ছে সিয়াম। বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ সামনে একটা দরজা খুলে গেল। ওপাশে চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো! চোখ মেলে তাকানো যাচ্ছে না।

ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখছিল সে।

বেডসাইড টেবিলে রাখা পানির গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াতেই আপুর সেই বইটা চোখে পড়ল। একবার ঘুম ভেঙে গেলে সহজে আর ঘুম আসে না সিয়ামের। বইটাও কেন যেন পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পরেও যখন ঘুম আসছিল না—আলো জ্বেলে শুয়ে শুয়েই পড়ে যেতে লাগল সে। পড়তে পড়তে কখন যে বইয়ের মাঝে হারিয়ে গেল, নিজেও টের পেল না। কোনো ইসলামী বই যে এত ইন্টেরেস্টিং হতে পারে, জানা ছিল না আগে।

দুর্বোধ্য তত্ত্বকথায় ভরপুর ইসলামী বই নয় এটা, অন্যরকম একটা বই। গল্পে গল্পে ইসলামের ছোঁয়া, গল্পগুলো অন্যরকম। অজানাকে জানার আগ্রহ তৈরি করে দেওয়ার

Scanned with CamScanner

জন্য, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। পড়তে পড়তে নিজের ভেতর কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হলো। মাথার ভেতর কে যেন বলছে 'পড়ো, আরও পড়ো! আরও জানো।'

পড়তে পড়তেই আযান শুনতে পেল সিয়াম। বই বন্ধ করে কান পেতে শুনতে লাগল। শেষ কবে ফজরের আযান শুনেছে মনে করতে পারল না সে। বহুদিন নামায পড়া হয় না, বন্ধুরাও কেউ পড়ে না। আগে জুমআর নামাযে আব্বুর সাথে যাওয়া হতো। ইদানীং আব্বু ওইদিনও ব্যস্ত থাকেন, কাজেই সিয়ামেরও আর একা যাওয়া হয় না। শুক্রবার ছুটির দিনটা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটাতে পছন্দ করে সে। কখনও আগের রাতে বন্ধুরা চলে আসে, ছাদে চলে যায়। রাতভর গান-বাজনা আর আড্ডা চলে; নয়তো গেইমস খেলে সকালে ঘুমাতে যায়। ফজরের এই আযান আগে কখনও এইভাবে শুনেছে কি না, মনে পড়ছে না তার। বড়ই সুমধুর আর শান্তিময় লাগছে এই সময়টা।

[ছয়]

'হ্যালো, আস-সালামু আলাইকুম, মা!'

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আচ্ছা, আমাকে রান্নার একটা আনকমন রেসিপি পাঠাস তো। সিয়ামের বন্ধুরা সন্ধ্যায় খাবে এখানে।'

'তাই? ভাইবারেই পাঠাব মা?'

'হ্যাঁ এখানেই পাঠিয়ে দে।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা মা, ফেসবুকে দেখলাম সিয়ামদের ক্লাসের লুবাবা নামের এক মেয়ে ওর সবগুলো সেলফিতে সিয়ামকে ট্যাগ করে রেখেছে। চেনো নাকি?'

'না তো। একসাথে পড়ে, বান্ধবী থাকতেই পারে। তোর এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে! তুই তাড়াতাড়ি রেসিপিটা পাঠা আমাকে।' বলেই ভাইবারের লাইন কেটে দিলেন তিনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফোনটা হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে বসে রইল সীমা। ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করাই এখন একমাত্র পথ। মার জন্যেও হিদায়াতের দুআ করল সে।

সে-রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে খুব কাঁদল সীমা, একমাত্র ভাইটার জন্য। আগামীকাল রামাদান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। 'হে আল্লাহ, আমার ভাইটাকে এই রামাদানেই পথে ফিরিয়ে দিন!'

Scanned with CamScanner

সাধারণত সাওম পালন করে না সিয়াম। পরীক্ষা, টায়ার্ড এই-সেই কিছু একটা বলে মাকে বোঝাতে পারলেই হলো। মা-ও ধর্মকর্ম নিয়ে অতটা মাথা ঘামান না। রামাদানে তার ভারি ব্যস্ততা। ঈদ-শপিং, ইফতার-পার্টির আয়োজন আর বাহারি আনকমন ইফতারির রেসিপি সার্চ করতে করতেই মাসটা পার হয়ে যায়।

লুবাবা বলছিল, আরবীতে নাকি রোযাকে সিয়াম বলে। সে-রাতে কী মনে করে সিয়াম গুগলে সার্চ করল ওর নামটা। একটা লিংকে ঢুকে রামাদান সম্পর্কে পড়তে লাগল।

'ইন্টেরেস্টিং তো!'

এরপর একটার পর একটা লেখা পড়ে যেতে লাগল সে। রামাদান...সংযম, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, শান্তি, সাদাকা...ভালো মানুষ হওয়ার প্রশিক্ষণ। খুঁজতে খুঁজতে চমৎকার একটা লেকচার পেয়ে গেল সে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

পরের রাতে কুরআন নাযিলের ব্যাপারে পড়তে পড়তে কুরআন নিয়ে বেশ কয়েকটা লেখা পড়ে ফেলল সে। দেখতে দেখতে এই রাতটাও পার হয়ে গেল।

হঠাৎ কুরআন পড়ে দেখার তীব্র ইচ্ছে হতে লাগল তার। কী অদ্ভুত! কুরআনের অনুবাদের পিডিএফ খুঁজতে দ্রুত কীবোর্ডে হাত চালাল সিয়াম।

[সাত]

এক মাস পর...

'হ্যালো, সীমা?!'

'জি মা, বলো।'

'তুই ঠিক বলেছিস! আমার সিয়ামের কী যেন হয়েছে রে।'

'কী হয়েছে?'

'কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। ওর বন্ধুরা এখন আর আসে না। পরীক্ষা শেষ, অথচ সারাক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে কী-সব বই পড়ে। কী নিয়ে যেন চিন্তিত থাকে সারাক্ষণ। খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো করছে না!'

Scanned with CamScanner

'তাই? বলেছিলাম না মা, ছেলেকে এত বিশ্বাস করতে নেই?'

'আমার তো প্রেমঘটিত ব্যাপার-স্যাপার মনে হচ্ছে। আচার-আচরণ অস্বাভাবিক লাগছে। কী করি বল তো? তোর বাবার সাথে শেয়ার করলাম। তারও ধারণা ছেলে প্রেমে পড়েছে। তার ধারণা, এই বয়সে এসব একটু-আধটু হয়ই। কিছুদিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কী বলবে ভেবে পেল না সীমা। আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রতি রাতেই দুআ করতে থাকল ভাইয়ের জন্য।

এদিকে, কী যেন হয়েছে সিয়ামের। এখন আর আগের মতো মেজাজ খিটখিটে থাকে না, নেশা না করতে পারলে আগের মতো বেশি কষ্ট হয় না; বরং নতুন এক নেশা হয়েছে ওর। অজানাকে জানার নেশা। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক প্রশান্তির নেশা।

আপুর সাথে কথা বলা দরকার। নিজেকে মুসলিম হিসেবে ভাবতে কেমন যেন লজ্জা লাগছে তার। মুসলিম বাবা-মার ঘরে জন্মে মুসলিম নাম রাখলেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। ইসলাম হলো জেনে-বুঝে-মেনে চলার একটা ব্যাপার। এতদিন ইসলাম সম্পর্কে কত ভুল ধারণা নিয়ে বেড়াত সে, ইসলাম কোনো চিন্তা-ভাবনা করার মতো বিষয় ছিল না তার কাছে। অথচ আজ যেন অন্ধের চোখ খুলে গেছে। সামনে কত কঠিন সময় অপেক্ষা করছে আল্লাহ ভালো জানেন! আপুকে ফোন করতেও লজ্জা হচ্ছে তার।

এদিকে মোবাইলটা বেজে চলছে একটানা। সেই মিউজিক, যা শুনে হেড-ব্যাং করত বন্ধুরা। আজ কী যে অসহ্য লাগছে শুনতে! রিংটোনটা চেঞ্জ করা দরকার। দ্রুত কল রিসিভ করল সিয়াম।

'হ্যালো'

'কীরে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর উধাও হয়ে গেলি একেবারে? ফোন রিসিভ করিস না, ম্যাসেঞ্জারে রিপ্লাই দিস না, বাসায় গেলেও পাই না...। এদিকে তোকে চিরুনি চালান দিয়ে খুঁজছি আমরা।'

'আমিও নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম নারে।' আনমনে বলল সিয়াম।

'কী বলতে চাচ্ছিস তুই? নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিস না মানে?'

Scanned with CamScanner

[আট]

এক সপ্তাহ পর...

'সীমা! সর্বনাশ হয়ে গেছে!' উত্তেজিত গলায় বললেন মিসেস নুসরাত।।

'কী হয়েছে মা?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সীমা।

'তোর ভাই...আজকে ভোর বেলায় শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখি সে দরজা খুলে বাইরে বের হচ্ছে। জানতে চাইলাম কোথায় যাচ্ছে, কী উত্তর দিল জানিস? বলছে মসজিদে যাচ্ছে নামাজ পড়তে! তুই চিন্তা করতে পারিস? ওর ঘরে সার্চ করে আজ অনেকগুলো ইসলামী বই পেলাম। দেওয়ালের পোস্টারটাও খুলে ফেলেছে!'

'কী বলো মা? সত্যি?'

'এই কিছুক্ষণ আগে গ্যারেজে গিটারটা নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল! ধোঁয়ায় চারপাশ ভরে গেছে। আর কখনও নাকি বাজাবে না এটা। গিটার বাজানো নাকি ইসলামে হারাম। এত দামী গিটারটা! তুই একটু বোঝা তো ওকে। তুইও তো ধর্মকর্ম করিস, তাই বলে এত বাড়াবাড়ি করতে হবে? আমার তো ভয় হচ্ছে খুব!'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফোনের লাইনটা কেটে দিল সীমা। অশ্রুসিক্ত চোখে ফোনবুকে একটা নাম্বার খুঁজতে শুরু করল সে। অনেকদিন হলো, ভাইটার সাথে কথা বলা হয় না।

Scanned with CamScanner

আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা

শিহাব আহমেদ তুহিন

'ভাই ৪-C সিট কোনটা?'

'আমারটা যেহেতু ৪-D তার মানে আপনারটি আমার পাশেই।'

'আলহামদু লিল্লাহ, ভাই। দুই হুজুর মিলে ভালোই কাটবে সময়। দাঁড়ান একটু, আসতেছি।'

লোকটি দ্রুত বাস থেকে নেমে গেলেন। ছোট ছোট দুটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝাই যাচ্ছে, খুব আদরের কন্যা। ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। সিটে বসেই মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মামণিরা, বাসায় চলে যাও। আমার জন্য দাঁড়িয়ে থেকো না।'

মেয়ে দুটি চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবাকে বিদায় না জানিয়ে তারা যাবে না। বাস ছেড়ে দিল। যতক্ষণ মেয়ে দুটি দেখতে পেলেন তিনি হাত নাড়তে লাগলেন। আমার দিকে তাকিয়ে অপরাধী গলায় বললেন, 'বুঝলেন ভাই, মেয়েদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়।'

'আরে, এত মন খারাপ করছেন কেন! ক'দিন পরে তো ঠিকই আসবেন।'

'না ভাই, আমি মালয়েশিয়াতে থাকি। পড়াশোনা করি সেখানে।'

'বাহ! কী নিয়ে পড়াশোনা করেন?'

Scanned with CamScanner

'কুরআনিক সাইন্স। আপনি কোথায় পড়ছেন?'

'মা শা আল্লাহ! আমার কথা বললেন? আমি কুয়েটে পড়ছি।'

'এটা কি সরকারি? কোথায় এটা? আমি ভেবেছিলাম আপনি মাদরাসায় পড়েন। ড্রেস-আপে তেমনই লাগে।'

অনেকদিন ধরে এসব প্রশ্ন শুনে শুনে অভ্যস্ত। তাই প্রশ্ন না-শোনার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়াশোনা কি মাদরাসা লাইনে করেছেন?'

লোকটি হাসিমুখে বলল, 'জি, ভাই! সতের বছর পর্যন্ত মাদরাসাতেই পড়েছি। হঠাৎ করে কুরআনিক সাইন্স সাবজেক্টের নাম শুনে পড়তে ইচ্ছে হলো। ব্যস, চলে গেলাম মালয়েশিয়াতে।'

'বারাকাল্লাহু লাকা। ভাই, নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

'আমার নাম আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর সাথে আরও বিশাল টাইটেল আছে। তবে আব্দুল্লাহ নামেই ডাকলে ভালো লাগে।'

যদিও উত্তরটি জানা, তাও জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে দুটি কি আপনার? মা শা আল্লাহ! খুবই ফুটফুটে দেখতে।'

'আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ যাকে খুশি তাকে দান করেন।'

যার যে-বিষয়ে আগ্রহ সে তো তাই জিজ্ঞেস করবেন। তাই মুখ ফসকে বলেই ফেললাম, 'ভাই বয়স তো খুব বেশি মনে হচ্ছে না আপনার। মা শা আল্লাহ! দুইটি মেয়েও আছে। বিয়ে কবে করেছেন?'

বলা ঠিক হবে কি না তা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবে খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছেন এমন ভঙ্গীতে আব্দুল্লাহ ভাই বললেন, 'আসলে হয়েছে কি ভাই, সমস্যা বাধে যখন আমার বয়েস সতের কি আঠারো। মাদরাসায় নানান ফিকহের কিতাব পড়ি। স্বামী-স্ত্রীর অনেক মাসলা-মাসায়েল থাকে। পড়ি আর ফিতনা বাড়ে। রোযা রাখি। তাও কষ্ট হয়।'

আমি মনে মনে বললাম, 'বাছাধন! মাসালার কিতাব পড়েই এই অবস্থা। আসরের পর যদি একবার তোমারে কুয়েতের সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে আইসিটি বিল্ডিং পর্যন্ত নিয়ে আসা যাইতো মাথা ঘুরে পড়ে যাইতা। জ্ঞান ফিরলে খালি বলতা—হয় বিয়া করুম! নইলে মরুম।'

Scanned with CamScanner

আব্দুল্লাহ ভাই বলে যাচ্ছেন, 'তারপর মাকে বুঝিয়ে বললাম। মা রাজী হলেন। নানী আমাকে অনেক বোঝালেন। বললেন—এত কম বয়সে বিয়ে করলে সবার কাছে আমার দাম কমে যাবে। এত দাম দিয়ে আমি কী করব? নিজের ঈমানই বাঁচানো যাচ্ছে না! পুরোদমে পাত্রী দেখা শুরু হলো। অল্প সময়ে একজনকে পছন্দও হয়ে গেল। মেয়ে ক্লাস এইটে পড়ে। দেখতে মা শা আল্লাহ! খুবই সুন্দরী ছিল। অনেক ধার্মিকও। সবকিছু ঠিকঠাক। মেয়ের মা হঠাৎ বেঁকে বসল। বাপ নেই, ভালো জমি-জমা নেই—এমন ছেলের কাছে তারা মেয়ে বিয়ে দেবে না। বুঝলেন ভাই? নিজেকে তখন খুব মিসকীন মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—আমার কেউ নেই, কিছুই নেই।'

আব্দুল্লাহ ভাই ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। হাসিখুশি মুখ কিছুটা মলিন হয়ে গেল। মনে হলো সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারেননি বলে এখনও তার কিছুটা কষ্ট রয়েছে।

তারপর দ্রুতই সে কষ্টকে আড়াল করে বললেন, 'তবে আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন। কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম, এটা সত্যি। আমার খালু তারপর তার এক বন্ধুর মেয়েকে দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন। পাত্রী দেখতে এতটা সুন্দর ছিল না। আমার চেয়ে মাত্র দুই বছরের ছোট। কারও-রই পছন্দ হলো না; কিন্তু আমার পছন্দ হলো। শুনলাম, মেয়ের পরিবারের সবাই বেশ ধার্মিক। দাঁড়ান ভাই! একটা ফোন আসছে।'

ফোনের অপরপাশের কাউকে আব্দুল্লাহ ভাই আদরমাখা ধমকের সুরে বলছেন 'আহা! মা কান্দে কেন? কানতে না করো। আমি কি লাশঘরে চইলা যাচ্ছি নাকি? এক বছর পর তো ঠিকই আমু। আরে কী মুশকিল! তুমিও কান্না শুরু করলা নাকি!'

আপনজনের সাথে কী অকৃত্রিম গলায় কথা বলছেন। শুনতেই ভালো লাগছে। অনেকক্ষণ পরে তিনি ফোন রাখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়ে মানুষের মন। তার ওপর মায়ের মন। খালি কাঁদে। ভাই কী যেন বলছিলাম?'

'আপনার খালু মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেছেন। আপনার পছন্দ হলো...'

'জি, ভাই। মেয়ে পছন্দ হলো। আমার খালু চিন্তা করলেন, এই পাত্রী হাতছাড়া করা যাবে না। সেদিনই বিয়ে ঠিক হলো। মাইক্রোতে করে আমার বাসা থেকে কিছু আত্মীয় আর প্রতিবেশীদের আনা হলো। ভাই কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

Scanned with CamScanner

'মোটেও না। সবাই কথা বললে শুনবে কে? আপনি বলতে থাকুন। আমি শুনছি। মন দিয়েই শুনছি।'

'তো ভাই, কিছু বোঝার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। সেদিনই বাসর হলো। আমি তো খুবই অবাক। মনে হলো ঘোরের মধ্যে আছি। বাসর-রাতে বউকে দেখে সে ঘোর আরও বেড়ে গেল। মেয়েপক্ষ তেমন স্বচ্ছল ছিল না। ওরা তাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে আপ্যায়নের; কিন্তু আমার এলাকার লোকজন খুব কথা বলল এটা নিয়ে—হাজী সাহেবের পোলা কি ফকিন্নির ঝিরে বিয়া করছে? এই কয়ডা লোকও খাওয়াইতে পারল না। ভাই, আপনি বলেন, লোক খাওয়ানো কি মেয়ে-পক্ষের দায়িত্ব? রাগ উঠে গেল। বাসায় গিয়ে বড় করে অনুষ্ঠান দিয়েছি। সবাইকে ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া করিয়েছি।'

আমার আগ্রহ তো অন্যদিকে। হাসি গোপন করে বললাম, 'ভাই এত কম বয়সে বিয়ে করেছেন? বিয়ের পর অভিজ্ঞতা কেমন?'

আমার কথায় সম্ভবত কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ভেবে বসলেন, আমি হয়তো কম বয়সে বিয়ের বিপক্ষে। কিছুটা প্রতিবাদী গলায় বললেন, 'ভাই, বয়স কম কোথায়? উনিশ বছর আপনার কম মনে হচ্ছে? আপনার বয়স কত? বিশ-বাইশের কম তো মনে হয় না। সত্যি করে বলেন, আপনার কি একটুও কষ্ট হয় না? একা একা লাগে না। মনের মধ্যে ফিতনা আসে না?'

তিনি আমার পরিচিত হলে বলতাম, আমার সাথে মজা নিচ্ছেন। আমি বিয়ের বিপক্ষে এটা তো আমার পরিচিত কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। বলতে ইচ্ছা করল মিয়া! মজা লন?

মনের কথা গোপন রাখতে হলো। এমন ভাব করলাম যে, তিনি এসব বলার আগে আমি বিয়ের গুরুত্ব বুঝতামই না। আমার সামনে তিনি এক জটিল রহস্যের জট খুলে দিয়েছেন। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললাম, 'জি ভাই। আসলেই ফিতনা। বিবাহ করা জরুরি। দুআ করবেন।'

আব্দুল্লাহ ভাই আরও সিরিয়াস হয়ে বললেন, 'ভাই, বিয়ের যে কী বরকত তা বিয়ে না করলে কখনই বুঝবেন না। বললাম না, প্রথম রাতেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো ঘোরের মধ্যে আছি। স্বপ্ন দেখছি। আমার স্ত্রী বিশ্বসুন্দরী না। কিন্তু আল্লাহর

Scanned with CamScanner

ওপর ভরসা করে ধৈর্য ধরার প্রতিদান আল্লাহ তাআলা আমায় দিয়েছেন। বিয়ের এতদিন পরেও যখন দেখি আমার ওকে সেই প্রথম দিনের মতোই ভালো লাগে।

বউটা আমার জন্য কী পরিমাণ কষ্ট যে স্বীকার করেছে। বাবার বাড়িতে কষ্ট করে বড় হয়েছে। আমার এখানে এসেও কোনো সুখ পায়নি। খালি অভাব আর অভাব! এক বেলা ভালো খাবার খেলে দুবেলা জোটে না, এমন অবস্থা। কিন্তু কোনোদিন ওর কাছ থেকে অভিযোগ শুনিনি। মেয়েরা তো জানেনই একটু আহ্লাদী হয়। কিন্তু কখনও আমাকে ও 'এটা দাও, ওটা দাও' বলে কোনোকিছু আবদার করেনি। আমি নিজ থেকে কিছু কিনা দিলে ও নিজেই শাসনের সুরে বলেছে, 'সংসারের এমন অবস্থায় এসব কিনা কী দরকার!'

আমার এমন গরিবী হালতে বিদেশে পড়তে যাওয়া খুবই বিলাসিতা; কিন্তু একটিবারও আমার কাছে ও অভিযোগ করেনি। মোহর হিসেবে ওকে একটা গাই কিনে দিয়েছিলাম। সেটাও আমার বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা তোলার সময় বিক্রি করতে হয়েছে। কথাটা মনে হলেই খারাপ লাগে। আমি ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি, 'বউ, আমারে মাফ কইরা দিয়ো। আমারে একটু সময় দাও। তোমারে আরেকটা গাই কিনে দেবো।'

ও মাথা নিচু করে আমারে বলে, 'আপনে যে কী কন! কিনা দেওন লাগবো ক্যান? আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা।'

এই যে ভাই, বিদেশ যাচ্ছি! ওকে ছাড়া যে কী কষ্ট আমার হয়! ওকে বলেছি—আমি আল্লাহরে ভয় করে ভালো থাকার চেষ্টা করব। তুমিও আল্লাহরে ভয় কইরো। আল্লাহ কিন্তু সব দেখতেছেন।'

আব্দুল্লাহ ভাই আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। কথা বলতে বলতে মনে হয় অন্য কোনোখানে চলে গিয়েছিলেন। সংবিৎ ফিরে পেয়েই বললেন, 'ভাই, মাফ করবেন! স্বামী-স্ত্রীর কথা বলে আপনাকে শুধু-শুধুই কষ্ট দিচ্ছি। আমার রাতে ফ্লাইট। একটু ঘুমাই। না হলে সমস্যায় পড়ব।'

আমার বলতে ইচ্ছে হলো—ভাই বলুন। এত সুন্দর গল্প আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারব। একটুও বিরক্ত হব না।

Scanned with CamScanner

চোখের ওপর গামছা রেখে আব্দুল্লাহ ভাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সেটি অশ্রু ঢাকতে নাকি আলো থেকে বাঁচতে—তা বুঝতে খুব বেশি জ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ওনাকে আমার জীবনের গল্প বলতে ইচ্ছে হলো খুব। নিজের একান্ত কিছু কষ্টের গল্প। আনন্দের গল্প। হতাশার গল্প। তিনি নিজের গল্প বলতে এত ব্যস্ত ছিলেন, আমার কথা সম্ভবত জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন। আশ্চর্য! আমার নামও তো তিনি জানেন না। যা-ই হোক, সবার সব কথা জানতে নেই। হয়তো আমার কথা জানায় ওনার কোনো কল্যাণ নেই; তাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন। আর ওনার কথা জানা আমার জন্য দরকার বলেই হয়তো আল্লাহ আমাকে দিয়ে এত প্রশ্ন করিয়েছেন।

হাইওয়ের একপাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত। অনেক দূরে কিছু ছনের ঘর দেখা যাচ্ছে। কে জানে! কত গল্প এ মানুষগুলোর জীবনে জড়িয়ে আছে। সন্তানদের গল্প, স্বামী-স্ত্রীর গল্প। যে-গল্পগুলো কেউ জানে না। কেউ লেখে না। শুধু সহজ-সরল ওই মানুষগুলো-ই জানে আর ওপর থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেন। ঢেলে দেন তাঁর অফুরন্ত বরকত। হঠাৎ করেই ওই গ্রামগুলো বড্ড আপন মনে হলো। সেখানকার মানুষগুলোকে নিজের মনে হলো। যাদের অনেক বড় ডিগ্রি নেই। খুব বেশি অর্থ-সম্পদও নেই। তারপরও কোনো এক অবাক করা উপায়ে জীবন তাদের টিকে থাকার শিক্ষা দিয়ে দেয়। যে-দেশে শহরের শক্ত কংক্রিটের দেওয়ালে একের পর এক সম্পর্ক তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে সেই একই দেশের নড়বড়ে মাটির ঘরে তৈরি হচ্ছে ইস্পাতের মতো মজবুত সম্পর্ক। তাই শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা জীবনসঙ্গীর সুখ-দুঃখের অংশ হতে জানে। মনের কষ্টগুলো গোপন করে বলতে জানে—

আপনে যে কী কন! কিনা দেওন লাগব ক্যান? আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা।

Scanned with CamScanner

আমি আবারও যাব

আরিফুল ইসলাম

২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। তাপমাত্রা কিছুটা কমতে শুরু করেছে। গাছের পাতাগুলো লাল-হলুদ-কমলা রং ধারণ করছে।

তখনও আমি মুসলমান হইনি; খ্রিষ্টান। ধার্মিক খ্রিষ্টান নয়, নামেমাত্র খ্রিষ্টান।

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেক্সাসের ব্রিজপোর্টে আমার জন্ম। আমার পুরো পরিবার ছিল খ্রিষ্টান। ব্রিজপোর্ট হাই-স্কুল থেকে ২০০০ সালে পড়ালেখা শেষ করি। সময়টি বেশ ভালোই কাটছিল।

এর এক বছর পর আমার জীবনে নেমে আসে মহাবিপর্যয়। রঙিন আকাশে হঠাৎ কালো মেঘের ঘনঘটা। টেক্সাসের ডিকাতোর শহরে কার এক্সিডেন্ট করি। এক্সিডেন্টের পর অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকি। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে হাসপাতালের বেডে আবিষ্কার করি। হাত-পা নাড়াতে পারছিলাম না। ডাক্তার এসে বলল, আমার কোয়াড্রিপ্লেজিক (Quadriplegic) হয়েছে। গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত শরীর প্যারালাইজড হয়ে গেছে।

জাস্টিন শহরের একটি নার্সিং হোমে আমাকে ভর্তি করা হলো। এই নার্সিং হোমের বেশিরভাগ রোগীর বয়স নব্বই থেকে একশ বছর। এক আমিই যুবক—একুশ বছরের একজন প্যারালাইজড যুবক।

Scanned with CamScanner

প্রথমদিকে নাকে নল ঢুকিয়ে খাবার খেতে দিত। এভাবে খাবার খাওয়া খুবই কষ্টকর। তাই আস্তে-আস্তে চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। চিবিয়ে খাওয়ার অদম্য চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হলো।

নার্সিং রুমে আমার এক রুমমেট ছিল। তার নাম মার্ক। তার একটি লিভারের প্রয়োজন। তাই সে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য অপেক্ষা করছিল। ধর্মীয় পরিচয়ে সে ছিল খ্রিষ্টান—সব সময় গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখত।

অল্পদিনের মধ্যেই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। নার্সিং রুমে আমরা নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। তবে স্রষ্টা ও জীবন-ই থাকত আমাদের আলোচনার মূল ও প্রধান বিষয়।

একদিন শুনতে পেলাম মার্ককে এক লোক লিভার ডোনেট করবেন। মার্ক আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। ওকে বিদায় জানালাম। কে জানত, এই বিদায়ই হবে শেষ বিদায়?

লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার সময় অপারেশন টেবিলে মার্ক মারা যায়। মার্কের মৃত্যুসংবাদে আমি স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করি। আমার বিবশ দেহের ভেতর থেকে আত্মাটা আর্তনাদ করে ওঠে। মার্কের বোন ওর গলায় ঝুলানো ক্রুশটি আমাকে দিয়ে যায়। আমি তাকে ক্রুশটি আমার বেডের পাশে রাখতে বলি।

মার্কের মৃত্যুর পর শুরু হয় নার্সিং রুমের একাকিত্বের দিন। অবশ্য একাকিত্বের কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আমার পরিবার একটি ভয়েস কমান্ড কম্পিউটারের ব্যবস্থা করেছিল। ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে আমি ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করতে পারতাম।

মার্ককে হারানোর সাত বছর কেটে গেল। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। রাতে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, আমি মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়ানো। মরুভূমির বাতাস বইছে। বালি উড়ছে। এই বালুঝড় ঠেলে প্রায় ছয় ফুট লম্বা এক ব্যক্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার কাছে এসে ক্রুশটি দেখিয়ে বললেন, 'আল্লাহ এই জন্য তাঁর রাসূল পাঠাননি যে, মানুষ যীশুর উপাসনা করবে; বরং আল্লাহ রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহর উপাসনা করে। যীশু একজন মানুষ মাত্র। তিনি বাজারে যেতেন। খাবারও খেতেন।'

এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পরপরই আমি আনমনে বলে উঠি— 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।'

Scanned with CamScanner

উল্লেখ্য যে, আমি তখনও আমার মুখে উচ্চারিত এই শব্দমালার অর্থ ও তাৎপর্য জানতাম না। অদ্ভুত একটি শক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে আমি এই শব্দগুলো উচ্চারণ করে ফেলি। আমার মনে পড়ে, স্বপ্নে দেখা লোকটি নিজেকে 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য তখনও আমি তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানতাম না।

কম্পিউটারে ভয়েস কমান্ড করলাম 'মুহাম্মাদ' বলে। সার্চ রেজাল্টে ইসলামের অনেকগুলো বিষয় এলো। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, ঘুম ভাঙার পর মুখ দিয়ে আমি যে-শব্দগুলো উচ্চারণ করেছি সেগুলোই, ইসলামের টেস্টিমনি।

এরপর আমি ইসলাম নিয়ে পড়া শুরু করি। একপর্যায়ে বুঝতে পারি যে, আমার সাথে ঘটে-যাওয়া ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এমনকি কাকতালীয় কোনো ব্যাপারও নয়; বরং এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিতে চাচ্ছেন। এই তাৎপর্যটি অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমি মনেপ্রাণে মুসলমান হয়ে যাই।

চ্যাটরুমে গিয়ে আমি কুরআন শেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। স্কাইপে একজন আমাকে আরবী বর্ণমালা শিখিয়ে দেন। নার্সিং হোমের বেডে শুয়ে আমি কুরআনের দশটি সূরা মুখস্থ করি। তারপর আমার মনে হয়, যে-কোনো মূল্যে আমাকে কুরআন বুঝতে হবে।

'How to understand the Quran' বলে সার্চ দিই। অমনি আমেরিকার একজন মুসলিম স্কলারের কুরআন-বিষয়ক বেশ কয়েকটি ভিডিও লেকচার ও গুরুত্বপূর্ণ নোটস পেয়ে যাই। আমি সবগুলো ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং নোটগুলো পড়ে ফেলি।

আমাদের নার্সিং হোমে মিশরের এক লোক ছিল। সে সার্ভিসিং-এর কাজ করত। ধর্মীয় দিক থেকে সে মুসলমান হলেও ধর্ম-কর্ম পালন করত না। এমনকি সপ্তাহান্তে জুমআর সালাতটাও আদায় করত না। মাঝেমধ্যে ধর্মের কথা মনে পড়লে সে নার্সিং হোমের কাছাকাছি একটি চার্চে যেত। চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করত; অথচ সে ছিল মুসলিম!

একদিন আমি রুমে বসে সূরা আসর তিলাওয়াত করছিলাম। ওই সময় মিশরীয় লোকটি আমার রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার তিলাওয়াত শুনে সে ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'এতক্ষণ তুমি কী শুনছিলে?'

Scanned with CamScanner

আমি বললাম, 'কই? আমি তো কিছু শুনছিলাম না; বরং আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম।'

আমি মুসলমান হয়ে গেছি শুনে লোকটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। মনে হলো, তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

আমাকে বলল, 'আমেরিকার টেক্সাস শহর। চারদিক ভর্তি চার্চে। তাছাড়া নার্সিং হোমের বিছানার পাশে ঝুলানো একটি ক্রুশ নাড়ানোর ক্ষমতাও তোমার নেই। আর তুমি বলছ, তুমি মুসলমান হয়ে গিয়েছ?'

আমি তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। আমার কথা শুনে সে বলল, 'নার্সিং হোমের একজন প্যারালাইজড খ্রিষ্টানকে যদি আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে হিদায়াত দিতে পারেন তাহলে আল্লাহ আমাকেও হেদায়াত দিতে পারেন। আমি আবারও আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে চাই।'

এ কথা বলে মিসরীয় লোকটি আমার জন্য দুআ করে, যেন আমি ওই লোকটির সাক্ষাৎ পাই, যার ভিডিও দেখে আমি কুরআন বুঝতে শিখেছি।

একদিন হঠাৎ দেখি, সেই স্কলার আমার রুমে এসেছেন। অথচ তার সাথে আমার কোনো ধরনের যোগাযোগই হয়নি। আমার মিশরের ওই বন্ধুটি আবার নতুন করে যখন ইসলাম মানা শুরু করে তখন একদিন টেক্সাসের ফোর্টওয়ার্থ মসজিদে জুমআর সালাত আদায় করতে যায়। সেখানেই ওই স্কলারের সাথে তার দেখা হয়। বন্ধুর মুখে আমার ইসলামগ্রহণের ঘটনা শুনে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে তার সাথে আমাকে দেখতে চলে আসেন।

আমাকে দেখার পর তিনি বলেন, 'আমি শুনেছি, তুমি কুরআনের দশটি সূরা মুখস্থ করেছ। আমাদের একটি সূরা তিলাওয়াত করে শোনাবে?' আমি তার কথায় রাজি হয়ে যাই। তাদেরকে সূরা আসর তিলাওয়াত করে শুনাই। আমার তিলাওয়াত শুনে সেখানে এমন একজনও ছিলেন না, যার চোখ দিয়ে পানি ঝরেনি।[১]

---

[১] গল্পটি আমেরিকার নওমুসলিম রবার্ট ডেভিলার ইসলামগ্রহণের সত্য কাহিনি অবলম্বনে লেখা।

Scanned with CamScanner

এরপরও হৃদয়ের গভীরে একধরনের আফসোস ও অতৃপ্তি বোধ করছিলাম। কারণ, আমি মুসলমান হয়েছি ঠিকই; কিন্তু জীবনে একটি বারও সালাত আদায় করতে পারিনি। মসজিদে গিয়ে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়তে পারিনি। এই অতৃপ্তি থেকেই একদিন জুমআর সালাতে যাবার জন্য আমি নার্সিং হোমের নার্সদের অনুরোধ করি। তখন আমার স্পেশাল ভ্যানটি ছিল না। তাই সাধারণ ভ্যানে মসজিদে যাই। এতে আমার মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে। অসহ্য ব্যথা নিয়ে নার্সিং হোমে ফিরে আসি।

নার্সরা আমাকে বলে, 'তোমার মেরুদণ্ডে এমন আঘাত লেগেছে যে, তুমি আগামী ছয় মাস এই বিছানায় বসতেও পারবে না। বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।'

নার্সদের এই ঘোষণায় আমি ভীষণ ব্যথিত ও মর্মাহত হই। কিন্তু তখন আমার কিছুই করার ছিল না। কারণ, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোথাও যেতে বা কোনোকিছু করতে সক্ষম ছিলাম না।

তিন মাস পার হবার পর ওই স্কলার আবার আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাকে আমার জীবনের প্রথম সালাত আদায় করার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলি, 'আমি আমার জীবনে এর চেয়ে শান্তির জায়গায় আর কখনও যাইনি। যতটা শান্তি আমি ওই মসজিদে গিয়ে পেয়েছি, ততটা শান্তি আর কোথাও পাইনি।

সুতরাং, আমি সুস্থ হয়ে বসার সুযোগ পেলে কী করব জানেন? আমি আবারও ওই মসজিদে সালাত আদায় করতে যাব!'

Scanned with CamScanner

একটি তাওয়াক্কুলের গল্প

মাহমুদুর রহমান

বৃহস্পতিবার। সকাল ১১:৩০ মিনিট। এই সময়টির কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। কারণ, তখন আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খাই। সিস্টারদের একজন এসে জানায় যে, গত মঙ্গল ও বুধবার আড়াই বছর বয়সী যে-বাচ্চাটির ওপর অস্ত্রোপচার করেছিলাম, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বাচ্চাটির কাছে ছুটে যাই। তাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি কার্ডিয়াক মাসাজ দিই।

এই দীর্ঘ সময়ে তার মধ্যে উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে সবাই তাকে মৃত বলে ধরে নেয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছেয় তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জানালাম।

বাচ্চাটির সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর জন্য আমি তার পরিবারের খোঁজ নিই। একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু যখন দোদুল্যমান থাকে তখন সে অবস্থা নিয়ে তারই আপনজনের সাথে আলোচনা করা অত্যন্ত কষ্টকর। এক্ষেত্রে একজন ডাক্তারকে দুই কষ্টের মাঝখানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সেতু নির্মাণ করতে হয়—যেন একটির ভাঙনের শব্দে অপরটি ভেঙে না পড়ে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি বাচ্চার মায়ের সন্ধান পাই। তাকে জানাই যে, বাচ্চার গলার ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এটাই তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ। কিন্তু

Scanned with CamScanner

এই রক্তক্ষরণ কেন হচ্ছে—সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। সম্ভবত তার মস্তিষ্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কী মনে হয়—এ কথার উত্তরে একজন মা কী বলতে পারেন?

তার কি কান্নায় ভেঙে পড়ার কথা?

তার কি আমার প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করার কথা?

হ্যাঁ, এগুলো করাটাই তার জন্য স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু তিনি এসব না-করে কেবল 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে চলে যান। ১০দিন পর বাচ্চাটি আবার নড়াচড়া করতে শুরু করে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। শিশুটির মস্তিষ্কের কার্যক্রমও বেশ স্বাভাবিক মনে হতে থাকে।

কিন্তু ১২দিন পর সেই একই রক্তক্ষরণে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আবারও বন্ধ হয়ে যায়। আবারও আমরা তাকে পৌনে একঘণ্টার সেই কার্ডিয়াক মাসাজ দিই; কিন্তু এবার আর তার হার্ট রেসপন্স করছে না। আমি তার মাকে জানাই যে, এবার আর বাবুটার বাঁচার তেমন কোনো আশা নেই। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, হে আল্লাহ, যদি তার সুস্থতায় কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তাকে তুমি সুস্থ করে দাও।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন সাথে-সাথেই মায়ের দুআ কবুল করলেন।

শিশুটির হৃদযন্ত্র চলতে শুরু করে।

এই একই ঘটনা পর-পর ছয়বার ঘটে এবং প্রতিবারই মনে হয় যে, এখানেই হয়তো শেষ। অতঃপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছেয় একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন তার এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সক্ষম হন। এরপরে তার হার্ট পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে থাকে। এভাবে সাড়ে তিন মাস অতিবাহিত হয়।

এই তিন মাসে শিশুটি যদিও ক্রমান্বয়ে আরোগ্য লাভ করছিল; কিন্তু তার ভেতরে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তারপর, একদিন সে ধীরে-ধীরে নড়তে শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ করে তার মস্তিষ্কের উপরিভাগে বৃহদাকারে একটি ঘা দেখা দেয়। ক্ষতস্থানটি দূষিত রক্ত ও পুঁজে পরিপূর্ণ ছিল। আমি এরকম অদ্ভুত জিনিস আগে কখনও দেখিনি।

Scanned with CamScanner

আমি তার মাকে এই অবস্থার কথা জানালে তিনি পুনরায় 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে চলে যান। আমরা যত দ্রুত সম্ভব তাকে সার্জিক্যাল ইউনিটে নিয়ে যাই। সেখানে ব্রেইন এবং নার্ভাস সিস্টেমের ওপর সকল ধরনের জটিল চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা হয়। আমরা তাকে সেখানে ভর্তি করি। তিন সপ্তাহ পরে ছেলেটি আরোগ্য লাভ করলেও অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। দুই সপ্তাহ পর তার দেহে আরও একটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তার রক্তে একপ্রকার বিষক্রিয়া দেখা দেয় এবং তার শরীরের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রিতে পৌঁছে। আমি আবারও তার মাকে রক্তের এই বিপদজনক বিষক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করি এবং তিনি যথারীতি অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সব শোনেন এবং বলেন, 'আলহামদু লিল্লাহ। হে আল্লাহ, যদি তার আরোগ্যলাভের মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তাকে তুমি সুস্থ করে দাও।'

শিশুটিকে পরিদর্শন করে আমি পাশের বেডের আরেকটি শিশুকে দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি—তার মা চিৎকার করে কাঁদছে। আমাকে দেখে তার বিলাপের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। 'ডাক্তার! ও ডাক্তার!! আমার ছেলেকে বাঁচান!!! একটা কিছু করুন প্লী-ই-জ। আমার ছেলে তো মরে গেল-ও-ও!'

তার ছেলে জ্বরে কাতরাচ্ছিল এবং তার টেম্পারেচার ছিল ৯৯.৬৮ ডিগ্রি। আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে বলি, 'আপনার পাশের বেডের বাচ্চাটির জ্বর ১০৬ ডিগ্রি। তবুও তার মা কত ধৈর্যশীল এবং তিনি তারপরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করছেন।'

উত্তরে উত্তেজিত মহিলা বলেন, 'ওই মহিলা তার বাচ্চার প্রতি উদাসীন! তাছাড়া ওই মহিলা খানিকটা অপ্রকৃতিস্থও বটে।

সেই মুহূর্তে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বিখ্যাত হাদীসটির কথা মনে পড়ে যায়—

Blessed are the strangers

মাত্র দুটি শব্দ...

কিন্তু ওয়াল্লাহি! এই দুটি শব্দই পারে পুরো একটি জাতিকে পরিবর্তন করতে।

Scanned with CamScanner

আমার ২৩ বছরের ডাক্তারি জীবনে আমি এরকম ধৈর্যশীল কোনো মাকে আজ পর্যন্ত দেখিনি। যাই হোক, আমরা তার ছেলেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও যত্নের সাথে চিকিৎসা ও সেবা দিতে থাকি। এভাবে সাড়ে ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর অবশেষে শিশুটিকে সেই রিকোভারি ইউনিট থেকে বের করে আনা হয়। নীরব-নিথর, মূক ও বধির ছেলেটির মুখে অভিব্যক্তির কোনো চিহ্নও নেই। তার উন্মুক্ত বক্ষদেশে তাকালে দেখা যায় কেবল—তার ছোট্ট হৃদয়ের ধুকপুকানি। ছেলেটির মা প্রতিদিন সন্তানের ক্ষতস্থান যত্নসহকারে ড্রেসিং করেন। তার ভেতরে নিরাশার কোনো ছাপ কখনই দেখা যায় না।

আপনি কি এর পরের ঘটনা অনুমান করতে পারেন? যে-শিশুটির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এমন ভয়াবহ মরণব্যাধির আক্রমণে জর্জরিত, তার ব্যাপারে আপনি হলে কতটুকু আশাবাদী হতেন? শিশুটির মায়ের এই প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠা ও দীর্ঘ যন্ত্রণাময় পথপরিক্রমাকে আপনার কাছে কী মনে হয়? আপনি হলে এক্ষেত্রে কতটা শক্ত থাকতে পারতেন? আপনার ধৈর্যের বাঁধ কতটা মজবুত করে গড়ে তুলতে পারতেন?

এমন পরিস্থিতিতে মহান রবের কাছে দুআ করা ছাড়া শিশুটির মায়ের আর কোনো উপায়-ই ছিল না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবের কাছে দু'হাত তুলে দুআ করাকে তিনি 'অগত্যা কী আর করা' হিসেবে নেননি; বরং মোটেই নিরাশ না হয়ে অটল বিশ্বাস এবং সবরের সাথে বারংবার তার সন্তানের জন্য দুআ করে গেছেন।

আপনি কি জানেন, এর আড়াই মাস পরে কী ঘটেছিল? ছেলেটির মায়ের এই অত্যাশ্চার্য ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা-গুণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশেষে ছেলেটিকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে দেন।

বাবুটি এখন তার মায়ের সাথে ছুটোছুটি করে। দৌড়াদৌড়ি করে। দেখে মনে হয়, যেন সে কখনই অসুস্থ ছিল না।

প্রিয় পাঠক, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ঘটনার যে-অংশটি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছে, আমার বুক ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে সে-অংশটুকুই এখন আপনাকে বলবো—

'ছেলেটি হাসপাতাল ত্যাগ করেছে—প্রায় দেড় বছর। এরই মধ্যে একদিন অপারেশন ইউনিটের ওয়ার্ডবয় আমাকে জানায় যে, একজন ভদ্রলোক স্ত্রী-সন্তানসহ আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তারা কে জানতে চাইলে—সে বলে, 'চেনে না।'

Scanned with CamScanner

আমি আর কোনো প্রশ্ন না-করে তাদের সাথে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি—দেড় বছর আগে যে-শিশুটির অপারেশন করেছিলাম, তারই মা-বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ছেলেটির বয়স এখন পাঁচ বছর। শান্ত-শিষ্ট ও দুর্দান্ত। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তার জীবনে ভয়ানক সেই দিনগুলো কখনও হানা দিয়েছিল। তাদের সাথে চার মাস বয়সী আরেকটি শিশুও ছিল। আমি তাদের সাদর সম্ভাষণ জানালাম এবং কৌতূহলবশত ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, এটি তার তের বা চৌদ্দতম সন্তান কি না?

তিনি একটু বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। অতঃপর বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'এটি আমাদের দ্বিতীয় সন্তান। আর কিছুদিন আগে আপনি যার অপারেশন করেছেন, সে-ই আমাদের প্রথম সন্তান। দীর্ঘ সতের বছর নিঃসন্তান থাকার পর আল্লাহ আমাদের প্রথম সন্তান দান করেন।'

একথা শুনে আমি নিজেকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। অতঃপর, আমি তার হাত জড়িয়ে ধরে আমার রুমে এনে বসালাম। তার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাইলাম, 'কে এই মহিয়সী নারী—যিনি দীর্ঘ সতের বছর নিঃসন্তান থাকার পরেও প্রথম নবজাতকের ক্রমাগত জীবন-মরণ সংকটে শান্ত-অবিচল থাকতে পেরেছেন?

যে-পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের; বিশেষত নারীদের, চিৎকার ও বিলাপ করে সবকিছু একাকার করে ফেলার কথা তিনি তখনও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করেছেন আর সন্তানের আরোগ্যলাভের জন্য কেবল তাঁরই ওপর আস্থা রেখেছেন এবং তাঁরই কাছে দুআ করেছেন? এটি কীভাবে সম্ভব?'

এর উত্তরে তিনি কী বললেন, জানেন?

তিনি বললেন—'আমাদের বিয়ের বয়স উনিশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তাকে কোনো রাতে তাহাজ্জুদের সালাত বাদ দিতে দেখিনি।[১] কখনও কারও গীবত করতে শুনিনি এবং কখনই তাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। তাছাড়া আমি ঘর থেকে বের

---

[১] শুধু নারীদের প্রকৃতিগত সমস্যার দিনগুলো ব্যতীত।

Scanned with CamScanner

হওয়ার সময় এবং ঘরে ফেরার সময় প্রতিবার সে দরজা খুলে হাসিমুখে আমায় বিদায় ও স্বাগত জানায়। আমার জন্য দুআ করে। সে যা-কিছু করে—তার প্রতিটি কাজে থাকে পরম যত্ন, বিনয় ও ভালোবাসার কোমল পরশ। ডাক্তার সাহেব, আমি তার প্রতিটি আচরণে এত বেশি মুগ্ধ যে, সব সময় মনে হয়, আমি তার যোগ্য নই। সেজন্য তার চোখে চোখ তুলে তাকাতে খুব লজ্জা লাগে।

আমি স্মিত হেসে বললাম, 'এমন একজন গুণবতী নারীর ভাগ্যে আপনার মতোই একজন স্বামী থাকা দরকার। এটি তিনি ডিজার্ভ করেন।'[১]

[১] কার্ডিওভাসক্যুলার কনসালট্যান্ট প্রফেসর খালিদ আল-জুবায়ের তার একটি লেকচারে ঘটনাটি তুলে ধরেন।

Scanned with CamScanner

নতুন মেয়ে যাইনাব

আফীফা আবেদীন সাওদা

আর সব দিনের মতোই ছিল সে দিনটা। বছরের মাঝামাঝি সময়, সূর্যটা তার সমস্ত তেজ নিয়ে হাজির। স্কুলের জানালা গলে বেয়াড়া রোদ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে অষ্টম শ্রেণির কক্ষে।

রোদের আনাগোনা ঠিক সেই বেঞ্চিতে, যেখানে তিন বান্ধবী নিয়মিত বসে। জানালা থেকে কিছুটা সরে বেঞ্চিতে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে তারা। আমিনা, আসমা আর ফারিহা। তবুও রোদের আঁচ থেকে বাঁচা দায়। বহুল আরাধ্য জানালার পাশের সিটটা এই সময়ে ভীষণ অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন বাতাস এসে যান্ত্রিক পাখাটাকে আরও বেশি দুলিয়ে দিয়ে যায়। তখন অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগে না। কেবল এই হুট করে আসা বাতাসের লোভেই জানালার শার্সি লাগাতে নারাজ তিনজন।

ক্লাস সবে শুরু হয়েছে। ক্লাস টিচার অংকের শিক্ষিকা। মুখে মিষ্টি হাসি ধরে রেখেও কিছু জায়গায় বেশ কড়া তিনি। নাম ডাকা শুরুর পর থেকে তার ক্লাসে কেউ কথা বলতে পারবে না। পারবে না তো পারবেই না। এমন ছোটখাটো কিছু নিয়ম ছাড়া সুমাইয়া মিসকে ছাত্রীবান্ধব বলা চলে। ছাত্রীদের যে-কোনো সমস্যায় তাকে পাওয়া যায় সবার আগে।

Scanned with CamScanner

সুমাইয়া মিস নাম ডাকার খাতা খুলেছেন। তাই দেখে সোজা হয়ে বসল মেয়েরা। কেউ আর ঘাড় গুঁজে বান্ধবীর সাথে গল্প করছে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্কুলের ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল। মিস নাম ডাকতে ডাকতেই চোখের ইশারায় তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন।

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে ক্লাসে। মেয়েদের গলা জোরালো থেকে জোরালো হচ্ছে। কেউ কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের বেঞ্চিতে বসা মেয়েটাকে দেখছে। মুখটা ক্ষণে ক্ষণে কেমন যেন বাঁকাচ্ছে মেয়েটা, বিড়বিড়িয়ে কিছু বলছে যেন।

'কথা শেষ হয়েছে সবার?' প্রশ্নে কোনো প্রশ্রয় ছিল না। বিরক্তিতে ছেয়ে আছে সুমাইয়া মিসের মুখ। মেয়েদের গুঞ্জন ঠিক যেভাবে বাড়তে বাড়তে হুলস্থুল আকার নিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই কমতে কমতে মিইয়ে গেল। মিস ফিরে গেলেন নাম ডাকার খাতায়। বরাবরের মতো রোল নাম্বার চল্লিশে এসে থামলেন না, ডাকলেন রোল একচল্লিশকে। গলা উঁচিয়ে বললেন, 'রোল একচল্লিশ, যাইনাব চৌধুরী!'

নতুন মেয়েটা হাত তুলে তার উপস্থিতির জানান দিল। আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু মেয়ে তাকে পর্যবেক্ষণের আগেই মিস গলা চড়ালেন, 'সামনের বেঞ্চে এসে বসো যাইনাব।'

যাইনাব তার নীলরঙা স্কুলব্যাগটা দুই হাতে আগলে সামনের বেঞ্চে এসে বসেছে। ক্লাস চলছে পুরোদমে। মেয়েদের কৌতূহল নিবারণের সুযোগ নেই।

প্রথম কয়েকটা দিন বেশ উত্তেজনায় কাটল। নতুন একটা মেয়ে এসেছে। অদ্ভুত তার মুখভঙ্গি। আপনমনে বিড়বিড় করে। কারও সাথে তেমন কথা বলে না। নিজের মতো থাকে। শিক্ষকরাও তাকে নিয়ে উচ্চাশা করছেন না, ছাত্রীরাও তাই। যাইনাবকে ঘিরে যে আগ্রহ আর উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা স্তিমিত হয়ে যেতে সময় লাগল না।

তবে হ্যাঁ, কুরআন-এর ক্লাসে যাইনাবের তিলাওয়াত যে শুনেছে, সে একবার হলেও তার দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য হয়েছে। এত সুমধুর কণ্ঠ, যেন কুরআন তার কণ্ঠে নয়, হৃদয়ের গহীন থেকে ভেসে আসছে!

এভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল। এরই মাঝে চলে এলো সেকেন্ড টার্মের ফল প্রকাশের দিন। এই টার্মের ফলাফল বিবেচনায় যাইনাব দ্বিতীয়। সেই ঝিমিয়ে পড়া উত্তেজনা আবার জেগে উঠেছে। চারিদিকে শোরগোল। নতুন একটা মেয়ে, দেখলেই মনে হয়

Scanned with CamScanner

কোনো মেন্টাল ডিজঅর্ডারে ভুগছে, সে কিনা হুট করে ক্লাসে এসেই দ্বিতীয় হয়ে গেল!

শিক্ষিকারা বিস্মিত, একইসাথে খুশিও। তবে ছাত্রীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারও সাতেপাঁচে না থাকা, খানিকটা করুণার চোখে দেখা যাইনাবকে তার সহপাঠীরা এখন দেখতে লাগল ঈর্ষার চোখে। সেই সাথে অভিভাবকদের চিরাচরিত উস্কানি তো আছেই! যাইনাবের মতো একটা মেয়ে যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে, তবে তার সন্তান পারবে না কেন? কোন সুযোগ সুবিধা-থেকে তারা বঞ্চিত? পূর্ণ হতে শুরু করল বিদ্বেষের ষোলকলা।

মনের বিদ্বেষ মনে চেপে রাখা দায়। ঈর্ষান্বিত সহপাঠীরা যাইনাবকে নিয়ে গুজব রটিয়ে দিল। মেয়েটা নাকি অতিমাত্রায় অহংকারী। নিজেকে অন্যদের চাইতে উত্তম ভাবে। গোবেচারা সাদাসিধে যাইনাব এক নিমেষে পরিণত হলো ঘৃণার পাত্রীতে। এ ব্যাপারে ফারিহার অবদান একটু বেশিই ছিল বলা যায়।

[দুই]

জটিল অংকগুলোর নাম কেন যে সরল অঙ্ক—তা আসমার মাথায় ধরে না। সুমাইয়া মিস এসাইনমেন্ট দিয়েছেন। আগামী মঙ্গালবার জমা দিতে হবে। সবগুলো অংক করে ফেললেও একটা অংক কিছুতেই মিলছে না। এই সময়টাতে কোনো ক্লাস নেই আসমাদের। মেয়েরা কেউ কমন রুমে টেবিল টেনিস খেলতে চলে গেছে। কেউ ক্লাসরুমেই এসাইনমেন্টের ম্যাথ সলভ করছে। আসমার সাথে আমিনা আর ফারিহাও এসে যোগ দিয়েছে অংক মেলাতে। মিলছে না কিছুতেই।

একটু দূরে কোণার একটা বেঞ্চে যাইনাবকে দেখা যাচ্ছে। সামনে গণিত বই খুলে রাখা। বোঝা যাচ্ছে সে-ও এসাইনমেন্ট করছে। একটু পর যাইনাব বই গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'এ কী অংক রে বাবা! আমিও তো মেলাতে পারছি না। যাইনাবের হেল্প নিবি?' হাল ছেড়ে দেওয়া কণ্ঠে বলল আমিনা।

'এই যাইনাব!' ফারিহাও হাল ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। 'তুমি কি ম্যাথ এসাইনমেন্ট করেছ?'

যাইনাব জবাব দিল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেল। জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষ যে তাকে ডেকেছে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

Scanned with CamScanner

'এটা কী হলো!' রাগে ফারিহার গাল রক্তিম হয়ে গেছে। আত্মসম্মানেও লেগেছে কিছুটা। 'ডাকলাম অথচ একবার ফিরেও তাকাল না! গটগট করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল! কতটা অহংকারী হলে এমন করা যায়!'

আমিনা আর আসমাও অবাক। একবার তো ফিরে তাকাবে! এতদিন ওকে নিয়ে যে গুজব রটেছে তা তাহলে মিথ্যা নয়!

'চল, আমরা সুমাইয়া মিসের কাছেই যাই। এই অহংকারীর কাছে অংক বুঝতে বয়েই গেছে!' ফারিহার রাগ কমেনি এখনও।

'এত নেগেটিভ হচ্ছিস কেন! হয়তো তোর ডাক শোনেনি।' নিজের কানেই কথাটা হাস্যকর শোনাল আসমার। তবুও যাইনাবকে কেন যেন অহংকারী ভাবতে পারে না সে।

'ও কালা নাকি যে শুনবে না?'

আসমা চুপ। আসলেই যাইনাবের এমন আচরণের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। সুমাইয়া মিস টিচার্স-রুমেই ছিলেন। আমিনা উঁকি দিয়ে রুমে ঢোকার অনুমতি চাইতেই মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন মিস।

ফারিহা খাতা খুলে ম্যাথ দেখাতে উদ্যত হলো। তাই দেখে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখলেন তিনি। আর পাঁচ মিনিট পর নাইনের ক্লাসে যেতে হবে। আবার মেয়ে তিনটাকে ফিরিয়ে দিতেও খারাপ লাগছে।

'এখন যে ম্যাথ দেখিয়ে দেবার সময় নেই!' সুমাইয়া মিসের মুখে সেই চিরাচরিত হাসি। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমরা যাইনাবের কাছে যাচ্ছ না কেন? ও কিন্তু ম্যাথটা সলভ করেছে। তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবে।'

যাইনাবের প্রসঙ্গ ওঠায় বিরক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ফারিহা। 'যাইনাব মোটেও হেল্প করতে চায় না মিস। একটু আগেই ওকে আমরা ডেকেছিলাম, ফিরেও তাকায়নি!'

Scanned with CamScanner

এমন ভয়ানক অভিযোগেও মিসের চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। মার্কার আর ডাস্টার হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে।

'তোমরা নিশ্চয়ই ওকে দূর থেকে ডেকেছ?'

চেয়ারটা টেবিলের দিকে ঠেলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন সুমাইয়া। হাতে আর সময় নেই। চোখের ইশারায় মেয়েদের বুঝিয়ে দিলেন ক্লাসের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনজনকে বললেন যাইনাবের সমস্যার কথা। হিয়ারিং ডিফেক্ট আছে মেয়েটার। খুব কাছ থেকে গলা চড়িয়ে না বললে কানে শুনতে পায় না। তাই ফারিহার ডাকও শুনতে পায়নি।

ক্লাস-রুমে ওদের ফিরে যেতে বলে সুমাইয়া চলে গেলেন নাইনের ক্লাসে। তিনজন নিঃশব্দে ক্লাসরুমে এসে বসেছে। কারও মুখে কোনো আওয়াজ নেই। ভাবতেও পারেনি যাইনাবের সত্যিই কানে সমস্যা থাকতে পারে।

'আমরা কেমন খারাপ ধারণা করে বসলাম মেয়েটার ওপর, দেখলি! অথচ এক মুসলিমের আরেক মুসলিমের ব্যাপারে সুধারণা রাখার কথা।'

'আসলেই রে! আমার এখন ভীষণ খারাপ লাগছে!' আমিনার কথায় সায় দেয় আসমা।

ফারিহা তখনও চুপ। মনে মনে হিসাব মেলাচ্ছে। আসলেই কি ব্যাপারটা এত সরল? না-হয় যাইনাব কানে কমই শোনে, সে কথা এতদিন পর জানতে পারল কেন ওরা? কেন সে সবার সাথে মেশে না?

'শোন, তোরা অল্পতেই ধারণা পালটে ফেলিস। যাইনাব যদি এতই ভালো হয়, তো সবার থেকে আড়ালে থাকে কেন? কারও সাথে মেশে না, ছুটির ঘণ্টা পড়লেই দৌড়ে বাড়ির পথ ধরে, এমন আচরণের সাথে হিয়ারিং ডিফেক্টের কী সম্পর্ক?'

রাগে নাক তিরতির করে কাঁপছে ফারিহার। 'যাইনাব আসলে স্বার্থপর। একা একা পড়ে ভালো রেজাল্ট করতে চায়। সবাইকে এড়িয়ে যায়, পাছে সবাই তার ভালো রেজাল্টের রহস্য জেনে ফেলে!'

Scanned with CamScanner

আমিনা আর আসমা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফারিহার দিকে। কারও ব্যাপারে এতটাও ঘৃণা পুষে রাখা যায়!

[তিন]

ছুটির ঘন্টা পড়লে ঝিমিয়ে পড়া স্কুলটা যেন তড়াক করে জেগে ওঠে। ছাত্রীরা সব হইচই করতে করতে নিচে নেমে যায়। ফারিহারা নামে একদম শেষের দিকে, ভিড় ভাট্টা এড়িয়ে। যাইনাবও তাই।

আজ তিন বান্ধবী আবারও এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হলো। ফারিহারা সবে নিচে নেমেছে। যাইনাব সিঁড়ি দিয়ে ধীরে সুস্থে নেমে আসছিল। ওদেরই আরেক সহপাঠী ওর দিকে এগিয়ে গেল বিজ্ঞান বই হাতে। হয়তো কোনোকিছু বুঝে নিতে চাইছে যাইনাবের থেকে।

যাইনাব ডানে বামে মাথা নেড়ে কী যেন বলল মেয়েটাকে। এরপর স্কুল গেটের দিকে পা বাড়াল।

'ওহে সুধারণা পোষণকারী মুসলিম ভগিণীগণ, এখন তোমরা কী বলিবে?' বিদ্রুপের হাসি হাসল ফারিহা। 'এটাও হিয়ারিং ডিফেক্ট, তাই না?'

আমিনা দ্বিধান্বিত। এখন ফারিহার কথাই বেশি যৌক্তিক মনে হচ্ছে। তবে আসমা এক ভুল দ্বিতীয়বার করতে নারাজ।

'দেখ ফারিহা, সেদিনও তো আমরা কত কিছু ভেবে বসেছিলাম। পরে কী লজ্জাটাই না পেলাম! সূরা হুজুরাতের আয়াতটা ভুলে গেছিস?—'হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান পাপ...'

কুরআনের প্রসঙ্গ আনায় আমিনা ফারিহা দুজনেই চুপ। তবে তারা যাইনাবের ব্যাপারে এখনও সুধারণা করতে পারছে না। এখন পর্যন্ত যা দেখেছে তাতে তাকে নিরেট অহংকারী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না!

সত্যি বলতে যাইনাবকে ঘিরে আসমার মনেও অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। মেয়েটা কেন যেন নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সহপাঠীদের থেকে। কী লুকাতে চায় সে?—সাতপাঁচ না ভেবেই সেদিন যাইনাবকে ফলো করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে

Scanned with CamScanner

আসমা। একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছে সে, যাতে যাইনাব টের না পায়।

মেইন রোডে না গিয়ে স্কুলের পেছনে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়েছে যাইনাব। এই রাস্তাতে লোকজন খুব একটা নেই। সাবধানে পা চালাতে হচ্ছে আসমার। এই গলিতে আগে কখনও আসেনি। শহরে এত অলিগলি, কয়টাতেই বা পা রেখেছে সে! এখন একটু ভয় ভয় লাগছে। ঠিকমতো পথ চিনে ফিরতে পারবে তো!

কিছুদূর এগোতেই গলির শেষমাথায় পৌঁছে গেল তারা। একটা ডোবায় গিয়ে শেষ হয়েছে গলিটা। ডোবার ওপর বাঁশের সাঁকো। যাইনাব সহজভাবে সাঁকো পার হয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে আসমার পেটে প্রজাপতি উড়তে শুরু করেছে। ঝোঁকের মাথায় সাঁকোতে তো উঠেই পড়েছে, পার হবে কেমন করে?

'যাইনা-আ-আ-ব!'

এক হাত দূরে থাকা আসমার চিৎকারটা বেশ জোরেই ছিল। যাইনাবের শুনতে কোনো সমস্যা হয়নি। পেছন ফিরে দেখে সাঁকোর মাঝখানে আতঙ্কিত আসমা দাঁড়িয়ে।

'তুমি এখানে?'

'আ-আমি পড়ে যাচ্ছি যাইনাব! আমি সাঁকো থেকে পড়ে যাচ্ছি!'

যাইনাব আসমার কথা কতটুকু শুনতে পেল কে জানে, তবু বাকিটা সাঁকো তাকে হাত ধরে টেনে পার করে নিল।

'তুমি কোথায় যাচ্ছিলে আসমা?'

ভয়ে দিশেহারা আসমা ততক্ষণে বুঝে গেছে কোনোকিছু গোপন করে লাভ নেই। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে গড়গড় করে বলে দিল সব।

যাইনাব কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। শুধু বলল 'বাসায় এসে একটু বসে যাও।'

একটা পুরাতন বিল্ডিং-এর নিচতলায় যাইনাবদের বাসা। বেল বাজাতেই এক মধ্যবয়স্ক মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

অস্থির কণ্ঠে বললেন, 'এত দেরি করলে যে! আমার তো আরেক বাসায় কাজ আছে!'

Scanned with CamScanner

যাইনাব অপরাধীর হাসি হাসল। আসমা বুঝতে পারল ভদ্রমহিলা যাইনাবদের বাসার খাদেমা। যাইনাব বাড়ি ফেরা মাত্র অন্য বাড়ির কাজে চলে গেলেন তিনি।

ছোট্ট একটা বাসা। প্রথমেই একটুখানি স্পেস। এক পাশে রান্না ঘর। আরেকপাশে একটা দরজা, শোবার ঘর হবে হয়তো। সে ঘরেই আসমাকে বসালো যাইনাব।

বিছানায় একজন প্যারালাইজড মহিলা শুয়ে আছেন। যাইনাব পরিচয় করিয়ে দিল তিনি তার মা।

বছরখানেক আগে গাড়ি-এক্সিডেন্টে যাইনাবের বাবা মারা যান। সে গাড়িতে যাইনাব আর তার মা-ও ছিল। মা এখন জীবন্মৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। আর যাইনাবের আঘাত লেগেছিল মুখে। সে আঘাতেই তার শ্রবণশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। আত্মীয় স্বজনদের আর্থিক সহায়তায় মুখে প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল। তবু মুখের অস্বাভাবিকতা টের পাওয়া যায় এখনও।

'খাদেমা খালা ভোরে বাসায় আসেন, তার জিম্মায় মাকে রেখে স্কুলে যাই আমি। এরপর যতটা দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরে আসি। মাকে খাওয়াই, কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাই। দেখাশোনার ফাঁকে স্কুলের পড়া রেডি করি। এই হলো আমার রুটিন।'

হাসিমুখেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল যাইনাব। এতকিছুর পরও বিষণ্ণতা ওকে ছুঁতে পারেনি।

আসমা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ি ফিরতে যাইনাবের এত তাড়া কেন বুঝতে বাকি নেই আর। কী কঠিন সংগ্রামে দিন পার করছে মেয়েটা! আর তার সহপাঠীরা! তাকে নিয়ে যা নয় তা-ই বলে বেড়াচ্ছে! আসমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যে-করেই হোক সহপাঠীদের ভুল ভাঙাবে সে।

কাঁধে স্কুল-ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় আসমা। এখন বাড়ি ফেরা উচিত।

'স্যরি, তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম যাইনাব!'

হেসে মাথা নাড়ল যাইনাব, 'কী যে বলো না! তোমার সাথে কথা বলে ভালোই লেগেছে। অনেকদিন কারও সাথে গল্প করা হয় না জানো? চলো তোমাকে সাঁকো পার করে দিই।'

Scanned with CamScanner

'না, না, তার কোনো দরকার নেই।' একটু আগের ঘটনা মনে করে লজ্জায় লাল হয়ে গেল আসমা। জীবনের প্রথম সাঁকো পার হয়েছে। অযথা শংকায় কী চিৎকারটাই না দিয়েছিল!

এখন অবশ্য মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তার বয়েসী একটা মেয়ে কী অসীম দৃঢ়তায় দুর্বিষহ জীবন পার করে যাচ্ছে, আর সে সামান্য সাঁকো পার হতে পারবে না![১]

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।

Scanned with CamScanner

অনুশোচনা

আরমান ইবনে সোলাইমান

২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের কথা। ভালো কোনো কাজ না পাওয়ায় তখন ট্যাক্সি চালাতাম। একদিনের ঘটনা—আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায় ছুটে চলেছে আমার ট্যাক্সি। বাইরে মৃদু-মন্দ বাতাস। ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজছে প্রিয় মিশরী কারী রাশিদ-আফাসীর তিলাওয়াত—আমার অন্যতম প্রিয় সূরা আল-হাদীদ।

হঠাৎ চোখ পড়ল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তির দিকে। ভদ্রলোক হাত নেড়ে ট্যাক্সি থামানোর অনুরোধ করছেন। গন্তব্য কারমুজ। কথা না বাড়িয়ে তাকে গাড়িতে তুলে নিই। আমার হলুদ ঘোড়াটা তাকে নিয়ে শাঁ শাঁ করে গন্তব্যের দিকে ছুটতে থাকে।

কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অজ্ঞাত কোনো কারণে লোকটির মধ্যে অস্থিরতার ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি একবার হাঁটু নাড়াচ্ছেন। আরেকবার হাত কচলাচ্ছেন। কখনও আবার মাথা চুলকাচ্ছেন। কিংবা উদভ্রান্তের ন্যায় জানালার বাইরে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সর্বশেষ তার দৃষ্টি ক্যাসেট প্লেয়ারের দিকে নিবদ্ধ হয়।

এমন সময় সুললিত কণ্ঠে মিশরী রাশিদ তিলাওয়াত করেন—(অর্থ) 'যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে-সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদের এর আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর

Scanned with CamScanner

তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।'[১]

এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথেই লোকটি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। শিশুর মতো করে কাঁদতে থাকলেন। নিরুপায় হয়ে গাড়ি থামিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে দিলাম। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে শেষ আয়াতটি পুনরায় বাজানোর অনুরোধ করেন। আমি প্লেয়ার অন করে পুরো তিলাওয়াতটি শেষ হবার অপেক্ষা করতে থাকি। আর তিনি ক্রমাগত কাঁদতে থাকেন।

কান্না শেষ হলে ভদ্রলোককে কিছুটা হালকা মনে হয়। তার এই অস্বাভাবিক কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন—

'আমার নাম মুসাদ। হার্টের রোগী। বেশ কয়েকবার অ্যাটাকও হয়েছে। অ্যাটাক আসলেই প্রতিবার আমার সন্তানেরা প্রতিবেশী ডাক্তারকে ডেকে আনত। এক রাতের ঘটনা। গভীর রাতে আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। ব্যথায় অস্থির হয়ে আমি চিৎকার করতে থাকলাম। সন্তানেরা পাগলের মতো ছুটে গেল প্রতিবেশী ডাক্তারের দরজায়। শীতের সে-রাতে তিনি ঘুমের ভান করে দরজা খুললেন না। অতঃপর সন্তানেরা একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেল আমাকে। 'সরকারি' নামটার যথার্থ মর্যাদা রাখতেই হয়তো হাসপাতালের লোকজন আমার হার্ট অ্যাটাককে খুব একটা পাত্তা দিল না; বরং মুখের ওপর বলে দিল, 'ভোর হলে দেখা যাবে।'

সারারাত অবহেলায় এবং বিনা চিকিৎসায় সেখানেই পড়ে থাকলাম। আমার সন্তানদের পরেরদিন কাজে যেতে হবে। সে-সময় তাদের পক্ষে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকাটাও অসম্ভব ছিল। তাদের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাদের মিথ্যে বললাম—'এখন শরীর সুস্থ লাগছে। ব্যথা নেই। আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।'

বাড়ি ফিরে আমার ব্যথাটা এত বেড়ে গেল যে—আর সইতে পারছিলাম না। এদিকে ঘরের কাউকে ব্যাপারটি বুঝতে দিতেও চাচ্ছিলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম। কোনোরকমে মাহামাধ্যায়ার[২] কাছে এসে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। মনে হতে লাগল—সময় যেন থমকে গিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যুগের পর যুগ—এক

---

[১] সূরা আল হাদীদ : ১৬।

[২] আলেকজান্দ্রিয়ার একটি পুরাতন লেক।

Scanned with CamScanner

নিমিষেই কেটে যাচ্ছে। আমি সিজদায় পড়ে আছি। আমার আবেগ-অনুভূতির সবটুকু দিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহকে ডেকে চলেছি—

'আল্লাহ, তুমি হয়তো আমাকে এ কারণে শাস্তি দিচ্ছ যে, আমি তোমার ইবাদত করি না। এবারের মতো আমায় ক্ষমা করো। আর একটিবার আমাকে সুযোগ দাও। আর কক্ষনো-কোনোদিন এক রাকআত সালাতও আমার ছুটবে না।'

দুআয় কাজ হলো না। ব্যথা আরও বেড়ে গেল। আমি হাহাকার করে উঠলাম—

'থামাও ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য একটুও করুণা হয় না তোমার?'

কিছুক্ষণ পরই আমার ব্যথা কমে এলো। কখন যেন নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ভোরের নরম আলোয়। শরীর বেশ ফুরফুরে। চাঙ্গা। চারিদিকে পরম শান্তির একটি ভাব। দীর্ঘ ঝড়ের পর যেন সবকিছু শান্ত-নীরব। একটি পবিত্র স্নিগ্ধ আবহ সর্বত্র। আহা!

ঘটনার পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। আমার বুকে ব্যথা তো দূরের কথা; আর কখনও হার্টের সমস্যাও হয়নি। কিন্তু আমি আর এক রাকআত সালাতও আদায় করিনি। বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম সব—যেন এমন কোনোকিছুই কখনও ঘটেনি।

আজকের এই তিলাওয়াতটি যখন শুনছিলাম, মনে হচ্ছিল, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার সাথে কথা বলছেন। তাঁর ইবাদত না করায় যেন আমাকে কড়া ভাষায় শাসন করছেন। ওয়াল্লাহি! আমি এই ভয়ে কাঁদছি না যে, আল্লাহ আমাকে আবারও অসুস্থ করে দিতে পারেন। আমি কাঁদছি লজ্জায়, নিজের প্রতারণার লজ্জায়। পরম করুণাময় আমার কথা রেখেছেন, আমার দুআ শুনে আরও একটি সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু আমি? আমি করেছি শুধুই প্রতারণা![১]

[১] একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

Scanned with CamScanner

জীবনসায়াহ্নে

আরিফ আজাদ

বাবা আর তার ছোট্ট ছেলে মিলে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাওয়া পৌঁছে দিতেন। মানুষকে বোঝাতেন আল্লাহ সম্পর্কে, মানুষের জীবন-মরণ, আখিরাত সম্পর্কে। প্রতি জুমাবার ছিল তাদের দাওয়ার কাজে বের হবার দিন। তুষারপাতের দেশ। বৈরি আবহাওয়া। এমন জুমাবারে ছোট্ট ছেলেটা তার বাবার কাছে এসে বলল, 'আব্বু, চলো। আমি কিন্তু প্রস্তুত!'

বাবা অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় সোনা?'

'কেনো? আজকে জুমাবার না? আজ না আমাদের দাওয়ার কাজে বের হওয়ার কথা?'

বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ সোনা! কিন্তু, বাইরে তাকিয়ে দেখো। প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। বের হবার মতো কোনো অবস্থা নেই। তাই, আমি ঠিক করেছি আমরা আজ বাইরে বের হবো না'।

বাবার কথায় ছেলেটা বেশ অবাক হলো। বলল, 'আব্বু, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে কি মানুষ জাহান্নামে যাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে গেছে?'

ছেলের গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশ্নে বাবা কপাল কুঁচকালেন। বললেন, 'কিন্তু সোনা আমার! এমন পরিস্থিতিতে বাইরে কাউকে দাওয়া দেওয়ার জন্য পাওয়া যাবে না'।

Scanned with CamScanner

বাবার এই কথার বিপরীতে ছোট্ট ছেলেটি বলল, 'আব্বু, আজ তুমি দাওয়ার কাজে যেতে না চাইলে যেয়ো না। তবে আমি কি যেতে পারি?'

বাবা কিছুটা অবাক হলেন। হালকা ইতস্ততবোধ করলেন। এরপর বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। ওইদিকে দাওয়ার বই এবং ম্যাগাজিনগুলো রাখা আছে। ব্যাগে নিয়ে নাও। আর শোনো, সাবধানে যাবে কিন্তু। খুব বেশিক্ষণ বাইরে থেকো না। দেখতেই পাচ্ছ, বাইরের আবহাওয়া খারাপ...'

ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে বাবার কথাগুলো শুনল। টেবিলে রাখা বইপত্র এবং ম্যাগাজিন ব্যাগে ভরে বাবাকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দাওয়ার কাজে। আজ তার সাথে তার বাবা নেই। আজ সে একা।

এরকম তুষারপাতের মধ্যে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে সে দাওয়ার বই এবং লিফলেটগুলো বিলাতে লাগল মানুষের কাছে। যাকেই পাচ্ছে তার হাতে একটি করে কপি ধরিয়ে দিচ্ছে।

এভাবে কাটল দুই ঘণ্টা। বরফ, শীত আর ঠান্ডা হাওয়ায় ছেলেটার শরীর যেন জমে আসছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসার মতো অবস্থা। এই মুহূর্তে তার হাতে আর মাত্র একটি বই; কিন্তু দেওয়ার মতো কাউকেই সে রাস্তায় খুঁজে পাচ্ছে না। রাস্তায় কেউ আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে।

সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। যদি কেউ একজন আসে। কিন্তু না। কেউই এলো না। সে মোড় ঘুরে যেদিকে ফিরল তার সোজাসুজি একটি বাসা দেখা যাচ্ছে। সেই বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। শীতে তখন সে থরথর করে কাঁপছে। সে বাসার কলিংবেল বাজাল। একবার, দুইবার, তিনবার।

উহু! কারও কোনো সাড়া নেই। সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আরও কয়েকবার কলিংবেল বাজাল। দরজায় কড়া নাড়ল; কিন্তু কোনো সাড়াই মিলল না। হতাশ হয়ে সে চলে আসার জন্য সামনে পা বাড়াল; কিন্তু কী এক অদ্ভুত টানে যেন সে আবার কলিংবেলটার কাছে এলো। এসে আবার সে কলিংবেলটি বাজাল এবং দরজায় ধাক্কা দিল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে—ভেতরে কেউ আছে।

একটুপরে ভেতর থেকে আস্তে করে দরজাটি কেউ একজন খুলল। ছেলেটি দেখল তার সামনে একজন মধ্য বয়স্ক ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাকে দেখেই

Scanned with CamScanner

ছেলেটি ফিক করে হেসে ফেলল। যেন শীতে শরীর জমে যাওয়ার সব কষ্ট সে মুহূর্তেই ভুলে গেছে।

মহিলার দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আন্টি, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমি আপনাকে যে-কথাটি জানাতে এসেছি সেটি হলো আর কেউ আপনাকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, পৃথিবীর আর কেউ আপনার কেয়ার করুক বা না করুক, আপনার খোঁজ করুক বা না করুক, আমাদের রব মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার কেয়ার করেন এবং আপনার প্রতি তিনি অবশ্যই দয়াবান। এই যে দেখুন, আমার হাতে থাকা এটিই শেষ বই। এই বইটি পড়লে আপনি আপনার রবের ব্যাপারে জানতে পারবেন। নিন এই যে ধরুন...!'

মহিলা মুখ ফুটে কিছুই বলল, না। ছেলেটি মহিলার হাতে বইটি দিয়েই দৌড় দিল।

পরের জুমআবার। ইমাম সাহেব সালাতের পরে কিছুক্ষণ বক্তব্য দিলেন। এরপর প্রতিবারের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'কারও কি কোনো ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসা আছে?'

মহিলাদের পাশ থেকে হিজাবে আবৃত একজন মধ্য-বয়স্কা মহিলা স্পিকারের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাদের কেউই আমাকে চেনেন না। চেনার কথাও না। গত জুমআবার অবধিও আমি ছিলাম একজন অমুসলিম। আমার স্বামী বছর দু-এক আগে মারা যান। স্বামী মারা যাবার পরে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আমার আপনজনেরাই আমাকে পর করে দেয়। আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে। আমার দুনিয়াটা এতই বিষাদ হয়ে উঠেছে যে, আমার মনে হচ্ছিল, আমি জীবিত থেকেও মৃত। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—আত্মহত্যা করব।

দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে তখন আমি আত্মহত্যার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছি। একটু পরেই আমি বিদায় নেব এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে, যে-পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই, কেউ না।

যেই আমি চেয়ারে উঠে আত্মহত্যার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে যাব, অমনি হঠাৎ আমার বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলাম—দরজা খুলব না; কিন্তু খেয়াল করলাম আমার কলিংবেলটি অনর্গল বেজেই চলছে, বেজেই চলছে। কোনো থামাথামি নেই। একটু পরে দরজা ধাক্কার শব্দ পেলাম। ভাবলাম কে হতে পারে?

Scanned with CamScanner

সাতপাঁচ ভেবে এসে দরজা খুললাম। দরজা খুলতেই দেখি ফেরেশতার মতো একটি ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে আমার দরজার বাইরে দাঁড়ানো। আমি বুঝতে পারছিলাম, বাইরের হাড়-কাঁপানো কনকনে ঠান্ডায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। তবুও আমাকে দেখে সে মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে বলল, 'আন্টি, পৃথিবীর কেউ আপনাকে ভালো না বাসলেও একজন আছেন, যিনি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার কেয়ার করেন'। এরপর আমার হাতে একটি বই ধরিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল।

সে চলে যাবার পরে আমি বইটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমার টাঙানো দড়ি তখনও ফ্যানের সাথে ঝুলছিল। আমি আগ্রহবশত বইটি উল্টালাম। খুব মনোযোগ দিয়ে বইটির প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে ফেললাম। এরপর?

এরপর আমি লাথি দিয়ে আমার আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত করা চেয়ারটাকে ভেঙে ফেললাম। হেঁচকা টানে ফ্যান থেকে দড়িটি ছিঁড়ে ফেললাম। সে-সবের আর দরকার নেই আমার। কারণ, খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট উপকরণের সন্ধান ততক্ষণে আমি পেয়ে গেছি। সেদিনই আমি কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করি।

মহিলা বলে যেতে লাগল, 'মুহতারাম! ছোট্ট ছেলেটার দিয়ে যাওয়া বইটার পেছনে আমি এই মসজিদের ঠিকানাটি পেয়েছি। তাই আজ এখানে ছুটে এসেছি। আমি কেবল সেই ছোট্ট ছেলেটাকে একবার কপালে চুমু খেয়ে একটি ধন্যবাদ দিতে চাই এজন্য যে, একদম ঠিক সময়ে সবকিছু শেষ হয়ে যাবার ঠিক একটু আগেই সে আমাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিল...'

ঘটনা শুনে উপস্থিত জনতা 'হু-হু' করে কাঁদতে শুরু করল। ইমাম সাহেবের সামনের আসনেই ছোট্ট ছেলেটি বসে ছিল। ইমাম সাহেবও অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন এবং সামনে বসে থাকা তার দশ বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন। মনে হচ্ছে—এমন গর্বিত পিতা বোধকরি পৃথিবীতে আর একজনও নেই...[১]

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।

Scanned with CamScanner

স্বপ্নেরা বেড়ে ওঠে

শারিন সফি অদ্রিতা

[এক]

দূর থেকে ছেলের কাণ্ড দেখে ফিক করে হেসে দিল আয়িশা। যদিও সে মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছে যে, কী ঘটেছে; তাও সেটি নিজের পুত্রের মুখ থেকে শোনার লোভ সামলাতে পারল না। পিচ্চি বাথরুম থেকে বের হয়ে এলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল, 'বাথরুমের সামনে আমার আব্বুকে আজ একটু অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখলাম, ঘটনা কী উমার?'

উমার হাত-পা নাড়িয়ে জাতির বিশাল সমস্যা ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো করে বলল, 'উফ! আর বোলো না, আম্মু! বাথরুমে যে বাম-পা দিয়ে ঢোকার কথা, আমার সেটা মনে-ই থাকে না! শয়তান খালি ভুলিয়ে দেয়! আমি তো আজকেও বাথরুমে ঢোকার সময়ে ডান-পা দিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম! ঢুকেই যখন মনে পড়ল, ডান পা দিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করা সুন্নাহসম্মত নয়, অমনি আবার লাফ দিয়ে বের হয়ে গেছি। তারপর আস্তে আস্তে বাম-পা দিয়ে ঢুকেছি! কত ভালো করেছি না, বলো, আম্মু?'

'ভালো মানে! তুমি ভালোর ওপর ভালো করেছে। মা শা আল্লাহ! মা শা আল্লাহ!!'— বলেই উমারকে আদর করে কোলে টেনে নিল আয়িশা।

Scanned with CamScanner

[দুই]

বিকেলে পাশের বাসার নিতু-ভাবি এসেছেন। আয়িশা তার জন্য চা বানাচ্ছে। এরই মধ্যে উমার সেখানে উপস্থিত। 'আম্মু, হেল্প করব? চা-টা কি আন্টিকে দিয়ে আসব?'

'নো থ্যাংকস, আব্বু। আমিই দিচ্ছি। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।'

উমার অভিমানে গাল ফুলিয়ে মাকে বলে, 'কী আম্মু! তুমি বুঝি আমাকে আল্লাহর কাছ থেকে একটু প্লাস-পয়েন্টও নিতে দেবে না? এমন করছ কেন?'

'প্লাস পয়েন্ট পেতে চাও? তবে লিভিং রুমে গিয়ে আন্টিকে সালাম দিয়ে এসো? একেবারে ফুল ভার্সনটা দেবে। আল্লাহর কাছে তোমার নামের সঙ্গে গুণে গুণে ৩০টা প্লাস পয়েন্ট জমা হয়ে যাবে। তবে দেরি কেন? এখনই যাও!'

শুনেই উমারের দৌড় দেখে কে? পিরিচে বিস্কিট রাখতে রাখতেই আয়িশা ওর সালামের জোরালো ধ্বনি শুনতে পায়, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আন্টি।'

'হায়রে ছেলে আমার।'

ট্রে নিয়ে নিতু-ভাবির ঘরে ঢুকে আয়িশা বলল, 'এই উমার, আমি কি তোমাকে বলেছি, চিৎকার করে সালাম দিলে বেশি পয়েন্ট পাবে?'

উমারের অত-শত খেয়াল নেই। সে আম্মুর দিকে তাকিয়ে বিশ্ব-জয়ের হাসি দিয়ে বলল, 'তিরিশ নেকী আম্মু! তিরিশ নেকী!!'

'নিতু ভাবি! কিছু মনে করবেন না, প্লিজ! তিন ব্যাটারীর ছেলে হলে যা হয় আরকি!'

'আরে ভাবি! কিছু মনে করার আগেই তো মন ভরে গেল, মা শা আল্লাহ!'

উমারের ততক্ষণে খেলতে যাবার সময় হয়ে গেছে। খেলতে যাবার অনুমতি চেয়ে মাকে বলল, 'আম্মু, আমি যাই?'

'যাও আব্বু, আর কখন ফিরতে হবে, বলো তো দেখি?'

Scanned with CamScanner

'মাগরিবের সালাত শুরু হবার কমপক্ষে আধাঘন্টা আগে ফিরব, আম্মুজি। তারপর ওযু করে আব্বুর সাথে সোজা মসজিদ!! আর আজকে এ সপ্তাহের দুআগুলো মুখস্থ শোনানোর দিন। সেটাও শোনাবো, আম্মু! এখন আমি যাই। আম্মু, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে... 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'।

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঠিক আছে, আব্বু। তাড়াতাড়ি যাও তবে।'

'ফী আমানিল্লাহ' বলে হাসিমুখে আয়িশা বিদায় দিল তার কলিজার টুকরাকে।

কৌতূহলী নিতু জিজ্ঞেস করল, 'কীসের দুআ ভাবি?'

'প্রতি সপ্তাহে ওকে একটি করে দুআ শেখাই, ভাবি। যেমন এই সপ্তাহজুড়ে ওকে বাথরুমে ঢোকার দুআটি শেখাচ্ছি। প্রতি মঙ্গলবার ওর থেকে পেছনের দুআগুলো শুনি। সেটির কথাই বলছিল।'

'ইয়া আল্লাহ, ভাবি! ও তো এখনও অনেক ছোট! মাত্র ক্লাস ওয়ানে...! এখন থেকেই এত কিছু!!' নিতু ভাবির বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

এবার আয়িশা একটু নড়েচড়ে বসল। মনে হলো, এই প্রশ্নটির জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'আসলে ভাবি, বাচ্চারা সৃষ্টিগতভাবেই নিষ্পাপ থাকে। ওদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতাকে অনেকটা কাদার সাথে তুলনা করা যায়। কাদাকে যেমন একটি আকৃতি দিয়ে ফেলে রাখলে সেটি পরে শক্ত হয়ে যায় তেমনি ছোট থাকতেই বাচ্চাদের যে-রকম মন-মানসিকতার মাধ্যমে বড় হতে দেওয়া হয়—সেটাই পরে ওদের মনে শক্ত হয়ে গেঁথে যায়।

তাই এখন থেকেই যদি তাদেরকে একটু একটু করে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায় তাহলে বালেগ, মানে টিনএজ হলে, সেটিই ওদের মধ্যে শক্ত হয়ে গেঁথে যাবে। ওরা তখন বুঝবে যে, আমি দরজা লাগিয়ে যা করছি, সেটি আম্মু-আব্বু না দেখলে কী হয়েছে, আল্লাহ তো ঠিক-ই দেখছেন'

তখন দেখা যাবে যে আব্বু-আম্মুর পাহারা দেওয়া ছাড়াই ওরা পাপ থেকে বিরত থাকতে পারছে, ইন শা আল্লাহ।'

Scanned with CamScanner

'হুম! এভাবে তো ভেবে দেখিনি, ভাবি! টিনএজারদের কথা আর বলবেন না। মাঝে মাঝে ওদেরকে দেখে রীতিমতো কান্না পেয়ে যায়! ছোট ছিল, কত ভালো ছিল। টিনএজ হয়েছে তো আর কীসের মা, কীসের বাবা!'

'না-না ভাবি! এটাও আমাদের বুঝতে হবে যে, বাচ্চারা টিনএজ হয়ে গেছে মানে, ওরা আল্লাহ'র দৃষ্টিতে বালেগ হয়ে গেছে! এখন থেকে ওদের কাজের জন্য ওরাই দায়ী! কিন্তু এর আগ পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের জ্ঞান দান করা এবং ইসলামের আলোকে জীবনের সকল প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধান করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তোলা মা-বাবার জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এই কর্তব্যের গুরুভাগটুকু বাচ্চাদের শৈশবেই পালন করতে হবে, ভাবি। বাচ্চারা বড় হলেও অবশ্য মা-বাবার দায়িত্ব একেবারে শেষ হয়ে যায় না! তবে শৈশবেই যদি ওদেরকে দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া না-যায়, তাহলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ওদের লাইফ স্টাইল বেছে নিতে পারে। তখন ওদেরকে সত্যের দিকে ফেরানো কঠিন হয়ে পড়ে!'

'ভাবি! কীভাবে কী করব! বাচ্চাদের তো এখনই এইসব কঠিন বিষয় নিয়ে ভাবানো যাবে না, নাকি যাবে? আর চারপাশে খালি ভিডিও গেইমস, টিভি–বিনোদন বলতে যা আছে, তা কেবলই নষ্টামি। এগুলোর কোনোটাই ওদেরকে ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে না; বরং ওদের ভালো দিকগুলোও কেড়ে নেবে। এবার বলুন, ভাবি, এগুলো থেকে বাঁচার উপায় কী? কিংবা এসবের বিকল্প হিসেবে ওদেরকে কী দেওয়া যায়?'

'ইন শা আল্লাহ, সেটির-ও ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবি! আমরা ইসলামকে কঠিন করলেই সেটি কঠিন! এখানে জীবন বিধান পানির মতো পরিষ্কার! এখানে আমরা কঠিন-সোজার হিসেবে না গিয়ে যেটি সত্য, সেটিকে সত্য বলে মানব!

আর ওদের আনন্দ দেবার জন্য হালাল বিকল্পও আছে তো! ধরেন, বাইরে মাঠে খেলতে দেওয়া যায়। এতে অন্তত আজকালকার ভিডিও গেমস-এর ভায়োলেন্স আর অশ্লীল ফিতনা থেকে দূরে থাকবে।

Scanned with CamScanner

তাছাড়া ছোট থেকেই আঁকা-আঁকি বা আর্ট জাতীয় কাজ[১] পছন্দ করলে সেটাতে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে। রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্য যদি বাচ্চাদের সাথে রাখা যায়, তাতে ওরাও বেশ মজা পায়।

সর্বোপরি টেকনোলজিও এখন অনেক উন্নত ভাবি! বিভিন্ন সফটওয়্যারে মজার মজার ম্যাথ বা সায়েন্স গেমসও পাওয়া যায়। আমার উমার তো সেগুলো খেলেও অনেক মজা পায়! এতে ওর ব্রেইনও প্রোডাক্টিভ কিছু করার সুযোগ পায়। খেলতে খেলতে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পায়।

আবার ইউটিউবেও আজকাল বাচ্চাদের ইসলামশিক্ষার উপযোগী মজার মজার অনেক সুন্দর ভিডিও আছে। সেগুলো কার্টুন নেটওয়ার্কের বিকল্প হতে পারে।

আর সবচেয়ে সেরা বিকল্প কী হতে পারে জানেন, ভাবি? ওদেরকে কুরআনের কিছু সূরা মুখস্থ করার কাজে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে। আমার পরিচিত এক দ্বীনি বোনের ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। সে কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করে, 'এই তোমার কয়টি সূরা মুখস্থ? জানো, আমার না বাইশটি সূরা মুখস্থ, হুম!'

'হা হা!'

'মা শা আল্লাহ!

পিচ্চিটা গড়গড় করে লম্বা লম্বা সূরাগুলো মুখস্থ বলে যায়। দেখলে আমাদের-ই লজ্জা লাগে! ওর মাথায় নিশ্চয়ই ভিডিও গেমসের কথা কখনও আসে না! আল্লাহ তাআলার কালামের সাথে ওর অন্তরকে ছোট থেকে এমনভাবেই গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, সেটি মুখস্থ করাই ওর এন্টারটেইনমেন্ট! সেজন্য বলিউড, হলিউড, ভিডিও গেমস লাগে না, অযাচিত ফ্রেন্ড সার্কেলে জড়ানোর ভয়টাও থাকে না।

তো ভাবি, খুঁজলে এরকম হালাল উপায় ও বিনোদন অনেক পাওয়া যাবে, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আন্তরিকভাবে চাইলে তিনি ঠিকই দরজা খুলে দেবেন।

'থ্যাংক ইউ ভাবি! আপনি তো যাকে বলে, আমার চোখ খুলে দিলেন!'

---

[১] ইসলামে যে-কোন প্রাণীর ছবি আঁকা নিষেধ। এছাড়া অন্য যে-সকল আর্ট শরীআত সম্মত তা শেখানো যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

'আরে ধুর ভাবি! আমি তো খালি অসিলা। সকল প্রশংসা সেই রবের যিনি আমাকে অসিলা করে আপনাকে এসব জানার সুযোগ করে দিলেন, আলহামদু লিল্লাহ!'

'ভাবি, এখন উঠি তাহলে?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে ভাবি। ও ভাবি, আরেকটি কথা!' নিতু-ভাবির ফের আবদার। সে আরও কিছু শুনতে চায়।

আয়িশা নিতু-ভাবির মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে বলেন, 'জি, বলেন ভাবি।'

'মা-বাবার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার কী?'

'ভাবি! সন্তানের জন্য মা-বাবার পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বা পুরস্কার হলো মা-বাবার সময়। মা-বাবা সবসময় সন্তানকে সঙ্গ দেবে। সন্তান যেন মা-বাবাকে অভিভাবক হিসেবেও পায়, আবার বন্ধু হিসেবেও পায়। মন খুলে কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে হলে, বাচ্চা যেন সবার আগে মা-বাবার কাছেই ছুটে আসে। আর কারও কাছে না।

আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন—বাচ্চাদেরকে ইসলামের পরিচয়, ইসলামের আলোকে মা-বাবার পরিচয় এবং সেই সূত্র ধরে সন্তানের জন্য তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম হয়ে ওঠার গল্পগুলো শোনানো যাবে। বুঝলেন ভাবি?'

'ইন শা আল্লাহ, ভাবি! অনেক দুআ করবেন, আমার বাচ্চাদের যেন ইসলামের আলোকে নেককার-বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।'

'আমীন, ভাবি! আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। ফী আমানিল্লাহ।'

'ফী আমানিল্লাহ। আল্লাহ-হাফেজ, ভাবি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

'আচ্ছা! আমিও নেব দশ নেকী। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে এভাবেই দুজনের সুন্দর বিকেলটা শেষ হলো।

Scanned with CamScanner

এক চিলতে রোদ

সারওয়াত জাবীন আনিকা

'এত চিল্লানোর কী আছে? আমরা কি বাচ্চাকাচ্চা পয়দা করিনি নাকি? আজকালকার মেয়েদের এত নখরা! বাবা রে বাবা!'

কথাগুলো কানে যেতেই ফাইলে এডমিশন অর্ডার লিখতে লিখতে আড়চোখে ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল মুবাশ্বিরা।

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই ধরনের কথা, এই ম্যাটারনিটি ইউনিটে ডিউটির সেই প্রথম থেকেই শুনে যাচ্ছে মুবাশ্বিরা। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার নিজের কাজে মন দিল। সিনিয়রদের উপদেশ মনে করিয়ে দিল—এই ইউনিটে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়! ইমোশনাল হওয়া মানেই নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলা।

হাতের ঘড়ি টিকটিক করে জানান দিল রাত ২টা বাজে। নিজের ৭ মাসের ছুটকুটা বাসায় ওর বাবার কাছে, কাজ গুছিয়ে একটু ফোন করতে যাবে তখনই এই রোগীটি এল। ব্যথার তোড়ে একটু পরপর দমকে দমকে উঠছে মেয়েটা। আর সাথে একরাশ বিরক্তি নিয়ে তার এটেন্ডেন্ট। ওয়ার্ডের বাইরে আরও দুই-তিনজন দাঁড়িয়ে। সবার চোখে-মুখে ঘুম আর বিরক্তির ছাপ।

Scanned with CamScanner

নার্সের হাতে এডমিশন অর্ডারটা দিয়ে মহাবিরক্তি নিয়ে গজগজ করতে থাকা বয়স্কার কাছে গিয়ে মুবাশ্বিরা বলল, 'এখনও সময় আছে। প্রথম বাচ্চা! সময় লাগবে। আপনারা হালকা কিছু খাবার খেতে দেন রোগীকে। আর বিশ্রাম নেন। অস্থির হবেন না, যার আসার সে সময়মতো আসবে। আর রোগীকে ঘুমোতে দেন, ওর শক্তি দরকার।'

বয়স্কা আরও বিরক্তি নিয়ে ফোঁস করে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যত্তসব! আজকালকার মেয়েরা! এতটুকু সবর নাই আবার মা হতে এসেছে সব। বললাম কত করে, সকাল পর্যন্ত হাসপাতালে আসার দরকার নাই। না, তার এক্ষুনি আসা লাগবে! আমরা আর বাচ্চার মা হইনি! বাড়িসুদ্ধ সবাইকে হয়রানি...'

গজগজ করতে করতে প্রস্থান করলেন তিনি অপরাধিনীকে ফেলে। অপরাধিনী তখন অনেক কষ্টে চোখ উপচে পড়া জল আটকানোর চেষ্টা করছে।

আহারে, কী কষ্ট বুকের ভেতরে! অথচ এদিকে লজ্জাও! মা হওয়ার লজ্জা, অসহায় হওয়ার লজ্জা, সবাইকে কষ্ট দেওয়ার লজ্জা—এ লজ্জা আর বাক্যবাণের কষ্টের পাশাপাশি মা হওয়ার কষ্ট, আছে বাচ্চাকে নিয়ে আশঙ্কা, আছে নিজের সম্পূর্ণটুকু অপরিচিত ডাক্তার-নার্সের সামনে উন্মুক্ত করার জড়তা। এই সময়টা নিজে পার করে এসেছে মুবাশ্বিরা। আলতো করে মেয়েটার মাথায় হাত রেখে বলল, 'একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন। সময় হলে আসল পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে এখন যতটা পারেন বিশ্রাম করুন।'

নিজের রুমে এসে খোকনকে ফোন করল মুবাশ্বিরা, 'সুহাইল কী করে? ঘুমিয়েছে?'

'ম্যাডাম, আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি। কেন জানেন?'

ওইপ্রান্ত থেকে খোকনের ঘুম-ঘুম গলার উচ্ছ্বাস শুনে একটু বুঝি গাল লাল হলো মুবাশ্বিরার। লাজুকভাবে হেসে দিল সে।

'আমি তোমার জন্য আজ আম্মুকে জড়িয়ে ধরে বলেছি—আম্মু, আমাকে মাফ করে দাও। তোমাকে সারাজীবন বহুত জ্বালিয়েছি। কীভাবে পারো তোমরা? ক্লান্তি নাই বিরক্তি নাই! এই ছয় ঘণ্টায় আমার তো খবর হয়ে গেছে! তাও আম্মু আছে আমার সাথে। সেই যে বাঁদরঝোলা হয়ে ঝুলছে তুমি যাওয়ার পর থেকে। আর তুমি তো আরও এক কাঠি ওপরে! আমি নিজে ডাক্তার তবুও এভাবে বাড়ি-ওয়ার্ড সামলাতে পারতাম না। হ্যাটস অফ!'

Scanned with CamScanner

মুবাশ্বিরা একটু হেসে দিয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ ফর দ্যা এপ্রিসিয়েশন। এভাবেই যদি প্রতিটি হাজব্যান্ড তাদের ওয়াইফকে এপ্রিশিয়েট করত তাহলে মেয়েদের জন্য সব হ্যান্ডেল করা আরও সহজ হতো। যাই হোক সুহাইল ঘুমিয়েছে?'

'আপনার বাঁদর আমার বুকের ওপর উঠে ঘুমাচ্ছেন। ফিডার খাইয়েছি, ডায়াপার পালটে দিয়েছি। উফ! কী গন্ধ! কী যে খায়...আই মিন...!'

টুকটাক কিছুক্ষণ কথা বলে ঠোঁটে হাসি নিয়ে মুবাশ্বিরা লাইন কেটে দিল। এই জায়গাটি সে একদিনে পায়নি। আস্তে আস্তে একটু একটু করে আদায় করে নিয়েছে। শুরুতে তো খোকন পানির গ্লাসটার জন্যও ওর শাশুড়ি কিংবা ওকে ডাকত। এখন নিজেই সব করে। ওর শাশুড়িরও অনেক অবদান আছে। এখানে প্রচণ্ড সম্মান করে মুবাশ্বিরা তার শাশুড়িকে। পরিবর্তনকে কেউ ভালো চোখে দেখে না আর তা যদি বাড়ির বউয়ের হাত ধরে আসে তাহলে তো আর কথা-ই নেই। সাথে আছে সামাজিক অনাচার। ছেলের বউয়ের সব খারাপ! বউ তো ছেলেকে পুষ্যি নিয়ে নিচ্ছে। নিজে কষ্ট পেয়েছি বউটাকেও দেখাতে হবে এখন। কী এক অদ্ভুত প্রথা!

ওর শাশুড়ি এমন কিছুই করেননি। শুরুতে বুঝতে সময় লেগেছে দুজনেরই। সম্পূর্ণ দুই দুনিয়ার মানুষ ওরা; কিন্তু দু'পক্ষের এক হতে সময় লাগেনি। মুবাশ্বিরাও যেমন তাকে মায়ের সম্মান দিয়ে মাথা নত করেছে আর তিনিও বউমাকে মেয়ের মতোই আগলে নিয়েছেন। এমনটি সবখানে হয় না; কিন্তু হলে কত যে ভালো হতো!

'ইন শা আল্লাহ, আমার সুহাইলের বউটাও আমাকে এইভাবে ভালোবাসবে, সম্মান করবে। যেমনটি—আমি আম্মাকে করি। ইন শা আল্লাহ, মার কাছ থেকে শিখে শিখে আরও ভালো শাশুড়ি হব। এসব ভেবে একা একাই ফিক করে হেসে উঠে মনে মনে বলে—হায়রে মা! মাত্র ৭ মাসের পিচুয়াকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে এখনই!

মা—তাই না!

কত যে আবেগ জড়ানো আছে শব্দটার মাঝে! সুহাইল পেটে থাকার কথাগুলো মনে পড়ল মুবাশ্বিরার। টুকুশ টুকুশ করে নড়ত। প্রথম যেদিন নড়াচড়া টের পেয়েছিল সালাতে দাঁড়িয়ে, কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। বারবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে আর বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করেছে। ২৮ সপ্তাহ থেকে ফিটাসের অডিটরি ফাংশন ডেভেলপ করে ও কুরআন তিলাওয়াত করলেই সুহাইল

Scanned with CamScanner

চুপ করে থাকত, যেন সে কত বোঝে। খোকন তখন এমফিল কোর্সে ঢাকায় আসত, যেত—যখন ছুটি ম্যানেজ করতে পারত। পুরো প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড মোহনপুরের ডক্টরস কোয়ার্টারে একা একা কাটিয়েছে মুবাশ্বিরা। শুধু একজন ছুটা-বুয়া এসে রান্নাবান্না-সহ ঘরের কাজ করে দিয়ে যেত। কত কষ্টে পাওয়া সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা কল্পনাতেও আসে না। কত কী যে শখ হতো। একটু ভালো-মন্দ খাওয়া—এই ভর্তা, সেই আচার। ডিউটি শেষে একটু ঘুরতে যাওয়া—কোনোকিছুই করতে পারেনি ওরা। পাশের ফ্ল্যাটের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ভাইয়ের ওয়াইফ ভালো-মন্দ কিছু করে খাওয়ালে বা সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ এসে বসলেও যে কী কৃতজ্ঞ বোধ করত!

এই মায়াগুলোই ওকে কষ্ট করার শক্তি যুগিয়েছিল। বারবার বদলির কাগজ নিয়ে ছোটাছুটি করে সুহাইল হওয়ার এক মাস আগে শেষমেশ অনেক চেষ্টার পরে বদলির অর্ডার পেল। ঢাকায় এসে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জয়েন করে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারল। তখন নিজের মা-বাবা, শাশুড়ি জামাই ও ছোট ভাই সবাই কাছে। তবুও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কী হুকুম! লেবার পেইন ডিউটিতে থাকতেই উঠল। খোকনের তখন পরীক্ষা চলে। পরীক্ষা শেষ করে বেরিয়ে দেখে সবার মিসড কল। খবর পেয়ে যখন এসেছে তখন সুহাইল প্রায় চলে এসেছে।

আহারে জীবন! মুবাশ্বিরার সারা শরীর যন্ত্রণায় ছিঁড়ে আসছিল। আর শুধু একজনেরই হাতের আশ্রয় খুঁজছিল। সুহাইলকে ওর বুকের ওপর যখন দেওয়া হলো—এইটুকু সাদা-লাল-গোলাপিতে মেশানো একহাত সাইজের একটি ছোট্ট মানুষ; না কেঁদে পিটপিট করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে যেন। সুহাইলের পিঠে হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে মুবাশ্বিরা ব্যথায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে শুধু মা আর শাশুড়িকে প্রশ্ন করেছে—'ও এসেছে, ও এসেছে?'

তখন ওর বাচ্চা 'ছেলে না মেয়ে' তা জানার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি ছিল—খোকন বন্ধ দরজার ওপারে কি না। ওভাবেই জ্ঞান হারিয়েছে। মুবাশ্বিরা চোখ মেলে মাথায় খোকনের হাতের ছোঁয়া পেয়ে, পোটলা করা সুহাইলকে বুকের কাছে টেনে নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে গেছে। আর ভয় নেই, ইন শা আল্লাহ।

নিজের স্মৃতিগুলো মনের কোণে সযত্নে রেখে উঠে দাঁড়াল মুবাশ্বিরা। ঘড়িতে ৩টা বাজে। নতুন আসা মেয়েটার লেবার প্রোগ্রেস দেখতে হবে।

Scanned with CamScanner

মেয়েটি এখনও ফোঁপাচ্ছে। আশপাশে এটেন্ডেন্ট বয়স্ক মহিলাকে দেখতে পেল না মুবাশ্বিরা। মেয়েটার কাছে নার্স দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে 'এই তো আর একটু!'

'কী ব্যাপার, সিস্টার?' বলে কাছে দাঁড়াল মুবাশ্বিরা।

'ম্যাডাম, রোগীর লোক চলে গেছে। বলে গেছে—সকালে আসবে। ওষুধ, খাবার সব কিনে রেখে গেছে; কিন্তু মেয়েটার কাছে একজন থাকবে না, তাই কি হয় বলেন?'

'এ আর নতুন কী? আগেও কি এমন দেখেননি?'

মুবাশ্বিরা এখন অনেক কিছুই সহজভাবে নিতে শিখেছে। এইসব উপেক্ষা করে রোগীর দিকে মন দিতে শিখে গেছে। এখন ওর সাপোর্টটাই রোগীকে বাঁচাবে, লড়ে যাওয়ার শক্তি দেবে। কত কিসিমের মানুষ যে আছে এই দুনিয়ায়, এই ডাক্তারি করতে এসে দেখেছে সে। রোগী সহযোগিতা করলে আশা করি খুব একটা সমস্যা হবে না ম্যানেজ করা। পুরোটাই মেয়েটার মনের জোরের ওপর নির্ভর করছে।

'কাইন্দ না মা, আমি যামুনি লগে! আফা, আমি থাকলে হইব না? কী বজ্জাত বেটি গো! ছাওয়ালটাক ফেলি চলি গেছে! গজব দেব আল্লায়!'

দুই বেডের মাঝে শুয়ে থাকা বুড়ি মহিলা মাটিতে করা তার বিছানায় উঠে বসে বলল মেয়েটাকে। গ্রাম থেকে এসেছে নিজের মেয়েকে নিয়ে। সিভিয়ার এন্টি পার্টেম ব্লিডিং ছিল। এখন মা-বাচ্চা দুই-ই ভালো আছে। তার এই কথা শুনে মেয়েটি মুবাশ্বিরার বাম-হাত শক্ত করে চেপে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। খুব মায়া লাগল ওর। 'অমন করে কাঁদলে কষ্ট পাবে আপু, তোমার বাবুটারও কষ্ট হবে। আমরা আছি তো। এই খালাও যাবে সাথে। তোমার সময় আছে—দেখবে, সবাই এলেই তোমার বাবুটা হবে। ঠিক আছে? কেঁদো না। মায়েরা সব পারে। মায়েদের অনেক সাহসী হতে হয়। ভয় পেয়ো না। একটি সুন্দর দুআ শিখিয়ে দিই তোমাকে, কেমন? আমার বাচ্চা হওয়ার সময় খুব পড়তাম—ইয়া আল্লাহ, এই সফরের একমাত্র সঙ্গী আপনি। আমাকে ঈমান আর তাকওয়ার সাথে এই সফর শেষ করতে সাহায্য করুন।

আমাকে আর আমার পরিবারকে সকল দুর্ঘটনা, জান-মালের ক্ষতি থেকে হিফাযত করুন। আমি নিজেকে আর আমার পরিবারকে আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম হিফাযতকারী। আমাকে বরকত দেন, রিযিক দান করুন, আমাদের

Scanned with CamScanner

জন্য সব মুশকিল আসান করে দেন।'

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমীন।'

'কিচ্ছু হবে না, ইন শা আল্লাহ, আমি একটু দেখি তোমাকে? বাচ্চার হার্টবিট শুনতে দেব, ঠিক আছে? আর কেঁদো না। তুমি এই দুআটি করো মনে মনে। আর যা যা চাইতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে—আল্লাহকে বলো। আল্লাহ কষ্টের ভেতর দিয়ে গুনাহ মাফ করে দেন আর দুআও কবুল করেন, ইন শা আল্লাহ।'

'আপু, আমি মেডিকেল স্টুডেন্ট। থার্ড প্রফ দিলাম।'

মেয়েটি নিজের কথা বলছে, এটা ভালো লক্ষণ। মন শান্ত হবে কথা বললে।

'তাই? মা শা আল্লাহ! খুব ভালো তো তাহলে! তোমার সাথে ওই নারী কে ছিলেন?'

'আমি হোস্টেলে ছিলাম এতদিন, এক মাস আগে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। তিনি বাড়িওয়ালী চাচি। আমার ইডিডি তো আরও দশ দিন পরে। কালকে আম্মু-আব্বুর রওয়ানা দেওয়ার কথা ছিল। ফোন পেয়ে আজকে রওয়ানা দিয়েছেন। আর হাজব্যান্ডের পোস্টিং বগুড়ায়। সে-ও রওয়ানা দিয়েছে। রাত একটায় কি আর কিছু পাবে আসার মতো? বাবু নড়ছিল না তাই আমিও আর সাহস পাইনি বাসায় থাকার। বান্ধবীরা হোস্টেল থেকে আসতে চাইছিল, এত রাত দেখে আমি মানা করেছি। চাচি বলছিলেন বাসায় থাকতে; কিন্তু আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল আপু; আর পানি ভেঙে গেল হঠাৎ করে। বাবুও নড়ছিল না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে?'

মেয়েটার জন্য খুব মায়া লাগল মুবাশ্বিরার। স্টেথোস্কোপটি বাচ্চার হার্টবিট শুনতে যাওয়ার জায়গায় চেপে ধরে মেয়েটাকে কানে লাগাতে ইশারা করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ? তোমার বাবুর হার্টবিট! ও তোমাকে বলছে যে, ও ভালো আছে। এখন তুমি কাঁদলে ওরও কষ্ট হবে। ভয়ের কিছু নেই।'

মেয়েটি স্টেথোস্কোপটি কানের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে আছে, পানি গড়িয়ে পড়ে চোখের পাশ বেয়ে ওর চুলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আহারে মা! মুবাশ্বিরা নিজেও এমন করে কাঁদছিল বুঝি অবজারভেশনে ঢোকানোর আগে। একা একা কী অসহায় লাগছিল ওর! বেশিক্ষণ না, খবর পেয়ে আসতে যেটুকু দেরি সবার—তাও খুব লম্বা মনে হচ্ছিল। আর কষ্ট! সে-তো বাদই দিলাম।

Scanned with CamScanner

নতুন আরেক রোগী আসছে তাকে এডমিট অর্ডার দিতে হবে। ওইদিকে যেতে মেয়েটি হাত চেপে ধরে বলল, 'আপু প্লিজ, আপনি থাকেন?'

'অন্য রোগীদেরও দেখতে হবে, বোন। আমাদের ডিউটিটা আগে। এই যে এই খালা বসে থাকবেন তোমার কাছে, কেমন? কী খালা, পারবেন না?'

মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকা গ্রামের বয়স্কা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল মুবাশ্বিরা; যিনি একটু আগে মেয়েটাকে স্বান্তনা দিচ্ছিলেন পাশে থাকবেন বলে।

'হ হ! পারুম, মা পারুম।'

মুবাশ্বিরার ডিউটি শেষ হলো সকাল ৮টায়। রাউন্ড শেষ করে সবকিছু গোছাতে গোছাতে সকাল ৯.৩০। এরপর ওয়ার্ড থেকে বের হতে গিয়ে গতকাল রাতের ওই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল মুবাশ্বিরার। দুটি সিরিয়াস রোগীকে ওটিতে এসিস্ট করা নিয়ে সে সারারাত এতই ব্যস্ত ছিল যে, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাছাড়া ডেলিভারি কেইস হ্যান্ডেল করতে গিয়ে ইন্টার্নিরা কোনো ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হলে তখন ওকেই জানানো হয়। বের হওয়ার আগে মেয়েটির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল মুবাশ্বিরা।

বেডের কাছাকাছি এসে দেখে দুজন বয়স্কা একটি ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে আদর করছে। দুজনের একজন রাতের সেই গজগজানি বাড়িওয়ালী—এখন মুখে সোনা ঝরে পড়ছে! আরেকজনের সাথে মেয়েটার চেহারার মিল আছে, মা সম্ভবত। আর মেয়েটার মাথায় হাত রেখে চোখে ছলছল পানি নিয়ে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে যে-মানুষটি বসে আছে, সে নিশ্চিত ওর হাজব্যান্ড। ওদিকে দুই বেডের মাঝে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে নিজের নাতিকে গীত গাইতে গাইতে তেল মালিশ করছে পরোপকারী খালাটা। সে যে অনেকটা সময় মেয়েটার কাছে ছিল আর তা সে কোনো প্রতিদানের আশায় যে করেনি, এটি ভেবেই মনে মনে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল মুবাশ্বিরা। এমন মানুষেরা সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলেই হাজার প্রতিকূলতা দেখেও মানুষের ওপর বিশ্বাস পুরো উঠে যায়নি ওর; বরং এই নগন্য মানুষদের কাছেই মানবতা শেখে ও প্রতিনিয়ত। বিরক্ত করল না আর ছোট্ট পরিবারটাকে। মুবাশ্বিরা পাশ দিয়ে আসতে আসতে তার কানে আসল বাড়িওয়ালীর খোঁচা মারা বাক্যবাণ—'দেখছেন ভাবী, আজকালকার ছেলে-মেয়ে! সবার সামনে কেমন বেহায়ার মতো মাথায় হাত রেখে বসে আছে। আমরা আর বাচ্চা জন্ম দেইনি!'

Scanned with CamScanner

ইমার্জেন্সির বাইরে এসে মুবাশ্বিরা দেখল—তার পুত্র পিতার বুকের কাছে বাঁদরঝোলা হয়ে ক্যারিয়ারে ঝুলছে। সুহাইলের হাতে সকালের এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে ছাউনির ফাঁক গলে। পরম বিস্ময় নিয়ে সে বারবার হাত মুঠো করছে আর খুলছে—রোদের সাথে খেলা করছে। আর মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ বের করে বাবাকে শোনাচ্ছে, যেন রোদের সাথে কত কথা তার!

মুবাশ্বিরার সুখের পৃথিবী তার বাবুর গায়ে লাগা সকালের এক চিলতে রোদে যেন ভরে গেল। সুখী হতে কি খুব বেশিকিছু লাগে?

নিশ্চয়ই কষ্টের পরে অবশ্যই প্রশান্তি আসে।

আমার দুটি কথা :

প্রেগন্যান্সি এবং প্যারেন্টহুডের প্রতিটি স্টেপ খুব সেনসিটিভ ও ভালনারেবল হয়। আমি আমার ব্যক্তিগত ও প্রফেশনাল জীবনে যত কেস ডিল করেছি তত শিখেছি। সামান্য থেকে সামান্য সহানুভূতি মায়া আর শুধু উপদেশ না দিয়ে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করা—অনেক বড় একটি প্রভাব ফেলে যায়—সেটি শারীরিক হোক বা মানসিক বা সামাজিক। হয়তো মানুষটাকে আপনিও চেনেন না আর তিনিও আপনার নাম জানবেন না; কিন্তু সারাজীবন তিনি আপনার করা একটি ছোট্ট কাজের জন্য আপনাকে মনে রেখে দেবেন আর মনে মনে শ্রদ্ধা করবেন। আপনার করা একটি আপাত 'সামান্য' কথা বা কাজ আপনার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে যেতে পারে, অসিলা হয়ে যেতে পারে অথবা একটি কথা বা কাজের মাধ্যমে দেওয়া কষ্ট বদদুআর কারণও হতে পারে।

যদি কখনও কোনো প্রেগন্যান্ট কাপল বা নতুন মা-বাবাকে সামান্যতম সাহায্য করার অবস্থানে নিজেকে পান—প্লিজ সাহায্য করুন। আপনার কাছে তা যতই তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় মনে হোক না কেন, হয়তো আপনাকেই আল্লাহ তাদের করা দুআ কবুলের অসিলা করছেন। তাই জাজমেন্টাল বা ক্রিটিক্যাল না হয়ে সহমর্মী হোন সহানুভূতিশীল হোন—এটা আসলেই বরকত বয়ে আনবে। ছোট ছোট ভালো কাজগুলোই আমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে।

আরেকটি বিষয়, প্রেগন্যান্সি বা প্যারেন্টিং বলতে শুধু মায়েদেরই আমরা বুঝি সাধারণত; কিন্তু নতুন বাবাদের জন্যও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। ছেলেরা মেয়েদের

Scanned with CamScanner

মতো আবেগ প্রকাশ করতে পারে না, আল্লাহ তাদের এভাবেই তৈরি করেছেন। তার মানে কিন্তু এই না যে, একজন নতুন মা যখন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কষ্টগুলোর ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, নতুন বাবাটা যাচ্ছেন না! তিনি হয়তো মা না, কিন্তু তিনি বাবা। তার মাঝেও ন্যাচারাল একটি ইন্সটিংট আছে তার স্ত্রী-সন্তানকে সবরকম সুরক্ষা দেওয়ার। আমাদের সামাজিক নানা বিষয় কেন জানি সেটি এলাউ করে না। কিন্তু এইসময় হবু বা নতুন বাবারাও যে চাপে থাকেন পারিবারিক বা সামাজিকভাবে এটা কেউ বুঝতে চেষ্টা করেন না।

তাই শুধু নতুন মা না, নতুন বাবাদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হন। কাউকে কোনো কথা বলার আগে বা কারও সাথে কিছু করার আগে একটু ভাবুন। ভাবুন নিজে সেই একই পরিস্থিতিতে কী ধরনের ব্যবহার বা সাপোর্ট আশা করতেন।

জীবনে আঁধারির পাশাপাশি আলোও হাত ধরাধরি করে চলে। আঁধার জীবন পেয়েছি বলে অন্যের জীবন আলোয় কেন ভরাতে পারব না! কেন একচিলতে রোদ হয়ে প্রচণ্ড শীতে কারও জন্য কোমল উষ্ণতা হতে পারব না!

Scanned with CamScanner

রূপকথাও হেরেছিল

শিহাব আহমেদ তুহিন

কিছু গল্প, আমরা আমাদের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে তৈরি করি—বাস্তব জগতের গল্পগুলোকে হারানোর জন্য। সেগুলোকে রূপকথা বলা হয়। মানুষ কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর ধরে গল্প লিখে চলছে। যত গল্প লেখা সম্ভব—তার সবই প্রায় লেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু সম্ভব—পুরাতন গল্পগুলোকে চাতুর্যের সাথে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা। তবে গল্প-মাত্রই যে কাল্পনিক, তা কিন্তু নয়। কিছু গল্প বাস্তব। সেগুলোর জন্ম আমাদের এই চিরচেনা পৃথিবীতে; কিন্তু সেগুলো হার মানায় আমাদের সব কল্পনাকে। হার মানায় রূপকথাকেও। পাঁচ হাজার বছর ধরে কল্পনার গাঁথুনিতে তৈরি হওয়া গল্পগুলোও অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর বুকে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি গল্পের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজকের গল্পটি তেমনই এক গল্প। সে-গল্পের একজন নায়ক আছেন। আর সে-নায়ক রূপকথার নায়কদের মতোই। অসম্ভব হ্যান্ডসাম। কিন্তু তাকে হিরো বলছি কেন? তিনি কি রূপকথার গল্পের মতোই কোনো রাজকন্যাকে দৈত্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন?

না, আমাদের হিরো তেমন কিছু করেননি; বরং এর চেয়ে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। উৎসর্গ করেছেন জীবনের সবকিছু।

তিনি একজন আরব। বাস করতেন মক্কায়। আরবের সবথেকে দামী আর স্টাইলিশ ড্রেস পরতেন। সবথেকে সেরা আতর ব্যবহার করতেন। বড়লোকের সন্তান।

Scanned with CamScanner

সে-সময়কার সবচেয়ে স্টাইলিশ জুতা থাকত তার পায়ে। তখনকার যুগে ইয়ামেনী জুতা ছিল সারাবিশ্বে বিখ্যাত। আর যুবকের পায়ে থাকত ইয়ামেনী জুতার মধ্যেও সবচেয়ে দামী জোড়াটি। যুবকের নাম মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু। উষর আরবকে কেউ জাগাতে পারেনি। রোমান-পার্সী কেউ না। সপ্তম শতাব্দীর সেই সময়টি ছিল ইতিহাসের অন্ধকার সময়। এমন সময়ে আরবভূমি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানের ছোঁয়ায় জেগে উঠল। এর প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু।

মক্কায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামের এক মহামানব সকল দেব-দেবীর উপাসনা ছেড়ে সকলকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করা শুরু করলেন। মুসআব চিন্তা করলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। এরইমধ্যে তিনি খবর পেলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা কুরাইশদের অত্যাচার থেকে বেঁচে আলোচনা করার জন্য মক্কার উপকণ্ঠে আরকাম নামের একজন বিশ্বস্ত সাহাবীর বাড়িতে মিলিত হচ্ছেন। এটি সেই বিখ্যাত দারুল আরকাম, যেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। সাক্ষাৎ করতেন তার সাহাবীদের সাথে। কৌতূহলী মুসআব তার কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্যে এ বাড়িতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসআব এমন এক বরকতময় সন্ধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন যে, তিনি দারুল আরকামে উপস্থিত হতে-না-হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নতুন ওহী নাযিল হলো। তিনি দেখলেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ওহী তিলাওয়াত করে উপস্থিত সকলকে শোনালেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ সেই ওহী শুনল।

ওহীর ভাষা মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল। এসময় মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে পড়েছেন। তিনি মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগত জানালেন এবং তার একটি বরকতময় পবিত্র হাত মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বুকের ওপর রাখলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন দারুণ এক প্রশান্তিতে বিভোর হয়ে পড়লেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার পরবর্তী জীবনের প্রাণ-প্রিয় নেতার হাতে।

সেই মহান নেতা, যার ইশারা-মাত্র শিষ্যরা সাগরে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করতেন না। অকাতরে সবাই বিলিয়ে দিতেন প্রাণ।

Scanned with CamScanner

প্রাণপ্রিয় মাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করলেন মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার মা চেষ্টা করলেন ছেলেকে কড়া পাহারায় বন্দি করে রাখতে; কিন্তু যার হৃদয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাকে আর কে বন্দি করবে? বন্দিদশা থেকে তিনি পালালেন।

গন্তব্য এবার আফ্রিকার দিকে। জীবনের এক নতুন অধ্যায় তার জন্য অপেক্ষা করছে আবিসিনিয়ায়। সে-অধ্যায় সংগ্রামের। সে-অধ্যায় চরম দারিদ্র্যের, যা তার উজ্জ্বল ত্বক বিবর্ণ করে দিয়েছিল। স্টাইলিশ ড্রেস পরতে অভ্যস্ত মুসআব খুশি মনে পরিধান করলেন বস্তার মতো পোশাক!

আবিসিনিয়া থেকে মুসআব আবার একদিন মক্কায় ফিরে এলেন। তিনি মক্কার পথে হেঁটে চলছেন আর লোকজন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে নতুন মুসআবকে দেখছে। এতে তিনি নিজেও কিছুটা খুশি হচ্ছেন এই ভেবে যে, লোকজন দেখুক—যে-মুসআব একসময় জাহিলিয়্যাতের চরম ভোগ-বিলাসে জীবন কাটিয়েছে, সে-মুসআব এ নয়; এ তো দ্বীন-ইসলামের এক নগণ্য খাদেম!

তার মা খুনাইসও খবর পেলেন ছেলে ফিরে এসেছে। দীর্ঘদিন পরে মা আর ছেলের দেখা হলো। দুজনেই আবেগাপ্লুত ছিলেন। খুনাইস আশা করেছিলেন—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচার করা 'অদ্ভুত' বিশ্বাস ত্যাগ করে তার ছেলে ফিরে এসেছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝলেন তার এই ধারণা ভুল। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়লেন। মুসআবকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তিনি শেষ চেষ্টা করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি ছেলেকে আবার বন্দি করে বেঁধে ফেলার জন্য ভৃত্যদের আদেশ করলেন। মুসআব মায়ের সকল অত্যাচার কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন সবসময়; কিন্তু এবার তিনি মাকে শপথ করে বললেন, কেউ যদি তাকে বন্দি করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের সবাইকে তিনি হত্যা করবেন। খুনাইস জানতেন, তার ছেলে কখনও অনর্থক কথা বলে না। তার ওপর তার ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তাও তাকে অবাক করেছিল।

মা আর সন্তানের বিচ্ছেদ ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যদিও দুজন-দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। মা-পুত্র দুজনই এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু এর মাধ্যমে ঈমানের ওপর মুসআবের এবং কুফরের ওপর খুনাইসের অটল দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খুনাইস মুসআবের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার

Scanned with CamScanner

সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিবারের বিশাল ঐশ্বর্য আর বিত্তের উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। দুজনের শেষ দেখায় খুনাইস বললেন, 'যে-পথে তুমি পা বাড়িয়েছ যদি তুমি সে-পথেই চলে যাও, তবে জেনে রাখো, আজ থেকে আমি আর তোমার মা নই।'

এত কঠিন কথা শুনেও মুসআব ঘাবড়ে গেলেন না। রেগেও গেলেন না; বরং শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মা, আপনাকে আমি জানি, আর আমি ভালোবাসি আপনাকে। আমি আপনাকে 'আশহাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'-এ সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

খুনাইস জবাব দিলেন, 'আকাশের ছুটন্ত তারকার শপথ! আমার অন্তর ও চিন্তাশক্তি যদি লোপও পেয়ে যায় তবুও আমি তোমার এ দ্বীন গ্রহণ করব না।'

মুসআব আবার ঘর ছাড়লেন। পেছনে ফেলে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার জীবন। আরবে যে-ই তার এ অবস্থার কথা শুনত ভীষণ অবাক হয়ে ভাবত—এও কী সম্ভব!

বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুসআব ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মদীনার পথে পথে। *ইবনু হিশাম-এর* বর্ণনায় আছে—অনাহারে-অর্ধাহারে আর অপুষ্টিতে তার গায়ের চামড়া এমনভাবে উঠে গিয়েছিল, যেমন—সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে।

একদিন মুসআব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে মুসলিমদের একটি দল বসে ছিল। দূর থেকে মুসআবকে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি নত হয়ে গেল। দলের অনেকেই কেঁদে ফেললেন। কারণ, মুসআবের পরনে ছিল তালি দেওয়া একটি জীর্ণ জুব্বা।

ইসলাম-পূর্ব মুসআবের ছবি তাদের হৃদয়ে ভেসে উঠল। এই কি সেই মুসআব! একদিন যার গায়ে থাকত আরবের সবচেয়ে দামী পোশাক, আরবের বিলাসিতা আর সৌন্দর্যের মডেল ছিল সে; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসআবের দিকে তাকিয়ে খুশি হলেন। তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এ মুসআবকে আমি মক্কায় তার বাবা-মার সাথে দেখেছি। তারা ওকে খুব যত্ন করতেন এবং তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সবকিছুই করেছেন। কুরাইশদের মধ্যে কোনো যুবকই তার মতো ছিল না। এরপর এসব-কিছু সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করে এসেছে এবং নিজেকে সে রাসূলের কাজে নিবেদিত করেছে।'

Scanned with CamScanner

বদরযুদ্ধে বন্দিদের মধ্যে একজন বন্দির নাম ছিল আবু আজিজ ইবনু উমাইর। এ আবু আজিজ ছিলেন মুসআব ইবনু উমাইরের ভাই। যুদ্ধবন্দি থাকাকালীন কথা— আবু আজিজ পরে বর্ণনা করেন, 'বন্দি থাকা অবস্থায় আমি একদল আনসারের দায়িত্বে ছিলাম। তারা যখনই খেতে বসছিল তখনই আমাকেও রুটি এবং খেজুর খেতে দিচ্ছিল। এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন; যে-নির্দেশে তাদের তিনি আমাদের সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছিলেন। আমার ভাই মুসআব একসময় আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আনসারদের যে-ব্যক্তি আমার বন্দিত্বের দায়িত্বে ছিল তাকে বললেন, 'একে শক্ত করে বাঁধো। এর মা হলেন অত্যন্ত সম্পদশালী একজন নারী; যিনি এর বিনিময়ে প্রচুর মুক্তিপণ দিতে সক্ষম।'

আবু আজিজ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে মুসআবের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি আমার ভাই আর আমার ব্যাপারে এটি আপনার কেমন নির্দেশ!'

পাশে থাকা আনসার সাহাবীকে দেখিয়ে মুসআব বললেন, 'তিনি হলেন আমার ভাই, তুমি নও।'

এত ইস্পাতসম দৃঢ়তা থাকার পরেও মুসআব কি ভাবতে পেরেছিলেন অন্তিম মুহূর্তে এমন ব্যথা সইতে হবে তাকে?

উহুদের প্রান্তর। খুনী মরুভূমির সূর্য যেন আগুন ঢালছে। চারদিকে তরবারির ঝঙ্কার। কিছু সঙ্গীর ভুলে প্রাণপ্রিয় নেতার জীবন শঙ্কার মুখে। কী করবেন মুসআব?

হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ। তার চেহারা যে অনেকটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতোই। নেকড়ের মতো চিৎকার করতে শুরু করলেন মক্কার ধনীর দুলাল সেই সুদর্শন যুবক। যাতে শত্রুরা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবে ভুল করে। সব আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন। মাকে ত্যাগ করে আফ্রিকায় পাড়ি জমাতে পারেন, দিনের পর দিন না-খেয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু নেতার দেহে একটি আঘাত তার সহ্যের বাইরে। তার চিৎকারে মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহীর দিকে মুশরিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এবং তারা প্রথমে এ পতাকা ভূলুণ্ঠিত করে পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিল। একজন মুশরিক-সেনা তার ওপর আক্রমণ করল। একহাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা আর অন্য হাতে তরবারি নিয়ে তিনি প্রচণ্ড বেগে লড়াই করতে থাকেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে এক অশ্বারোহী মুশরিক-সেনা

Scanned with CamScanner

তরবারির আঘাতে মুসআবের ডান হাত তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাম হাতে পতাকা তুলে ধরলেন।

যুদ্ধের প্রান্তরে তরবারির ঝনঝনানি ভেদ করে একটি আওয়াজ শোনা গেল, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে...!'

তিনি জানতেন না যে, তা ছিল বিভ্রান্ত শত্রুর ভুল উক্তি।'

মুসআব বলে উঠলেন, 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল—আর মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহর একজন রাসূল!' তার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাকে হত্যা করা হয় তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? আর যে পেছনে ফিরে যায় সে কখনও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।'

যে-সকল মুসলিম একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন তারা সবাই যেন জেগে উঠলেন। এরমধ্যে আরেক মুশরিক-সেনা মুসআবের বাম হাতটি বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তিনি এবার বাহু দুটির অবশিষ্টাংশ দিয়ে ইসলামের পতাকা আঁকড়ে ধরে রাখলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন 'মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহর একজন রাসূল তার পূর্বেও রাসূলদের মৃত্যু হয়েছে।' তবুও ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দিলেন না। এমতাবস্থায় ইবনু কামিয়া নামের এক নরাধম এসে একটি তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে তার দেহে আঘাত করল। বর্শাটি তার দেহ ভেদ করে গেল। এবার মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি যে-কথাটি (ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলু—মুহাম্মাদ কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একজন রাসূল, তার পূর্বেও রাসূলদের মৃত্যু হয়েছে) বলে গেছেন পরবর্তী সময়ে সে-কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহ তাআলা কুরআনের একটি আয়াত (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪) হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ কথাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

যুদ্ধ শেষ হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে ঘুরে শহীদ মুসলিমদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এবং তাদের জানাযার আয়োজন করছিলেন। একসময় ঘুরতে ঘুরতে তিনি প্রিয় মুসআবের কাছে এলেন। মুসআবকে দেখে তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। মুসআবের দেহ ঢেকে দেবার জন্য একখণ্ড কাপড় চাওয়া হলেও একমাত্র তার পোশাকটি ছাড়া আর

Scanned with CamScanner

কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। যে-জামাটি তার ছিল সেটি দিয়ে তার পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ছিল এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়ছিল। অবশেষে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জামাটি দিয়ে ওর মাথা ঢেকে দাও আর পা ইযখির (একপ্রকার ঘাস) দিয়ে ঢেকে দাও।'

উহুদযুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয় অনেক মানুষকে হারিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে শহীদ হন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণপ্রিয় চাচা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু; মুশরিকরা যার নাক-কান কর্তন করে চেহারা বিকৃত করে ফেলেছিল। যার জানাযা পড়তে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে কেঁদেছিলেন যে, তার কান্নার আওয়াজ অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছিল।

এ যুদ্ধ ছিল অসংখ্য হৃদয়বিদারক ঘটনার সমষ্টি। এ যুদ্ধে মুশরিকদের আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূবায়ী দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। তার নিচের ঠোঁট আহত হয়েছিল। কাঁধে এত বেশি ব্যথা পেয়েছিলেন যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত সে-ব্যথার কষ্ট তিনি অনুভব করতেন। তরবারির আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত হয়েছিল, গর্তে পড়ে তার হাঁটু মচকে গিয়েছিল।

আল্লাহর রাহে এ যুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন সদ্য বিবাহিত হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু—যিনি নববধূর আলিঙ্গন ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ফেরেশতারা স্বয়ং যাকে গোসল করিয়েছিলেন।

এত হৃদয়বিদারক ঘটনার পরেও মুসআবের দেহের সামনে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তখনকার কথা যখন তিনি মুসআবকে প্রথম দেখেছিলেন মক্কায়। তখন মুসআব ছিলেন মক্কার সবচেয়ে স্টাইলিশ যুবক, তার গায়ে ছিল সময়ের সেরা এবং দামী পোশাক অথচ আজ তার মৃতদেহটি ঢেকে দেবার জন্য একটি পূর্ণ কাপড় পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

উহুদের প্রান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্রুসিক্ত চোখে যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে মুসআব এবং তার অন্য শহীদ সাথীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে—তোমরা হলে শহীদ এবং কিয়ামাতের দিন এ মর্যাদা নিয়েই তোমরা উত্থিত হবে।'

Scanned with CamScanner

সত্যিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ স্বীকৃতি একজন মুমিনের জন্য পৃথিবীর সেরা প্রাপ্তি—যা মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু অর্জন করে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছিলেন।

আমাদের কাছে হয়তো জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হতে পারে অনেক অর্থ-বিত্ত আভিজাত্য। আমাদের যাদের কাছে দুনিয়ার জীবনই মুখ্য, তাদের কাছে এক ধনী-যুবকের পরিবার ত্যাগ করা, আভিজাত্য ত্যাগ করা, বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে দারিদ্র্যকে বরণ করা; নেতার মৃত্যুর কথা শুনে যুদ্ধ থেকে না পালিয়ে জীবন বিলিয়ে দেওয়া নিছক বোকামি ও হেঁয়ালিপনা ছাড়া কিছুই নয়; কিন্তু যাদের কাছে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ছিল বিশাল সাগরে এক ফোঁটা জল, তাদের কাছে এত কষ্টের বিনিময়েও জান্নাত ছিল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমাদের কাছে এটি হয়তো নিছক একটি গল্প; কিন্তু এটি তো তাদের গল্প যারা এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে রূপকথাকেও হার মানিয়েছিলেন। গভীর ভালোবাসায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আগলে রেখেছিলেন ইসলামের পতাকা।

আমরা যারা পরকালকে উপেক্ষা করে দুনিয়াতে সামান্য কিছু অর্জন করে নিজেকে হিরো ভাবি, আল্লাহর শপথ—আমরা কখনই সফলকাম নই। সফলকাম তো তারাই—যারা আভিজাত্যের পোশাক ছেড়ে দারিদ্র্যের পোশাক পরেছিলেন।

সফলকাম তো তারাই—যারা এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে পুরো সমুদ্র কিনে নিয়েছিলেন।[১]

[১] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৪-২১৯।

Scanned with CamScanner

এক টুকরো আলো

আফীফা আবেদীন সাওদা

আব্দুল্লাহকে নিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটছি। নিজের মাথার ওপর ছাতা মেলে ধরা, আব্দুল্লাহর গায়ে রেইনকোট। তীব্র গরমে এতদিন কষ্ট হচ্ছিল খুব। বিকেল থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। মাগরিবের আযান দিতে-না-দিতেই বৃষ্টি।

প্রায় সতের ঘণ্টার সিয়াম শেষে জিরোবার সময় কমই পেয়েছিলাম। খেজুর আর পানি মুখে দিয়ে ছুট লাগিয়েছিলাম মাগরিবের সালাত আদায় করতে। ফিরে এসে ঘন স্যুপ দিয়ে ইফতারের সমাপ্তি টানা হলো।

আব্দুল্লাহকে নিয়ে টেবিল সাফ করে ফেললাম। সোফিয়া ততক্ষণে বেসিনে বাসন-কোসন ভিজিয়ে ফেলেছে।

'বাবা, কফি বানাবে না?'

সাত পেরিয়ে আটে পা দেওয়া আব্দুল্লাহর কফির প্রতি প্রবল আকর্ষণ। সবসময় শাসনের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে নেই। সিয়াম রাখার পুরস্কার হিসেবে একদিন একটু কফি দেওয়াই যায়।

দুই ধরনের কফি বানালাম। সোফিয়া আর আমার জন্য ক্যাপাচিনো—এই আমাদের সারাদিনের জ্বালানি। আর আব্দুল্লাহর হাতে ধরিয়ে দিলাম আমার নিজস্ব রেসিপি। অনেক অনেক চকলেট আর দুধে যৎসামান্য কফি। তা-ই পেয়ে ছেলে কী ভীষণ খুশি।

Scanned with CamScanner

এরপর আব্দুল্লাহকে নিয়ে তারাবীহর উদ্দেশ্যে যাত্রা। আর কয়েক কদম এগোলেই লন্ডন রোডের সেই মসজিদ, যেখানে আমি বাবার হাত ধরে তারাবীহ পড়তে আসতাম।

আব্দুল্লাহর নানান প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মসজিদে পৌঁছে গেছি। দেরি হয়ে গেছে খানিকটা। ভেজা ছাতাটা বন্ধ করে দ্রুত ভাঁজ করে নিলাম। আজ বোধহয় আর প্রথম কাতারে দাঁড়ানো হলো না!

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনও। বাতাসে ছেলেবেলার ঘ্রাণ। সে-ঘ্রাণে বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে ওঠে। প্রতিবার আমি নতুন করে মসজিদটাকে দেখি। স্মৃতি জড়ানো মসজিদ। গেটের ধারে বিশাল সেই নাম না-জানা গাছটা আগের মতোই আছে। নতুন সংযোজন গোলাপের ঝোপ।

আমাদের মতোই আরেক বাবা-ছেলের জুটি দেখতে পেলাম। ছেলের বয়স তের চৌদ্দ হবে। বাবা বলছেন, 'তারাবীহর সময় উধাও হয়ে যেয়ো না।'

ছেলে মিনমিন করছে, 'বাবা, আমি তো কাল উধাও হইনি...ওযু করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি জায়গা নেই...'

কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। আমার সেই পুরোনো ছুতো অপরিচিত এক কিশোরের মুখে? গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তনের মতো কি তবে জীবনেরও আবর্তন হয়? নতুবা ঘুরতে ঘুরতে আগের দৃশ্যপটে হাজির হলাম কী করে?

বৃষ্টি, ছুতো-খোঁজা কিশোর, আর লন্ডন রোডের মসজিদ আমায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল কৈশোরে।

ছেলেটার মতো আমিও তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর ছিলাম। স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে নানান প্রশ্ন। মনের মাঝে অবিশ্বাসের আনাগোনা। মা-বাবা সিয়াম রাখতে বলেছে তাই রাখি। বাবার সাথে জোর করে তারাবীহ পড়তে আসি।

ফরয সালাত শেষে তারাবীহর পুরোটা সময় ঘুরে ফিরে দেখি রাতের লন্ডন। এক ঘণ্টা পর আবার ভালো মানুষের মতো বিতরের সালাতে দাঁড়িয়ে যাই। বাবা যদি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলে', মুখস্থ জবাব দিয়ে দিতাম এই কিশোরটার মতো।

Scanned with CamScanner

যে-সময়টার কথা বলছি, তখন শীতকাল ছিল। দিন ছোট, এত দীর্ঘ সময় সিয়াম রাখতে হতো না। তবুও অস্থির হয়ে যেতাম। হাত বাড়ালেই ফ্রিজভর্তি খাবার। তবুও খাওয়া যাবে না। মা বুঝে ফেলবেন। না খেয়ে গোটা দিন পার করে দেওয়া খুব কঠিন। গেমস খেলি, কমিক পড়ি। সময় কাটে না। মা সালাতের কথা জিজ্ঞেস করলে হু হা করি।

একদিনের কথা। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছি। দরজার লক খুলে দেখি একটা ছোট বই পড়ে আছে। বই না বলে বুকলেট বলাই শ্রেয়। উবু হয়ে হাতে তুলে নিই বুকলেটটা। খুব অদ্ভুত নাম :

Do You Know This Book?

কী আশ্চর্য! বই পড়বার আগেই জানতে চাইছে এই বই সম্পর্কে জানি কি না! মনের মাঝে একরাশ কৌতূহল। একদিকে অদ্ভুত নামকরণের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে সময়টা কোনোমতে পার করে দেবার ইচ্ছে। বইটা পড়ে শেষ করার জন্য আর কী লাগে!

তখনও জানতাম না এটা ধর্মীয় কোনো বই। সত্যি বলতে, যদি জানতাম, ছুঁয়েও দেখতাম না। কেবল নামটা কৌতূহল জাগানিয়া বলেই পড়তে শুরু করলাম।

কুরআনে উল্লেখ করা কিছু সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট নিয়ে বইটি সাজানো। পৃথিবী কী করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, পানিচক্রের কথা, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠা, পাহাড়গুলো কী করে খুঁটির মতো ভূ-ত্বক ধরে রেখেছে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ—কী নেই এতটুকু বইটিতে! গোগ্রাসে পড়তে থাকলাম আমি।

কুরআন, ১৪০০ বছর আগের বই। নাযিল হয়েছিল শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। নিরক্ষর একজন মানুষ, তিনি কী করে জানলেন এতকিছু? সে-সময় আমার বিশ্বাস ছিল না কুরআনে, না ছিল নবীর ওপর। আকারে আয়তনে ছোট্ট সেই বই আমার জন্য ছিল বিশাল এক বিস্ময়। তখনও জানতাম না, দুই দিন পর স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাসে আমার জন্য আরও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে একঘেয়ে ব্যক্তিটি ছিলেন আমাদের সায়েন্স টিচার। তিনি মূলত একজন রিসার্চার ছিলেন। ক্ষুরধার মেধাবী মানুষ। সে-সময় ফিজিক্সের এমন কিছু বিষয়ে তিনি জানতেন, যা অনেকেরই অজানা। ওইসব ছিল তার রিসার্চের বিষয়বস্তু। সাধারণত যা হয়, অতিমাত্রায় মেধাবী আর জ্ঞানী লোকেরা শিক্ষক হিসেবে ভালো হন না। আমাদের সায়েন্স

Scanned with CamScanner

টিচারও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি টিনএজ ছাত্রদের জ্ঞান-বুদ্ধির দৌড় অনুধাবন করতে অক্ষম। তিনি কী পড়াচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পারতাম না বললেই চলে।

বরাবরের মতো সেদিনের ক্লাসটাও একঘেয়ে ছিল। আমার মনোযোগ ছিল জানালার বাইরে। স্কুলের পেছনের রাস্তাটা জানালা দিয়ে দিব্যি দেখা যায়। ক্লাস চলছিল ক্লাসের মতো, আমি আড়চোখে ব্যস্ত জনপদের খোঁজ রাখছিলাম। এইমাত্র এক বুড়ো টার্কিশ ব্রেড হাতে হনহন করে হেঁটে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। এর পরপরই দৃশ্যপটে হাজির হলো একটা ছোট্ট ছেলে, সাথে এক মহিলা—সম্ভবত তার মা। মায়ের হাত ছাড়িয়ে তুষারভেজা রাস্তায় ছেলেটা পিছলে পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কিছু ভাঙা-ভাঙা শব্দ আমার কানে ভেসে এলো, 'বিজ্ঞানী এডউইন হাবল...মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ...'

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ! সে তো দুই দিন আগেই সেই বুকলেটে পড়েছি! সাত-পাঁচ না ভেবে হাত তুলে স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, 'স্যার, এই সম্প্রসারণের কথা আমরা কবে জানতে পারলাম?'

আমার প্রশ্নে খুব খুশি হলেন তিনি। বিজ্ঞানের যেকোনো আবিষ্কার যেন তারই অর্জন, তারও যেন ভাগ আছে তাতে! খুব গর্বের সাথে জবাব দিয়েছিলেন, আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে জানা গেছে যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরপর যথারীতি সে আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলেন, যার কিছুই আর আমার কানে ঢোকেনি।

আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম অন্য জগতে। মাথায় চিন্তার ঝড়। সেদিনের সেই বইটাতে পড়েছিলাম, কুরআনে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এক নিরক্ষর মানুষ আমাদেরকে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা জানিয়ে গেছেন! আর বিজ্ঞান তা জানতে পেরেছে সত্তর বছর আগে! কী করে সম্ভব!

বাড়ি ফিরে বইটা হাতে নিলাম আবারও। খুঁজে বের করলাম মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের সেই অনুচ্ছেদ।

.....

আর আসমানকে আমি নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি মহাসম্প্রসারণকারী [১]

.....

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৭।

Scanned with CamScanner

কী মনে করে যেন আরেকবার পড়ে ফেললাম বইটি। সেখানে রেফারেন্স হিসেবে বলা ছিল মরিস বুকাইলির লেখা বই *দ্য বাইবেল দ্য কুরআন এন্ড সায়েন্স*-এর কথা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মরিস বুকাইলির এই বইটিও আমার বাড়িতেই ছিল। একেবারে আমার বুকশেল্ফেই। মা রেখে দিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন কোনো একদিন হয়তো আমি নেড়েচেড়ে দেখব। চোখের সামনে বইটা থাকা সত্ত্বেও আমি পড়বার আগ্রহ পাইনি এতদিন। কারণ, সেখানে ছিল বাইবেল আর কুরআনের নাম। ধর্মীয় যে-কোনো ব্যাপারে আমি ছিলাম চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাসীন, নিরাসক্ত যাকে বলে।

সেই রামাদান ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রামাদান। সে-মাসেই আমি অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী একজন মানুষে পরিণত হয়েছিলাম। চিন্তাজগতে আলোড়ন তোলা ছোট্ট একটা বই আমাকে চিনতে শিখিয়েছিল সত্য দ্বীন।

কালের পরিক্রমায় দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, এখন আর ধর্মকে বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করবার প্রয়োজন বোধ করি না। আমি জেনে গেছি, কুরআন ধ্রুব সত্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে পাল্লা দিয়ে তা পরিবর্তিত হবার নয়। বিজ্ঞানের চোখে আজ যা সত্য, কাল তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুরআন বদলাবে না। তবুও স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই, আমার হৃদয়ে হেদায়েতের নূর প্রবেশ করেছিল সেই বইটির মাধ্যমেই।

দরজার নিচে ঠেলে দেওয়া একটা বই! একটামাত্র বই, বদলে দিয়েছিল গোটা জীবন! অবিশ্বাসের চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে আমি পেয়েছিলাম জীবনের দিশা। আজও জানি না কে সেই বই দরজার নিচে ঠেলে দিয়েছিল, কে আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল সত্য-দ্বীনের পথে। হয়তো সেই মানুষটাও জানে না, তার এক মুহূর্তের চেষ্টায় পৃথিবীর কেউ একজন সত্যকে চিনতে পেরেছে। না সে জানে আমার কথা, না আমি জানি তার কথা। শুধু জানি এক লহমায় জীবন বদলে যেতে পারে। যেমন বদলে গিয়েছিল আমার![১]

[১] গল্পটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

Scanned with CamScanner

রুকাইয়া

মুরসালিন নিলয়

[এক]

তখন আমি সদ্য কিশোরী। বয়ঃসন্ধিকালের একরোখাপনা আর গোঁয়ার্তুমি মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে কেবল। মা চাইলেন মনের গতিপথ পালটে দিতে। এক ঝিমধরা দুপুরে কাছে এনে বসালেন। আমার চুলে বেণি বাঁধতে বাঁধতে শোনালেন তার মায়ের গল্প, এক মুসলিম নারীর জীবন-সংগ্রামের গল্প।

রুকাইয়া, আমার নানীজান। কৈশোরে যার গল্প শুনেছি মায়ের মুখে। এই মানুষটির জীবনযাপন আমার সারাজীবনের পাথেয়। যখনই আচমকা ঝড় এসে জীবনকে তছনছ করে দিতে চেয়েছে, যখনই একরাশ শূন্যতা এসে গ্রাস করে নিতে চেয়েছে, তখনই প্রেরণা নিয়েছি নানীজানের জীবন থেকে। সংগ্রামী এ মানুষটি জগতের সব মন্দকে উপেক্ষা করে জান্নাত হাসিলের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন। তারই গল্প বলব আজ।

গল্পের সূচনাটা হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মালেশশারাম শহরে। গ্রীষ্মপ্রধান ছোট্ট এক শহর, সূর্যের খরতাপ সেখানে প্রতিদিনকার ব্যাপার। তেমনই এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে এক মুসলিম পরিবারে খুশির জোয়ার এলো। সে-পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন ঘটেছে। জন্ম হয়েছে এক কন্যা শিশুর। আর দশটা গতানুগতিক পরিবারের মতো মেয়ে সন্তানে অসুখী ছিল না তারা। আল্লাহর ফয়সালায় মা-বাবা কৃতজ্ঞ ছিল। সামর্থ্যের মাঝে সবটুকু

Scanned with CamScanner

দিয়ে গ্রহণ করেছিল সন্তান মানুষ করার ব্রত।

নতুন শিশুকে নিয়ে আদিখ্যেতার অন্ত ছিল না বড় বোনটিরও। বোন আয়িশা খুশিতে আত্মহারা, নতুন খেলার সাথী পেয়েছে সে। ওদিকে আদরে ভাগ বসানোর ভয়ে শঙ্কিত ভাইটিরও হারাবার কিছু ছিল না। তার ওপর ছিল বাবার প্রবোধ—'অবশেষে তুমিও খেলার সাথী পেয়ে গেলে ইবরাহীম! এখন তো তুমি ওকে শাসনও করতে পারবে! তুমি যে বড় ভাই!'

খুশিতে ঝলমল করছিল ইবরাহীমের মুখ। ছোট্ট ইবরাহীম এখন বোনের অভিভাবক! সবাই হেসেছিল সেদিন।

আনন্দ উল্লাসের পর শুরু হয়ে গেল নাম রাখার তোড়জোড়। সবাই সবার পছন্দের নাম বলতে শুরু করেছে, কেবল কিছু বলছে না শিশুটির মা। বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে জন্মদাত্রী বলে উঠল, 'রুকাইয়া! এটাই হবে আমার মেয়ের নাম।'

শিশুর পিতা হাসল, সে হাসিতে ছিল সম্মতির আভাস। অবশেষে মেয়েটির নাম রাখা হলো 'রুকাইয়া', যার অর্থ কোমল, মুগ্ধতা আনয়নকারী।

সবাইকে মুগ্ধ করে রুকাইয়া বেড়ে উঠতে লাগল। যে-সময়টার কথা বলছি, তখন রুকাইয়ার বয়স দশ। জগৎটাকে অল্প বিস্তর চিনতে শিখেছে সে, নিজের মতো করে বুঝতে শিখেছে।

একদিনের কথা। সন্ধ্যায় চা হাতে রুকাইয়া গল্প করছিল বড় বোন আয়িশার সাথে।

গল্পে গল্পে আয়িশা জিজ্ঞেস করল, 'জীবনে কী করতে চাও তুমি?'

যেন এমন প্রশ্নের অপেক্ষাই করছিল রুকাইয়া। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বোনের দিকে ঘুরে বসল সে। তার চোখের তারায় নানান স্বপ্নের আনাগোনা।

বোনকে অবাক করে দিয়ে রুকাইয়া বলল, 'আমি আমার অস্তিত্বের জানান দিতে চাই। হয়তো পুরো পৃথিবী আমায় চিনবে না, তবু মনে রাখার মতো কিছু করে যেতে চাই।'

একদমে কথাগুলো বলে চায়ের কাপটা আবার হাতে উঠিয়ে নিল সে। উৎসাহ ভরা চোখে বোনের জবাবের অপেক্ষায়। আয়িশা চুপচাপ চা শেষ করে। উঠে যাবার আগে বোনকে বলে যায় কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে আসতে। সে ভালো করেই জানে—এ সমাজ তার ছোট্ট বোনটির স্বপ্ন পূরণ হতে দেবে না।

Scanned with CamScanner

পরদিন ছিল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। সবাইকেই সেখানে অংশ নিতে হয়। রুকাইয়া সব প্রস্তুতি গ্রহণ করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে-সুযোগ পেতে দেরি হলো না। শিক্ষক রুকাইয়ার নাম ঘোষণা করলেন। অনুষ্ঠান শুরু হলো রুকাইয়ার কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। নির্ভয়ে মঞ্চে উঠেছিল রুকাইয়া। সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে মুগ্ধ করেছিল সবাইকে।

কি চরিত্র, কি পড়াশোনা—সবদিক থেকে রুকাইয়ার উন্নতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনকে দিন নিজেকেই যেন ছাপিয়ে যাচ্ছিল সে। আশপাশের মানুষ, এমনকি রুকাইয়ার বাবা মা-ও মেয়ের ক্রিয়াকলাপে অভিভূত। অবশ্য কেউ-ই জানত না এ সুখ বেশিদিন স্থায়ী হবার নয়।

এরপর কেটে গেল আরও পাঁচটি বছর। রুকাইয়া এবার দশম শ্রেণির ছাত্রী। স্বপ্ন তার উচ্চতর পড়ালেখা করবার। মা-বাবা রাজি, আপাত দৃষ্টিতে সামনের পথ সুগম। আচমকা বাঁধা এলো ভাইয়ের তরফ থেকে।

এক বিকেলে ঝড়ের বেগে বাড়িতে প্রবেশ করল ইবরাহীম। ক্রুদ্ধস্বরে মা-বাবাকে জানিয়ে দিল নিজের জেদের কথা। লোকে ইবরাহীমের মেধা নিয়ে হাসাহাসি করে। ষষ্ঠ শ্রেণিটাও পাস করতে পারেনি সে। ওদিকে তার বোন তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ মেনে নেবার নয়। হয় রুকাইয়ার পড়াশোনা বন্ধ করতে হবে, নতুবা ইবরাহীম আর কাজে যাবে না।

একটা বয়সে মা-বাবা অসৎ সন্তানের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। রুকাইয়ার মা-বাবা হয়তো সে-বয়সটাই পার করছিলেন। ভাইয়ের হিংসা আর জেদে তার লেখাপড়া বন্ধ হলো, মা-বাবা বাধ্য হলেন বন্ধ করাতে।

খবরটা রুকাইয়া পেয়েছিল মায়ের কাছে। মেয়ের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়ে মা বলেছিলেন, 'তোমার পড়ালেখা এখানেই শেষ। কাল থেকে আর স্কুলে যেয়ো না।'

মেয়ের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হয়নি তাতে। মেনে নিতে পেরেছিল, তবে মনে নিতে পারেনি। বারংবার মনে পড়েছে বড় বোনের কথা। কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিল সে।

Scanned with CamScanner

এ ঘটনার পরপরই টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় রুকাইয়া। মনের ভেতর ঝড়, শরীরেও অসুখ। কেশবতী কন্যার সব চুল ঝরঝর করে পড়ে যেতে লাগল। মা-বাবা তার মুখের দিকে চাইতে পারে না। তবুও রুকাইয়ার জীবন সেখানে থমকে যায়নি। আকস্মিক আঘাতে টলে গেছে ঠিক, তবুও মুখ থুবড়ে পড়েনি। এ আঘাত তাকে দৃঢ় করেছিল। সে বুঝে গিয়েছিল হাল ছাড়লে চলবে না। হতাশায় ডুবে গেলে নিজেরই লোকসান। যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে হয়নি—তাতে কী! এ পৃথিবীতে নিজের ছাপ ফেলে যাবার সুযোগ হারিয়ে যায়নি!

[দুই]

আবু বকর ছিল মালেশশারামের অন্যতম ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। একুশ বছর বয়সে রুকাইয়াকে বিয়ে করে সে। রুকাইয়ার বয়স তখন উনিশ। সুন্দরী, সচ্চরিত্রা রুকাইয়ার জন্য সম্বন্ধ আসত প্রচুর। তারই মাঝে মা-বাবা বেছে নেন সাহসী ভারতীয় সৈনিক আবু বকরকে।

জীবনসঙ্গীকে নিয়ে সুখের জীবন রুকাইয়ার। একজন আরেকজনের সঙ্গ ভালোবাসত। নেককাজের প্রতিযোগিতায় সময় কেটে যেত দুজনার। মনে হতো অপরিসীম সুখের পেয়ালা রব উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন এই দম্পতির মাঝে। এ সুখ টিকল ১৪ বছর। এরই মাঝে রুকাইয়ার গর্ভে এসেছে সাত সন্তান। চার মেয়ে, তিন ছেলে।

রামাদান মাস চলছিল তখন। রুকাইয়ার হাত চলছে ইফতারের প্রস্তুতিতে, জিহ্বা ব্যস্ত আল্লাহর যিকিরে। এ সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আবু বকর ঘরে এসে ঢোকে। শরীর তার ঘেমে নেয়ে একাকার। মনে হচ্ছিল মাইলের পর মাইল দৌড়ে এসেছে। চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে চিৎকার, 'রুকাইয়া, পানি আনো! পানি!'

রুকাইয়া হেঁশেল ছেড়ে দৌড়ে আসে। স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে।' ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ ছিল না আবু বকরের। কেবল পানিই চেয়ে যাচ্ছিল। রুকাইয়া অবাক, ইফতারের সময় হতে আর তো ঘণ্টাখানেক! এখনই পানি! রুকাইয়া সবর করতে বলে, 'এই তো আর কিছুক্ষণ! একটু ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন!'

এরপরও যখন স্বামী পানি চাইল, রুকাইয়া দেরি করল না আর পানি দিতে। এক গ্লাস পানি ঢক ঢক করে গিলেই ওপারে চলে গেল আবু বকর। হাতের গ্লাস পড়ে ঝনঝন শব্দ বিদায়ের ঘোষণা দিল।

Scanned with CamScanner

রুকাইয়ার গর্ভে তখন অষ্টম সন্তান। সবচেয়ে বড় ছেলেটা কেবল চৌদ্দতে পা রেখেছে। সেই রামাদান রুকাইয়াকে জীবনের নতুন রূপ দেখাল। সে জানত না সামনে কী অপেক্ষা করছে। শুধু জানত—তার একজন রব আছেন। তাঁর ওপর যে ভরসা করেছে, সে কিছুই হারাবে না।

পিতৃহারা সন্তানদের নিয়ে শুরু হলো রুকাইয়ার নতুন সংগ্রাম। স্বামীর রেখে যাওয়া ঘরে তার দিন শুরু হতো ফজরের সালাত দিয়ে। ওদিকে বাড়ির অন্য লোকেরা গান-রেডিওতে মত্ত থাকত। ইসলাম মেনে চলা রুকাইয়াকে নিয়ে চলত হাসাহাসি। মধ্যবয়সী রুকাইয়ার জীবনে আঁধার নেমে আসার আরও বাকি ছিল বুঝি!

আবু বকরের বড় ভাই একদিন তার কাছে এসে বলল, 'আবু বকর আমাদের মাঝে নেই বেশ ক'দিন হলো। ভাইকে হারিয়ে আমরাও কষ্টে আছি। তবে বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে। আপনার ৮ সন্তানসহ এই বাড়িতে থাকাটা মনে হয় না আর কোনো অর্থ বহন করে। দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নিলে ভালো হয়।'

রুকাইয়া বাকহারা। কষ্ট গিলে নিয়ে কোনোমতে বলেছিল, 'দেখি।'

পরদিন রুকাইয়া গেল তার বাপের বাড়িতে। তার বাবা-মা দরিদ্র ছিলেন, তবুও সমাজে তাদের মর্যাদার ঘাটতি ছিল না। তারা রুকাইয়াকে শক্ত থাকার পরামর্শ দিলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন আবু বকরের রেখে যাওয়া ঘরটি তার ও তার বাচ্চাদের। শরীয়ত অনুযায়ী ও-বাড়িতে আর সব বাসিন্দার মতো তাদেরও থাকার অধিকার আছে।

দৃঢ়চেতা রুকাইয়া আগের চাইতেও দৃঢ় হয়ে ফিরে গেল স্বামীর ঘরে। ভাসুরকে আত্মবিশ্বাসের সাথে জানিয়ে দিল, 'অবশ্যই এটা আপনার বাড়ি। কিন্তু এটা আবু বকরেরও বাড়ি! তাই তার সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীরও এতে ততটাই অধিকার আছে ঠিক যতটা আপনার স্ত্রী-সন্তানের আছে। আপনি আমাদের বে-ঘর করতে চাইলেও আমরা অধিকার ছেড়ে দিতে পারি না। তাই আমার পরিবারের কেউ-ই এই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।'

কথা শেষে রুকাইয়া নিজের ঘরে চলে যায় সন্তানদের কাছে। আবু বকরের বড় ভাই বুঝতে পারে রুকাইয়াকে ঘরছাড়া করবার বৃথা চেষ্টা চালিয়েছে সে।

Scanned with CamScanner

সেই থেকে আবু বকরের ঘরে দিনাতিপাত করে যাচ্ছিল রুকাইয়া, সঙ্গে তার আট সন্তান। এরই মাঝে তার বড় ছেলের জন্য তার এক মামা দুবাইতে কাজ করার প্রস্তাব পাঠান। রুকাইয়া অবাক হয়ে ভাবতে লাগে রিযিকের কথা। আয়-রোজগারের চিন্তায় যখন হিমশিম খাচ্ছিল, তখনই এই খবর। সত্যিই আল্লাহ যাকে সাহায্য করতে চান, তাকে ঠেকাবার সাধ্য কার আছে? ভবিষ্যতের কথা ভেবে পনের বছর বয়সী ছেলেকে সে উৎসাহ দেয় কাজে যাবার জন্য। পরামর্শ দেয় যে-কোনো পরিস্থিতিতে শক্ত থাকতে। শপথ করায় হালাল উপার্জনের।

ছেলে মায়ের সব কথা মেনে নেয়। বড় সন্তান হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা অজানা ছিল না তার।

[তিন]

বড় ছেলে চলে গেছে দুবাইয়ে। রুকাইয়ার সংসার এখন সাত ছেলে মেয়েকে নিয়ে। একটা ঘরে জড়সড়ভাবে এতজন কাটিয়ে দেবার কষ্ট তো ছিলই, আরও ছিল ভাসুরের পরিবারের অত্যাচার। এ বাড়ি থেকে রুকাইয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেষ্টার অন্ত ছিল না তাদের। রুকাইয়ার সন্তানেরা দিনের পর দিন খারাপ ব্যবহারের শিকার হতে লাগল। তাদের সব নীতিই ভীষণ একচোখা।

কন্যারা বিরক্ত হয়ে মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাত, 'তুমি কেন ওদের জবাব দাও না মা?'

রুকাইয়া হাসত। হেসে বাচ্চাদের বলত, 'আমি আল্লাহকে তাদের জন্য জবাবদানকারী বানালাম। আমরা মানুষ তো কেবল কয়েকটা কথা-ই বলতে পারি। কিন্তু যখন আল্লাহর বিচার কার্যকর হয়, তখন যালিমের পালাবার পথ থাকে না।'

ছেলেমেয়েরা কখনও বুঝত, কখনও দেওয়ালের ওই পাশে জাঁকজমকের জীবন দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। মাঝেমধ্যেই সেখানে বড় বড় অনুষ্ঠান হয়। পিতৃহারা সন্তানদের প্রবেশ নিষেধ সে-সবে। দরজার ফাঁক দিয়ে অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখে বাচ্চারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। দুই কদম এগোলেই টেবিল ভর্তি সুস্বাদু সব খাবার, ওতে তাদের ভাগ নেই। মায়ের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে সে-সবের আবদারও খুব একটা পাত্তা পায় না। মা সব বোঝেন, তবুও আড়ালে চোখ মুছে ভাবলেশহীন গলায় বলেন, 'এই পান্তা ভাত আর আচারই তো পৃথিবীর সেরা খাবার!'

Scanned with CamScanner

একদিনের কথা। রুকাইয়ার চতুর্থ সন্তানের বয়স তখন আট। সে মায়ের কাছে এসে অনুনয় করল, 'তুমি তো কিছু টাকা ধার করে আনলেও পারো মা! আমরা একদিনের জন্য হলেও ভালো কিছু খেতে পারতাম!'

রুকাইয়ার অভাব ছিল, কিন্তু জানত—কীভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবনধারণ করতে হয়। ঋণ করে ভালো-মন্দ খাওয়ার কথা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি। সেদিন রুকাইয়া তার সন্তানদের শিখিয়েছিলেন ঋণগ্রস্ত জীবন কেবল অসম্মানই বয়ে আনে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোনোমতে খেয়ে-না-খেয়ে দিন পার করুক ওরা, তবু যেন ধার-কর্যতে না জড়ায়। আল্লাহ কোনোদিনও সেই ব্যক্তিকে মাফ করেন না, যে ধার-কর্য করে; কিন্তু তা পরিশোধ করে না। এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকাই ভালো, যেখানে আখিরাত হুমকির মুখে।

রুকাইয়া অবশেষে সচ্ছলতার মুখ দেখেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে তার বড় ছেলে মালেশশারামে বাড়ি বানিয়ে দেয় মাকে। আল্লাহর দয়া আর রহমতে আট সন্তানই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এ পর্যায়ে মনে হতে পারে নানীজান রুকাইয়ার বাকি জীবনটা অপার্থিব সুখে কেটেছে। বাস্তবতা ভিন্ন গল্প শোনায়। পরম করুণাময় তার বান্দিকে আবারও ধৈর্য-পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাসের আগ পর্যন্ত রোগে-শোকে ঝালাই করে নিয়েছিলেন তাকে। নানীজানের শেষ জীবনটা কাটে হাসপাতালে। ১৯৯৫ সালে হাসপাতালের বিছানাতেই তার মৃত্যু হয়।

কৈশোরে মা আমায় কেন নানীজানের গল্প শোনাতেন—তা আজ বুঝি। এই মানুষের গল্প জানতাম বলেই কখনও কোনো অপ্রাপ্তিতে রবের কাছে অভিযোগ করিনি। কখনও বলিনি, 'আমার সাথেই কেন এমন হয়?'

বারংবার ভেবেছি, এ অভিযোগ যদি আমার নানীজান করতেন? কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। তিনি থেমে যাননি তাতে। কখনও ভাবেননি তাকেই কেন এ পরীক্ষা দিতে হবে! বরং রবের সন্তুষ্টির আশায় সব বাধা বিপত্তি মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন।

নানীজান চেয়েছিলেন পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের জানান দিতে। পরম করুণাময় তার ইচ্ছে পূরণ করেছেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমরা তার গল্প বলে যাই। আমার মা

Scanned with CamScanner

বলেছেন, আমিও বলি, হয়তো আমার সন্তানরাও বলবে। কী চমৎকার জীবন ছিল তার! চলে গেছেন, তবুও রয়ে গেছেন হৃদয়জুড়ে![১]

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।

Scanned with CamScanner

মায়ের বিয়ে

যাইনাব আল-গাযী

[এক]

আকাশটা আজ খুব বিষণ্ণ। গুমগুম আওয়াজে থেমে থেমে কাঁদছে। মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে ধরণী। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল ফুয়াদ, কিন্তু হাসি আসছে না...

আজ তো খুশির দিন, আজ তো হাসতেই হবে; এমন মুখভার করে রাখলে মা তো কষ্ট পাবেন। আজ মায়ের বিয়ে তো...

ফুয়াদ ভাবছে আর মন হালকা করে মুখে হাসি আনার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। ভেজা ঘাস মাড়িয়ে আরেকটু সামনে গেলেই ফুয়াদের বাবার কবর, বড় একটি পাতাবাহারি গাছের নিচে ছোট করে বেড়া দেওয়া দুটি কবরের জায়গা। একটিতে ফুয়াদের বাবা, আরেকটি খালি এখনও।

ফুয়াদের মা-বাবার বিয়ের পর নাকি এই গাছের নিচে বসেই তার সময় কাটত, এত সুন্দর মনোরম একটি জায়গা! ফুয়াদ যখন খুব ছোট তখন তার হাত ধরে তার মা এখানে এসে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ফুয়াদ চেয়ে থাকত শুধু মায়ের দিকে।

আজ ফুয়াদের খুব কান্না আসছে, কিন্তু কাঁদলে তো হবে না, আজ মায়ের বিয়ে, আজ অনেক হাসিখুশি থাকা লাগবে।

Scanned with CamScanner

মনকে এত বোঝাচ্ছে ফুয়াদ তবুও কান্না চলে আসছে। ফুয়াদ বাবাকে দেখেনি কখনও। বাবার দুই-একটি ছবি[১] আছে মায়ের কাছে, মায়ের আলমারিতে থাকে। মা প্রায়ই দেখেন ছবিগুলো, ফুয়াদকে দেখিয়ে বলেন 'চেনো?'

ফুয়াদ মাথা নাড়ে। ফুয়াদের মা থুতনি টিপে ধরে বলেন, 'আপনার বড় বেলার ছবি'। ফুয়াদ ভাবতে থাকে, আমি আবার বড় ছিলাম কবে?

বাবার কবরের পাশে ভেজা ঘাসে বসে পড়ল ফুয়াদ, হঠাৎ কেমন মুচকি হেসে ফুয়াদ বলে উঠল 'আমার বাবা তুমিই, তাই না?'

[দুই]

ফুয়াদের ফোন বেজে ওঠে। এই সময়ে ফুয়াদের দুনিয়ার কারও সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না। রিং বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো মা-ও কল দিতে পারেন। আজ তো মায়ের বিয়ে, কত কারণেই তো ফুয়াদকে মা কল করতে পারেন। তড়িঘড়ি করে ফোন বের করে দেখে মেঝো খালার কল। বিরক্ত হলো ফুয়াদ। আজ মা ছাড়া আর কারও সাথেই কথা বলা যাবে না। এই আত্মীয়দের আর কোনো কাজ নেই। অন্যের জীবনে নাক গলানো ছাড়া।

ফুয়াদ দুআ শেষ করে হাঁটতে লাগল। অনেকগুলো ফুল কিনতে হবে। একদম তাজা ফুল। হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হতেই মেঝো খালার মেসেজ এলো 'কাজটি ভালো করছ না, লোকেরা এখনই কী-সব বলাবলি করছে, সমাজে নাক কাটাবে নাকি?'

ফুয়াদের মেজাজ খারাপ হলো খুব। আবার চোখে পড়লে মেজাজ খারাপ হবে বলে মেসেজটি ডিলিট করে দিল। পকেটে মোবাইল রাখতে রাখতে ফুলের দোকানে চলে এলো।

ফুল দেখেই ফুয়াদের মন ভালো হয়ে গেল। আসার আগে মাকে বলেছিল 'মা, তুমি ফুল দিয়ে সাজবে না?'

মা খুব বিষণ্ন ছিলেন। জবাব দেননি। ফুয়াদ ভেবেছিল অনেকগুলো গোলাপ কিনবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সাদা ফুল নেবে; শুভ্রতায় ছেয়ে যাবে চারদিক।

---

[১] বিনা প্রয়োজনে এ ধরনের ছবি রাখা ঠিক নয়। আর যদি তা হয় স্মৃতিচারণের জন্য তবে তো আরও ঠিক নয়।

Scanned with CamScanner

ফুল দেখছিল ফুয়াদ। ফুলওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন উপলক্ষে ফুল কেনা হচ্ছে?' ফুয়াদ ফুল দেখতে দেখতেই বলল, 'আমি জানি না কী-কী ফুল লাগে; আজ মায়ের বিয়ে, মা খোপায় দেবে, ঘর সাজাবে আর কী-কী যে করবে জানি না। আমার অনেক ফুল লাগবে।'

ফুলওয়ালা অবাক হয়ে তাকালেন। ফুয়াদ সে চাহনি বোঝে। তাই সেদিকে না তাকিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

[তিন]

ফুল নিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে দুপুর হলো। ফুয়াদ খুব অস্থির হচ্ছে ফুলগুলো নিয়ে। হইচই করছে শুধু-শুধু—'মা এখনও কিছু করো নাই? বেডশিট চেঞ্জ করো নাই, রুমটাও ময়লা। আচ্ছা, তুমি অন্য রুমে যাও, আমিই করছি সব। তুমি রেডি হচ্ছ না কেন, মা?'

রাইহানা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওড়নায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। এই কান্নার ভাষাও ফুয়াদ বোঝে। ফুয়াদ না মায়ের প্রতিটি নিঃশ্বাস বুঝতে পারে!

মায়ের কান্না দেখে ফুয়াদ হাত থেকে সব ফেলে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে, বাবা আর আমি দুজনে মিলে আমার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। আজ কেঁদে কেঁদে আমার আনন্দ নষ্ট করো না, আজ আমার অনেক আনন্দ, বুঝলা?'

মাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পাশের রুমে ঢুকিয়ে চোখের ইশারায় আদেশ করল ফুয়াদ, 'বধু সেজে নাও।'

ফুয়াদ আবার নিজের কাজে মন দিল। রুম সাজাতে হবে ফুল দিয়ে, নতুন বিছানার চাদর দিয়ে। একটি এয়ার স্প্রেও কিনেছে বেলি ফুলের।

[চার]

রাইহানা বিছানায় বসে ওড়না দিয়ে চোখ মুছে নিলেন। বিছানায় একটি লাল-সাদা শাড়ি রাখা। কতগুলো লাল চুড়ি রাখা, একটি বড় লাল ওড়না একজোড়া লাল-সাদা কাজ করা জুতা, এক বক্সে কতগুলো অলংকার।

Scanned with CamScanner

বড় লাল ওড়নাটি গায়ে জড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন রাইহানা। কত স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। ১৪ বছর বয়সে ফুয়াদের দাদার বাড়িতে ঠিক এমন একটি লাল ঘোমটায় বধূ সেজে এসেছিলেন তিনি।

মনে পড়ে গেল তাদের মাত্র ছয় মাসের সংসারের কথা। মনে পড়ে গেল ফুয়াদের বাবার চলে যাওয়ার কথা। কতই-না মধুর ছিল সেই ছয়টি মাস। জীবনে অনেকবার সেই ছয়টি মাসের মধুরতা খুঁজেছিলেন তিনি। সংসার কী—সেটি বুঝে ওঠার আগেই বিধবা-জীবন কী সেটি বুঝতে শুরু করেছিলেন।

ফুয়াদের বাবাকে অনেক ভালোবেসেছেন ছয় মাসেই; কিন্তু তাও চেয়েছেন পুরো সংসার-জীবন যেন বাচ্চা আর স্বামী সামলিয়েই কাটে। সংসার কী—আবারও বুঝতে চেয়েছিলেন। তার সেই আকুতি মুখ ফুটে আসেনি, লজ্জার আড়ালে হারিয়ে গেছে; পরিবার বোঝে না, পরিবার বুঝলে সমাজ বোঝে না। ফুয়াদকে আগলে রেখেই তো চোখের পানি আড়াল করতেন। সে-ফুয়াদকে রেখে কীভাবে তিনি সংসার পাতবেন আবার? আচ্ছা, মানুষগুলো এমন কেন?

রাইহানা গুনে গুনে দেখছেন আর ডুকরে কেঁদে উঠছেন—কতগুলো বিয়ে একদম হয়েও হয়নি তার। কেন হয়নি? ফুয়াদ আছে বলে।

মাঝে মাঝে রাইহানা ভাবেন—ফুয়াদ না হলে কী হতো? তার কম বয়সে বিয়ে, অল্পদিনের সংসার, স্বামীর মৃত্যু—এইসব মনে হয় আজীবন গোপন করে রাখা লাগত।

রাইহানা বোঝেন না, মানুষ প্রকাশ্যে কত গুনাহ করে। আর রাইহানাকে তার পবিত্র একটি সম্পর্ক আর সন্তানের কথা গোপন করে আজীবন চলতে হবে কেন। রাইহানা আবারও ভাবলেন—আচ্ছা, ফুয়াদ মেয়ে হলে কি এতদিনে ফুয়াদকে বিয়ে দিয়ে নিজেও বিয়ে বসা যেত?

[পাঁচ]

ফুয়াদ অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগের সাথে রুম সাজানোর কাজ করছে, মাঝে মাঝে চোখ মুছছে। আনন্দ লাগছে নাকি কষ্ট—আপাতত সেটি বুঝে আসছে না। তবে আনন্দই হবে, ফুয়াদের মনে পড়ে—ফুয়াদ যখন ছোট ছিল, মা তাকে ধরে কাঁদতেন খুব, ফুয়াদ দাদার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত। মা থাকতেন নানার বাড়ি। সপ্তাহে

Scanned with CamScanner

একদিন দেখা হতো আর সেই একদিনই মা সারাক্ষণ ধরে রাখতেন। ফুয়াদ ঘুমালে মা ফুয়াদের মাথা নিজের বুকে রেখে শুয়ে থাকতেন।

ফুয়াদের বয়স যখন বারো বছর তখন ছোট খালার বিয়ে হলো, ফুয়াদ তখন থেকে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। ফুয়াদের মনে পড়ে, খালার বিয়ের পর খালা নানার বাড়ি বেড়াতে এলে কত আয়োজন হতো, কত কিছু রান্না হতো, খালা কত গল্প করতেন সে-বাড়ির লোকেদের। জামাইয়ের কথা বলতেই তো খালা লাল হয়ে যেতেন। ফুয়াদ দেখত, এসব গল্পের আসরে তার মাকে দেখা যেত না। মা রান্না-ঘরে বসে থাকতেন। মায়ের কাছে জামাই-বাড়ির গল্প করার মতো কিছুই থাকত না যে!

ফুয়াদ মাকে আর খালাকে দেখে, দুইজনের জীবন দেখে; মায়ের আর খালার হাসি দেখে। এসব দেখে দেখে ফুয়াদ অনেক বড় হয়ে যায়। একসময় ভাবতে থাকে, মা কেন নানার বাড়িতেই থাকে? মা কেন জামাই-বাড়ি থেকে বেড়াতে আসে না? আর মায়ের জন্য কেন কোনো আয়োজন করা হয় না?

দুই বছর আগে একদিন ফুয়াদ মেঝো খালাকে বলেছিল 'খালামণি, মায়ের জন্য ছেলে দেখো, মাকে বিয়ে দাও, আমার একজন বাবা লাগবে। যেমন—শাইরি আর আশিকের বাবা আছে।'

খালা এমন ভাব করলেন, যেন এক্ষুনি কিয়ামত শুরু হবে। বিছানায় জোরে হাত মেরে বললেন, 'তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে, তোমার জন্য মেয়ে দেখতে বলো। এখন তোমার মায়ের বিয়ের বয়স আছে নাকি?'

'আরে খালা, আস্তে; এত রেগে গেলা কেন?'

'রাগব না? কে বিয়ে করবে এত বড় ছেলের মাকে? কোনো বুড়া-থুড়া আসবে আরকি! পরে শেষ-বয়সে এসে কোনো বুড়ার নায়-নাতক পালা লাগবে তোমার মায়ের; এর থেকে একাই ভালো। খাও-দাও-ঘুমাও। দুনিয়ার জঞ্জালমুক্ত জীবন।'

'পালা লাগলে লাগল। তাতে তোমার তো কিছু যায় আসে না। মা এভাবে কেন থাকবে? মায়ের নিজের ঘর-সংসার হবে। মা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে—নিজের জন্য রাঁধবে, নিজের জন্য যা করার করবে।'

Scanned with CamScanner

'দেখ, এই ভূত মাথা থেকে নামা। বিয়ের একটা বয়স থাকে, তোর মাকে এখন বিয়ে দিলে মানুষ কী বলবে? বুড়া কালে নোংরামি। তাছাড়া তুই বিয়ে করবি ক'দিন পর। কোনো বাবাই তার মেয়েকে তোর হাতে দেবে না, যখন দেখবে পরিবারের মুরুব্বিদেরই চরিত্রে সমস্যা।'

'আজব ব্যাপার তো খালা! বয়স হয়ে বিয়ে হলে চরিত্রে কেন সমস্যা হবে? আমি তো এতে কোনো দোষ দেখি না। সত্যকথা বলো, আসলে তোমরাই চাচ্ছ না—মা ভালো থাকুক নিজের জগৎ নিয়ে। তোমরা চাচ্ছ—মা তোমাদের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিক।'

'এখন আমাদের দোষ হলো? আমরা তার সুখ চাই না, তাই না? সে কি খারাপ আছে? কত ভালো রেখেছি তাকে—এমন করে আর কয়জন রাখে?'

'তোমরা তোমাদের মতো ভালো রেখেছ, কিন্তু মা কীসে ভালো থাকবে সে-সব কি ভাবো?'

সেদিন ভালো করে ঝগড়া লেগেছিল তাদের। ফুয়াদের খুব লেগেছে। কেমন যেন মানুষগুলোর মানসিকতা। ফুয়াদ সেদিন ঠিক করেছিল, মাকে নিয়ে আলাদা থাকবে, আর সে নিজে-ই মাকে বিয়ে দেবে। মা যে কত কষ্ট করে ফুয়াদকে আগলে ধরে এতগুলো বছর কীভাবে কাটিয়ে এসেছে, যেন-কেউ দেখেই না। এমন কেন হয়? সমাজের আনাচে-কানাচে এমন কত রাইহানা আছে, তাই না? যাদের কেউ হাত ধরে সামনে নিয়ে যায় না, আরেকবার স্বপ্ন দেখায় না, আরেকবার হাসতে দেয় না।

ফুয়াদ ফুল সাজায় আর ভাবে, মাকে সে লুকিয়ে রাখবে এইসব মানসিকতার মানুষদের থেকে। অনেক কঠিন একটি কাজ হবে। তাও মাকে আর কারও কথা শুনতে দেবে না ফুয়াদ।

আনন্দের দিনেও এই ভাবনাটি ফুয়াদকে কষ্ট দিচ্ছিল বারবার।

[ছয়]

আইশা এসেছিল রাইহানাকে সাজাতে, আইশা ফুয়াদের বন্ধুর বোন। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিল সে রাইহানাকে। রাইহানা আয়নায় নিজেকে দেখছে। অনেক বছর পরে সাজগোজ করল, কারও জন্য হাতে মেহেদি লাগালো, কারও জন্য চোখে টানা করে কাজল লাগালো। রাইহানার ভালো লাগছে খুব। এমন সময় দরজায় টোকা দিল

Scanned with CamScanner

ফুয়াদ, রাইহানা এগিয়ে দরজা ফাঁক করে ফুয়াদকে দেখেই আবার লাগিয়ে দিল। ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে বধু সেজে ছেলের সামনে যেতে। ফুয়াদের আনন্দে চোখে পানি চলে এসেছে। মাকে কী সুন্দর লাগছে, ইশ!

মা, মা, মা, সামনে আসো, তোমার চুলে ফুল লাগানো বাকি আছে!

রাইহানা আবার দরজা খুললেন, লজ্জায় ছেলের দিকেও তাকানো যাচ্ছে না। ফুয়াদ মায়ের হাতে ফুলগুলো দিয়ে বলে 'আমি এসব বেঁধে দিতে পারি না, তুমি বেঁধে নাও, আর রেডি হও; হুজুর চলে আসছে কিন্তু।'

আওয়াজ কিছুটা নামিয়ে মায়ের হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আর আমার নতুন বাবাও।'

রাইহানা ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে সরিয়ে রুমের দরজা লাগিয়ে দিলেন। তার সারা শরীরে কম্পন খেলে গেল। সব শক্তি দিয়ে হেঁটে বিছানায় বসে পড়লেন ধপাস করে আর ভাবলেন, 'আমার আবার সংসার হবে, আবার কারও সাথে অভিমান করব, আবার কারও সাথে হাসি-আনন্দ করব, আবার আমি মা হব; আবার আমি কারও হাত ধরে ভোরের কুয়াশা-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে অজানায় হেঁটে যাব।'

ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ফুয়াদ দরজায় টোকা দিল 'মা, একটি সাইন করে দাও, আমি খেজুর ছিটিয়ে দিই।'

আয়নায় রাইহানা নিজের লজ্জা মাখানো হাসি চেপে রাখা মুখের দিকে তাকালেন...

Scanned with CamScanner

জাওয়াদ ও তার বাবা

নুসরাত জাহান

জাওয়াদের সাথে ওর বাবার সম্পর্ক একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। জাওয়াদের অটিজম আছে এ ব্যাপারটি নিয়ে শুরুর দিকে আমি যতটা ভেঙে পড়েছিলাম জাওয়াদের বাবা ঠিক ততটাই স্ট্রং ছিল। জাওয়াদ কথা বলে না। তবুও আমার চেয়ে তার বাবা বেশ ভালো বোঝে জাওয়াদের প্রয়োজনগুলো।

রামাদান মাস। সেই সাথে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল ইংল্যান্ডে। জাওয়াদের বাবা দুপুরে কাজ থেকে ফিরল। দরদর করে ঘামছে। এসে দেখে, ছেলে বিরামহীন কেঁদে চলছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না—কী করে ওর মনটা অন্যদিকে ডাইভার্ট করব। আমাদের বাসার পাশে একটি পার্ক ছিল। ওর বাবা রোযা অবস্থায় ভর দুপুরের প্রচণ্ড রোদে জাওয়াদকে পিঠের ওপর নিল। এরপর রওনা দিল পার্কের দিকে। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কোনোভাবে ছেলেটি একটু আনন্দ পায়।

জাওয়াদ লাফাতে খুব পছন্দ করে। এটি তার বিনোদনের একটি অংশ। এখানে এক বাসায় বেড়াতে গিয়ে জাওয়াদের বাবা আবিষ্কার করল, জাওয়াদ তাদের বাগানে রাখা ট্রাম্পোলিনে লাফিয়ে খুব মজা পাচ্ছে। বাসায় এসে মনস্থির করে ফেলল, বাগান আছে এরকম একটি বাসা পেলে জাওয়াদের জন্য ট্রাম্পোলিন কিনবেই। আমি খুব একটা সায় দিইনি; কারণ, অতীতে জাওয়াদের জন্য যতগুলো খেলনা কিনেছি তার সবটাই বাক্সবন্দি পড়ে আছে। অটিস্টিক বাচ্চারা কোনোকিছুর প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। খেলনাগুলোর প্রতি জাওয়াদের আগ্রহ

Scanned with CamScanner

ছিল কেবল কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

২০১৬ সালে আমরা নতুন বাসায় উঠলাম। বাসার পেছনে প্রশস্ত বাগান। একদিন কুরিয়ারে পার্সেল আসল। খুলে দেখি ট্রাম্পোলিন! জাওয়াদ তখন স্কুলে। ট্রাম্পোলিনটা বাগানে সেট করে রাখা হলো। জাওয়াদ স্কুল থেকে ফিরল। তার বাবা তাকে নিয়ে বাগানে গেলেন। ছেলে এক ঝলক দেখেই দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রাম্পোলিনের ওপরে। জাওয়াদ অসম্ভব আনন্দে খিলখিল করে হাসছে আর লাফাচ্ছে। জাওয়াদের বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে মুগ্ধ হয়ে ছেলের আনন্দ দেখছেন। আর আমি চোখভর্তি পানি নিয়ে বাবা আর ছেলেকে দেখছিলাম! সন্তানের আনন্দ মা-বাবার জন্য যে কতখানি সুখের—তা বলা সত্যিই বেশ কঠিন।

জাওয়াদের মারাত্মক ফুড এলার্জি আছে। অনেক খাবার সে খেতে পারে না। ডিম, মাছ নিষিদ্ধ ওর জন্য। ফ্রুটস আর মাংস খেতে সে খুব ভালোবাসে। এর মাঝে আমার মেয়ের জন্ম। সংসার তখন আরেকটু বড় হলো। একদিন জাওয়াদের বাবা নিজ উদ্যোগে আরেকটি ফ্রিজ কিনে আনল। আমাকে বলল, এ ফ্রিজটি যেন ওর পছন্দের খাবার দিয়ে ভর্তি থাকে। আমার ছেলেটি কথা বলে না। ওর কী খেতে ইচ্ছে করে সেটি যেহেতু সে বলতে পারে না, তাই ওর সব পছন্দের খাবার স্টকে রাখব। যাতে ও সেটির অভাব বোধ করার আগেই আমরা ওর সামনে রাখতে পারি।

আমি বাবাকে পাইনি। জাওয়াদের প্রতি তার বাবার সীমাহীন ভালোবাসা দেখে বুঝেছিলাম বাবারা কেমন হয়!

জাওয়াদকে স্কুল থেকে আনা-নেওয়ার জন্য বাস আসে। একদিন আমি বাইরে। জাওয়াদের বাবা দুপুরে মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন চোখ লেগে এলো সে টের পায়নি। ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। কেউ একজন দরজা ধাক্কাচ্ছে। উঠে গিয়ে দেখে—জাওয়াদের স্কুল-বাসের ড্রাইভার খুব রাগান্বিত ও এগ্রেসিভ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখামাত্রই প্রচণ্ড ঝাড়ির পর ঝাড়ি দিয়ে চলল। কেন জাওয়াদের বাবা গাড়ির হর্ন শোনেনি, জাওয়াদকে গাড়ি থেকে পিক করার জন্যে আসেনি। সে নাকি পাঁচ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল!

বাসায় ফিরে দেখি তার বাবার মন খারাপ। জিজ্ঞাসা করলাম কী হলো। সব শুনে বললাম, সে কেন ঝাড়ি শুনে গেল! উল্টো কিছু কথা কেন শুনিয়ে দিল না! জবাবে জাওয়াদের বাবা বলল, 'থাক বাদ দাও! আমার ছেলেটি কথা বলতে পারে না।

Scanned with CamScanner

আজকে আমি তাকে দুটি কথা শোনাতে পারতাম; কিন্তু কাল যদি সে আমার ছেলের কোনো ক্ষতি করে—তাকে মারে বা কষ্ট দেয় তবে আমার ছেলেটি তো এসে বলতেও পারবে না। আমার অপমান আমি মেনে নিতে পারব; কিন্তু আমার ছেলে কারও দ্বারা কষ্ট পাক এটি আমি সহ্য করতে পারব না।'

অন্যরকম একটি অনুভূতি কাজ করছিল তখন। আমার ছেলেটি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান, আলহামদু লিল্লাহ; কারণ, তার এমন একজন বাবা আছে!

আরেকবার, প্রচণ্ড জ্বরে জাওয়াদ বিছানায় সারারাত কাতরাচ্ছিল। একজন মানুষ পরদিন ভোরে কাজে যেতে হবে জেনেও জাওয়াদের মাথার পাশে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিল। সে জাওয়াদের বাবা!

বাংলাদেশে যাচ্ছি। বারো-তেরো ঘণ্টার জার্নিতে জাওয়াদ মারাত্মক রকমের রেস্টলেস—যা সামনে-পেছনে বেশিরভাগ যাত্রীদের অসুবিধার কারণ হয়ে উঠেছিল। একজন মানুষ জাওয়াদকে নিয়ে প্লেনের এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াচ্ছে; যেন ছেলেটি বোর ফিল না করে। থেকে থেকে এর কাছে-ওর কাছে বিনম্রভাবে ক্ষমা চাইছেন অসুবিধার কারণ হবার জন্য। মানুষটি জাওয়াদের বাবা!

জাওয়াদকে নিয়ে একা দেশে যাই একবার। অফিস থেকে বাসায় এসে জাওয়াদকে দেখছে না, রাতে ছেলের গায়ের গন্ধ শুঁকে ঘুমাতে পারছে না—এই কষ্ট নিতে পারেনি একজন মানুষ। পনের দিন যেতে না যেতেই বসকে 'চললাম' বলে টিকেট করে প্লেনে উঠে পড়ল। সে জাওয়াদের বাবা!

আমি একবার হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার ছেলে তোমাকে বাবা ডাকে না, কথা বলে না, তারপরও ছেলেকে ছাড়া পনেরটি দিন টিকতে পারলে না।'

জবাবে তিনি বললেন, 'আমার ছেলে আমাকে বাবা না ডাকুক, ও আমার চোখের সামনে আছে—এটাই আমার জন্য অনেক কিছু।'

এত ভালোবাসার মতো শক্তি যার বাবার আছে—সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান!

জাওয়াদ হয়তো নিশ্চিত—একদিন এ ভালোবাসার কথা জানবে। এপারে না হলেও ওপারে তো বটেই...!

Scanned with CamScanner

তোমায় ভালোবাসি

আরিফ আজাদ

বিয়ের আগে শেষ যে-বার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে-বার হাতে বেশ কিছুদিন ছুটি ছিল।

বাড়ি আসার আগে আম্মা বারবার ফোনে জিজ্ঞেস করতেন কত দিনের জন্য আসছি। আমি বলতাম, 'এই হবে সপ্তাহখানেক।'

আমার উত্তর শুনে ফোনের ওপাশে আম্মা চেঁচিয়ে উঠে বলতেন, 'তোমাকে না বলেছি হাতে বেশি সময় নিয়ে আসতে, এক সপ্তাহ দিয়ে কী হবে?'

এক সপ্তাহ! মানে, পুরোপুরি সাত-সাতটা দিন। সাত দিনে কী না করা যায়? আমেরিকা হিরোশিমার বুকে ইতিহাসের ভয়াবহ পারমাণবিক বোমা ছুড়ে মারতে সময় নিয়েছে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। এতেই পৃথিবীর একাংশের চেহারা বদলে গেছে। আর আমার আম্মার কাছে সাত দিন নাকি একেবারেই যথেষ্ট নয়!

যাহোক, আম্মাকে বলতাম—'অফিসের নিয়মই এটা। সাত দিনের বেশি ছুটি কাটানো যায় না।'

আম্মা তো নাছোড়বান্দা! বলে, 'অত-শত বুঝি না! একমাস না-হোক, পনেরো-বিশ দিনের ছুটি নিয়ে হলেও তোমাকে আসতে হবে।'

Scanned with CamScanner

জন্মদাত্রী মা আমার আবদার করেছেন বলে কথা। পৃথিবীর এই একটি জায়গায় কোনো যুক্তি-তর্ক খাটে না বা খাটানো ঠিক না। গোটা দশ-পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। চাকরিজীবনে এত লম্বা ছুটি কখনও নিয়েছি বলেও মনে হয় না।

টানা চার চারটে বছর পরে বাড়ি ফিরছি। মনে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করছিল। শেকড়ের টান সম্ভবত। খোলা আকাশের নিচে খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে যাওয়া পাখিটা সন্ধ্যেবেলায় নীড়ে ফেরার সময় যেমন করে দিনের সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ বাতাসেই বিলীন করে আসে, সে-রকম আমিও সারা বছরের কাজের চাপ, মানসিক অশান্তি, চিন্তা—সবকিছুই যেন ইট আর পাথরের শহরে বন্ধক রেখে ফিরছি। নির্মল খুশিতে মাতোয়ারা আমার মন। আমার শৈশবের মাঠ, নদী, দিঘি, বিল—সবকিছুই তখন আমাকে চুম্বকের মতো টানছে। মায়ের ভালোবাসা আর বাবার আদরের পরমাত্মার এক অকৃত্রিম টান আমি খুব দূর থেকেও অনুভব করতে পারছি—যেমনটা অনুভব করেছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিরে পাওয়ার আগ-মুহূর্তে। সম্পর্কের বন্ধনগুলো বুঝি এমনই হয়...

বাড়িতে যে আমার জন্যে এরকম একটা চমক অপেক্ষা করছিল তা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। আমি বাড়ি আসার ঠিক পরেরদিন আমাদের বাড়িতে ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড! অদ্ভুত বলছি একারণেই কারণ, এরকম একটি ব্যাপার আমার সাথে ঘটতে পারে—তা আমার ভাবনার অতীত ছিল।

অপরিচিত কিছু লোক সেদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। লোকগুলোকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার। না দেখাটাই স্বাভাবিক। গোটা বছর চারেক তো বাড়ির বাইরেই ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে বাবার সাথে কত লোক, কত মানুষের সাথেই তো বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। অচেনা লোকগুলোর প্রতি আমার কোনো কৌতূহল ছিল না। আমি তখন জানালার পাশে শুয়ে শুয়ে Jeffrey Archer এর *Father's Last Sin* বইটি পড়ছিলাম। জানালার ওপাশে, বাইরে হাসনাহেনা ফুটে সাদা হয়ে আছে। কাল সারারাত এই ফুলগুলোর মাতাল করা গন্ধে ঘর মৌ মৌ করছিল। আমার খুব ভয় ভয় লাগছিল অবশ্য। জিন-ভূতে আমার কোনোকালেই ভয় ছিল না; কিন্তু সাপ-টাপে আমার মারাত্মক ফোবিয়া কাজ করে। ছোটবেলায় আমি মাঠে খেলতে যেতাম না কখনও। বাবা একবার বলেছিলেন মাঠে নাকি সবুজ রঙের সাপ থাকে। সেদিন থেকেই মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণের পরও আমার মন থেকে এই ভয় কাটেনি। এতটাই ভীতু ছিলাম।

Scanned with CamScanner

হঠাৎ বাবা ডাক দিয়ে ভেতরে যেতে বললেন। আমি আড়মোড়া ভেঙে কোনোমতে শার্ট গায়ে দিয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে হাঁটতে লাগলাম বসার ঘরের দিকে।

সালাম দিয়ে রুমে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'বসো।'

আমি সোফার এক পাশে আঁটোসাঁটো হয়ে বসলাম। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। বাবার ডাক পেয়ে ছুটে আসতে গিয়ে শার্টের দুটি বোতাম লাগাতেই ভুলে গিয়েছি। বাবা স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শার্টের বোতাম লাগাও'।

এতগুলো মানুষের সামনে আমি বেশ লজ্জা পেলাম। মাথা নিচু করে শার্টের বোতাম লাগিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলাম। বাবা ব্যবসায়ী মানুষ। পড়াশোনা কম বলে হিসেবপত্রে প্রায়ই গণ্ডগোল পাকিয়ে বসতেন। বাড়িতে থাকতে বাবার সমস্ত হিসেবপত্র আমিই দেখভাল করতাম। তখন ব্যবসায়ের কাজে অনেক লোকই আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাবা তখনও আমাকে ঠিক এভাবেই ডাক দিতেন। আমি ভোঁ-দৌড়ে চলে আসতাম। বাবাকে খুব ভয় পেতাম তো, তাই।

বাবা উপস্থিত লোকগুলোর চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ হলো আমার ছেলে।'

বাবার কথা শুনে লোকগুলো ভারি অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল। ডিটেক্টিভরা যে-রকম সন্দেহভাজন কারও দিকে তাকায়, সে-রকম। আমি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম। অস্বস্তি লাগছিল। চৈত্রের দাবদাহে মাঠঘাট যে-রকম শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়, আমার গলার অবস্থাও তখন ঠিক সে-রকম। মুহূর্তেই শরীরে পানিশূন্যতা অনুভব করলাম।

উপস্থিত লোকদের একজন বলল, 'বাবা, তোমার নাম?'

আমি মিনমিন করে আমার নাম বললাম। তারা আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। তাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই বুঝতে পেরে আমার বাবা তার চিরাচরিত রোবোটিক গলায় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এখন যাও'।

আমি বাধ্যছেলের মতো উঠে আমার রুমে চলে এলাম। অসমাপ্ত রেখে যাওয়া Jeffrey Archer এর বইতে মগ্ন হলাম আবারও।

সে-রাতেই বুঝতে পারলাম যে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্রীপক্ষের আমাকে দেখে পছন্দ হয়েছে। আমার পরিবারও পাত্রীকে পছন্দ করেছে। সবাই রাজি। আম্মা

Scanned with CamScanner

আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বরাবরের মতোই নিশ্চুপ ছিলাম। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ জেনে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

ছোটবেলায় রবি ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পের অপুর কথা মনে আছে? তার বিয়ে ঠিক হবার পরে দূর-সম্পর্কের কোনো এক পিসির কাছেই সে হৈমন্তীর একটি ফটোগ্রাফ দেখেছিল কেবল।

আমিও যে এমন একটা সময়ে এসে অপুর ভূমিকা নেব, সে-কথা কে-ই বা জানত!

আমার ছোট বোনের কাছে পাত্রীর একটি ফটোগ্রাফ জমা ছিল। যদিও সেটি হৈমন্তী গল্পের মতো আনাড়ি কারও হাতে তোলা না। বেশ দক্ষহাতের ছোঁয়া ছিল তাতে। সেই ফটোগ্রাফটি আমি দেখেছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে একটি শিহরন জাগার কথা ছিল। কিন্তু আমি তখনও নির্বাক ছিলাম। এমন নয় যে, বাবা-মার পছন্দ করা পাত্রী আমার পছন্দ হয়নি। ব্যাপার হলো—আমার যে সত্যি সত্যিই বিয়ে হবে, সেটাই তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় আমাদের বিয়ে হলো। যে-মেয়েটির সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ওর নাম ফাতিমা। স্বভাবতই আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। ফাতিমা সামনে আসতেই আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম। ব্যাপারটি যে কেবল আমার সাথেই ঘটত, এমন না। খেয়াল করেছি, ঠিক একই ব্যাপার ফাতিমার বেলায়ও ঘটত। সেও আমার সামনে এলে ভীষণ-রকম অস্বস্তিতে ভুগত। যেন দৌড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে।

দুজন দুজনকে বিয়ের আগে চিনতাম না, জানতাম না। হঠাৎ একটা বন্ধন আমাদের দুজনকে এক করে দিল। এই হঠাৎ মেলবন্ধনের দূরত্বটা দুজনের কেউ তখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে' এই অজুহাতে চাকরিস্থল থেকে আমাকে আরও বেশকিছুদিনের ছুটি দেওয়া হলো। বিয়ের পরে আরও এক মাস ছুটি কাটিয়ে আমি আমার চাকরিস্থলে ফিরে আসলাম। এই এক মাসে ফাতিমার সাথে আমার খুব কমই কথা হয়েছে। আমি কথা বলার চেষ্টা করলেই সে কাচুমাচু শুরু করত। মাঝে মাঝে হ্যাঁ-হু করত, নয়তো মাথা নাড়ত।

Scanned with CamScanner

আমি বুঝতে পারি, বিয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ, নতুন এক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের দুজনেরই খুব সময় দরকার।

চাকরিস্থল থেকে আমি দিনে দুবার করে আম্মাকে ফোন দিতাম। কথা বলার পরে আম্মা ফোনটা ফাতিমার হাতে দিয়ে সরে আসতেন। ফাতিমাকে আমি সালাম দিতাম। সে সালাম নিত বুঝতে পারতাম। আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'কেমন আছেন?'

সম্পূর্ণ নতুন একজনকে 'তুমি' সম্বোধন করার জন্য তখনও আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফাতিমা খুবই ছোট্ট স্বরে বলত, 'ভালো।'

আমি জানি সেও জানতে চাইত আমি কেমন আছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারত না। জড়তা কাজ করত।

একবার ফোন এলো বাড়ি থেকে। আম্মা জানালেন, ফাতিমার খুব জ্বর। ফাতিমার অসুস্থতার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধপ করে ওঠে। একটা অদৃশ্য কষ্ট অনুভব করছিলাম কোথায় যেন। এটা কীসের? এমন হলো কেন?

তার সাথে তো অল্প কিছুদিন আগেই আমার বিয়ে হয়েছে। দুজন দুজনকে পুরোপুরি বুঝেও উঠতে পারিনি আমরা। তাহলে? এই কষ্ট লাগা কীসের?

আমি বাড়িতে ফোন করা বাড়িয়ে দিই। একটু পরপর ফাতিমার খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করি। সে কেমন আছে, খাচ্ছে কি না, ঘুমাচ্ছে কি না, ওষুধ নিচ্ছে কি না ইত্যাদি...

আমি বুঝতে পারি—একটা অদৃশ্য টান তৈরি হয়েছে তার প্রতি। আমার একটা অংশ হয়ে উঠছে সে দিনে দিনে।

একবার ঈদে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত আমাদের গাড়িটির অন্য একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। কারও কোনো ক্ষতি না হলেও আমরা বেশ কয়েকজন মারাত্মক আহত হই। আমাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয়। তখন দেখেছি আমার মা, বাবা আর বোনের পরে আরও একজন মেয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে আমার জন্য কাঁদছে। তারও চোখজোড়া জবা ফুলের মতো টকটকে লাল। কত রাত যে ঘুমায়নি কে জানে!

Scanned with CamScanner

সে লজ্জায় আমার সাথে কথাই বলতে পারে না। তাহলে আমার জন্য সে কাঁদছে কেন? সে কি বুঝতে শুরু করেছে আমাকে? সে কি বুঝতে শুরু করেছে আমাদের মধ্যকার আত্মিক টান? হয়তো...

ফাতিমা যখন কনসিভ করে, তখন আমি আবারও লম্বা ছুটি নিয়ে বাড়ি আসি। আমার মনে আছে, তার যখন ডেলিভারি হবে, তখন সে জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদছিল প্রসব-বেদনায়।

আমি দিগ্বিদিক ছুটছিলাম। তার কান্নার শব্দে আমার চোখ দিয়েও অঝোর ধারায় পানি ঝরছিল। বারবার আল্লাহকে বলছিলাম তাকে আরোগ্য দান করতে। তার কান্নার শব্দ আমার বুকে যেন তিরের মতো বিঁধে যাচ্ছিল। সেই সময়টুকু যেন মহাকালের মতো দীর্ঘ! খুব করে চাইছি সময়গুলো ফুরিয়ে যাক। আল্লাহকে বারবার বলছিলাম, 'হে দয়াময়, ফাতিমাকে ধৈর্য দাও, ধৈর্য দাও।'

আমি অনুভব করলাম, ফাতিমাকে আমি ভালোবাসি। সে আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। তাকে ছাড়া আমার চলবে না। আমি আরও অনুভব করলাম, ফাতিমাও আমাকে ভালোবাসে। আমাকে ছাড়াও তার চলবে না। আমরা দুজনে একে অপরের পরিপূরক।

এই যে নারী, তাকে তো আমি চিনতাম না। তবে কেন তার জন্য আমার এত ভালো লাগা? এত ভালোবাসা? এত প্রেম! এত দরদ! এত মায়া!

আমি স্মরণ করি আল্লাহর সেই আয়াত—

> তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিণী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।[১]

[১] সূরা রূম, আয়াত : ২১।

Scanned with CamScanner

পূর্ণতার মাঝেই শূন্যতা

আনিকা তুবা

নিপা মেয়েটি অল্প বয়স থেকেই বেশ সচেতন ছিল। নিজে সালাত আদায় করে বাসার সবাইকেও সালাতের কথা বলে বেড়ায় এই মেয়ে। বালেগ হওয়ামাত্র বোরকা পরা শুরু করেছে, এখন পরিপূর্ণ হিজাব ছাড়া কোনো পরপুরুষের সামনেই বেরোয় না। প্রতিদিন কুরআন থেকে অন্তত এক পাতা করে হলেও তার পড়া চাই। বাবা-মাকেও সালাত ধরিয়েছে সে।

সমস্যা বেঁধে গেল বিয়ের সময়! বাবা-মা চায় মেয়ে তাদের পছন্দের ছেলেকেই বিয়ে করুক। মেয়ে চায় নামাজী-পরহেজগার পাত্র ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। বহু রেষারেষি, মনকষাকষি আর উত্তপ্ত বাদানুবাদের পরে অবশেষে মায়ের চোখের জলের কাছে মেয়েকে হার মানতে হলো। বুক ভরা অভিমান নিয়ে বাবার পরিচিত এক ছেলের সাথে দেখাদেখি করতে সায় দিল সে।

ছেলে দারুণ হ্যান্ডসাম, ছয় ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা; তুখোড় ইংরেজি বলে। নিজস্ব ব্যবসা আছে। যদিও দাড়ি নেই। বাবাকে বারবার করে বুঝিয়ে বলা হলো, ছেলের কাছে যেন অবশ্যই জানতে চাওয়া হয়—সে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো আদায় করে কি না। ছেলের রূপে-গুণে মুগ্ধ পাত্রীর বাবা কেবল বলেছিল 'নামাজ-কালাম পড়া হয় নাকি বাবা?'

Scanned with CamScanner

উত্তরে পাত্রের বাবাও হালকা স্বরে বলেছিল 'আরে, হ্যাঁ মশাই। নামাজ-কালাম কে না পড়ে? হে হে...'

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন আগে নিপা বুঝতে পেরেছিল—এ তার স্বপ্নের ছেলেটি নয়। সে তো খুব বেশিকিছু চায়নি—শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা চরিত্রবান ভালো মনের একজন পুরুষ চেয়েছে।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে, এখন আর যেন কিছুই থামানোর নেই। বাবা-মায়ের চাপে কখন যে মনে মনে সে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল নিজেও টের পায়নি। অথচ সে চাইলে কি আরেকটু শক্ত আরেকটু অটল হয়ে একটি ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত না?

জীবনটা নদীর মতো। জীবনের বড় বড় বাঁকে ভুল করো না হে পথিক। পথ হারিয়ে ফেলবে...

লাল ঘোমটা পরে রাজরানির মতো করে নিপার বিয়ে যেদিন হয়ে গেল, সেদিন থেকেই তার জীবনে বিসর্জনের শুরু। বাবা-মা পুরনো ঘরদোর ছেড়ে বিয়ের পরেই শ্বশুরবাড়ি, স্বামী-সংসার সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। জীবনটা একদম বদলে গেল। হুড়মুড় করে কীভাবে দিন গড়িয়ে যায় আজকাল নিপা বুঝতেই পারে না। তার স্বামী মানুষটি চমৎকার! নামাজে-কালামে অতটা মনোযোগী না হলেও খুব উদার আর রোমান্টিক। কয়েকদিন পরপর লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ে। বেশ ভালো লাগে নিপার। তবে আজকাল ওর সালাতটা মাঝে মাঝেই ছুটে যায়। এই তো সেদিন—কীভাবে যেন আসরের সালাতটা ছুটে গেল। ইভানের সাথে একটি কফিশপে ঢুকেছিল। কখন যে সালাতের সময়টা পার হয়ে গেল ও কিছুই টের পেল না। বাইরে বেরিয়ে দেখে সন্ধ্যা...

আবার একদিন, কাজিনের বিয়েতে যাওয়ার জন্য ইভান খুব জোরাজুরি করতে লাগল। নিপার এসব হলুদের অনুষ্ঠান-গানবাজনা, ছেলেমেয়েদের নাচানাচি একদম ভালো লাগে না; কিন্তু সে তো স্বামীকে কষ্ট দিতে চায় না। স্বামীর ইচ্ছেয় একটি ঘিয়ে রঙের শাড়ি পরে অনুষ্ঠানে গেল। মাগরিবের আযানটা যে কখন পড়ল তা এত ধুম-ধাম আওয়াজের মধ্যে শোনাই গেল না। হঠাৎ খেয়াল হলো সাড়ে সাতটা বাজে! হয়তো দৌড়ে গেলে সালাতটা তখনও ধরা যেত। কিন্তু কী জানি একটি আলস্যই হয়তো ঘিরে ধরেছিল তাকে। উঠে গিয়ে শাড়ি তুলে মেক-আপ মুছে ওযুর দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করে নিপা ভেবে নিল সে বাসায় গিয়েই একসাথে ইশা আর মাগরিবের কাযা সালাতটা আদায় করে নেবে...। অথচ আগে হলে এমনটি কল্পনাও

Scanned with CamScanner

করতে পারত না। কত বদলে গেছে সবকিছু—পুরনো পরিবার, পুরনো ঘরদোরের সাথে সাথে দ্বীন ইসলামকেও বোধ হয় বিসর্জন দিয়েছে নিপা...

.....

...তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।[১]

.....

.....

যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবন পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।[২]

.....

না না, নিপা দুঃখী মেয়ে না। সে সুখেই আছে। অনেক কিছু পেয়েছে এই জীবনে। আর কী চাওয়ার থাকতে পারে?

শুধু কুরআনের এই আয়াতগুলো ভাবলে নিপার জন্য ভয় হয়! বড্ড ভয় হয়। নিপা কি পথ ভুল করে ফেলল? ইভানের মতো কাউকে স্বামী হিসেবে পেয়ে দুনিয়ায় কয়েকটা দিন সুখী থাকাই কি সব? যে-মানুষ ইসলামের কাজে সাহায্য করে না, বুঝে বা না-বুঝে বাধা দেয়, ভালো কাজকে কঠিন আর গুনাহর কাজকেই সহজ করে তোলে তার সাথে থেকে কি আদৌ সুখ আছে? আখিরাতকে বিসর্জন দিয়ে এ জীবনের কোনো মূল্যই যে নেই...।

ঘরে ঘরে নিপাদের বুঝ হোক। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন। আমীন।

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৮।

[২] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩।

Scanned with CamScanner

স্পেশাল অফার

জাকারিয়া মাসুদ

[এক]

অভী আর সালিহ রুমমেট। অনেকদিন হলো তারা একই রুমে আছে। আধুনিক হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে অভী। সেই ক্লাস টেন থেকেই। রিলিজ হওয়া প্রতিটি ইংলিশ মুভিই সে দেখে। বাদ যায় না কোনোটিই। মুভি থেকে সে নিত্যনতুন স্টাইল আবিষ্কার করে আর সেগুলো অনুসরণ করে। সালিহ ছেলেটি ধার্মিক। আল্লাহভীরু। এ বয়সেই দাড়ি রাখার কারণে অভী প্রায়ই তাকে জংলি বলে ঠাট্টা করে। অবশ্যি সালিহ এতে কিছু মনে করে না। বিন্দুপরিমাণও কষ্ট পায় না।

অভীকে ভালো কাজের পরামর্শ দেয় সালিহ। সালাতে যত্নবান হতে বলে; কিন্তু সালিহর কথাগুলো অভী এক কান দিয়ে শোনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। কোনো কোনো সপ্তাহে জুমআর সালাত আদায় করতে গেলেও বাদবাকি দিনগুলোতে সালাতেরই খোঁজ থাকে না। সালিহ সালাতের তাগাদা দিলে ও বলে 'আরে বন্ধু, এত তাড়া কীসের? যাক না ক'দিন। লাইফটা একটু এনজয় করে নিই। যখন বুড়ো হব, নাতি-নাতনি হবে তখন না-হয় দেখা যাবে।'

[দুই]

পিসিতে ইংলিশ মুভি দেখছিল অভী। এ মাসে নতুন যে-মুভিটি রিলিজ হয়েছে সেটি। ছবির রোমান্টিক দৃশ্যগুলোর জন্যই মূলত অপেক্ষা। হঠাৎ মেগাবাইট শেষ।

Scanned with CamScanner

মন খারাপ হয়ে গেল অভীর। ফোনে যে-ব্যালেন্স আছে তা দিয়ে ১ জিবি কেনা সম্ভব হবে না; কিন্তু মেগাবাইট তো লাগবেই। যে করেই হোক রোমান্টিক দৃশ্যগুলো আজই দেখে ঘুমোতে হবে। নয়তো মন তৃপ্তি পাবে না। কী করা যায়, কী করা যায়?

মোবাইলের স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। ফোনটি হাতে নিতেই খুশিতে নেচে উঠল সে। সিম কোম্পানি মেসেজ পাঠিয়েছে—

Enjoy 1 GB only 6Tk (12-10Am) with 12 hours validity to START the offer dial *111*222#

অভী লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে। দ্রুত চালু করল অফারটি। এখন শুধু অপেক্ষা। মাত্র দু-ঘণ্টা পরই ১২টা বাজবে। অভী ভাবল, খুশির কারণটি সালিহকে বলবে। কিছু বলার আগেই সালিহ বলল, 'কিছু বলবি?'

মাথা নাড়ল অভী।

'বল।'

'জানিস—কী হয়েছে?'

'না বললে জানব কী করে?'

অভী বিছানা থেকে উঠে গিয়ে মেসেজটি সালিহকে দেখাল। সালিহ বলল, 'মেসেজটি কিছুক্ষণ আগে আমার ফোনেও এসেছে।'

'কই? তোর মধ্যে তো কোনোরকম ফিলিংস দেখলাম না।'

'আসলে আমি এর থেকেও মজার একটি অফার পেয়েছি তাই আর ওদিকে খেয়াল করিনি।'

'তাই নাকি! কী অফার রে বন্ধু? তুই কি এর থেকেও কম টাকায় ১ জিবি পেয়েছিস? নাকি ফ্রি মেগাবাইট এসেছে?'

হাদীস অ্যাপ থেকে সালিহ একটি হাদীস বের করে বলল, 'অভী! এই আমার অফার। কিছুক্ষণ আগেই অফারটির কথা জেনেছি।'

Scanned with CamScanner

অভী সালিহর ফোনটি হাতে নিয়ে বলল, 'কই? কই অফার? আমি তো কোনো মেসেজ দেখছি না।'

'ওই তো মেসেজ।'

'এটা তো হাদীস।'

'হ্যাঁ হাদীস; কিন্তু হাদীসের মধ্যেই একটি স্পেশাল অফারের মেসেজ আছে। তুই কি হাদীসটি একবার পড়বি?'

অভী হাদীসটি পড়ল—'মহামহিম আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। এরপর ঘোষণা করতে থাকেন—'কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দেব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।'[১]

অভী ফোনটি সালিহকে দিয়ে ওর বিছানায় চলে গেল। কখন ১২টা বাজে তার অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকে দ্রুত বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়ল সালিহ।

রাত তিনটার সময় এলার্ম বেজে উঠল সালিহর মুঠোফোনে। সালিহ উঠে দেখল অভী এখনও জেগে আছে। মুভি দেখছে। সালিহ ওযু করে এসে বলল, 'আয় না, দু-রাকাআত সালাত আদায় করি।'

অভী পিসি বন্ধ করে বলল, 'ঘুম আসছে খুব। তুই পড়।'

এটুকু বলেই কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়ল সে। সালিহ সালাতে দাঁড়াল। সূরা ফাতিহা শেষ করে সূরা নাযিআত তিলাওয়াত করছে সে—

---

[১] *সহীহ বুখারী*, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, অধ্যায় তাহাজ্জুদ : ১০৭৯।

Scanned with CamScanner

অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে সেদিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।[১]

[১] সূরা নাযিআত, আয়াত : ৩৪-৪১।

Scanned with CamScanner

এক চিলতে হাসি

সানজিদা সিদ্দীকা কথা

মোবারক বসে আছে বড় স্যারের রুমের সামনের বেঞ্চিতে। তার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। দেখে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ। এই অফিসের সবাই তাকে মোবারক পাগলা বলে। বলাটাও খুব একটি অমূলক না। সে প্রায়ই গায়েব হয়ে যায়। গায়েব মানে পুরো গায়েব। কিন্তু ফিরে এসে তিন দিনের কাজ এক দিনে করে ফেলে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কোণার ফোকলা দাঁত বের করে বোকার মতো হাসে।

ফোকলা দাঁতেরও এক ইতিহাস আছে। গেল কুরবানীর পরে তিন দিন দাঁতের ব্যথায় মোবারক প্রায় কুপোকাত। পাড়ার এক ডাক্তারের কাছে যাবার পরে ডাক্তার বলল, 'রুট-ক্যানাল করা লাগবে।'

কমপক্ষে তিন হাজার টাকা। মোবারক দুইশো টাকা দিয়ে ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে দাঁত ফেলে বাসায় চলে আসে। ফোকলা দাঁতে মোবারকের হাসিতে একটি শিশুসুলভ ব্যাপার চলে এসেছে।

তার ওপরে আজ বড় স্যার অত্যধিক রেগে আছেন। তাই সে ছোট বেঞ্চিতে বসে নিজের জানা প্রায় সব দুআ পড়ে ফেলেছে। এর মধ্যে একটি দুআ হলো—'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়াহিয়া'।

প্রথমদিকে সে মনে করতে পারছিল না—এটা কীসের দুআ। কয়েকশোবার পড়বার পরে ওর মনে হলো—দাদাজান ছোটবেলায় ঘুমের আগে এই দুআটি পড়ে

Scanned with CamScanner

শোনাতেন। এটা ঘুমের দুআ হতে পারে।

এই অফিসের বস সোবহান সাহেব ভ্রু কুঁচকে মোবারকের দিকে তাকিয়ে আছেন। রুমে অস্বস্তিকর নিঃস্তব্ধতা। তার অবশ্য এইবার রাগার যথেষ্ট কারণ আছে। মোবারককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্লাকার্ড হাতে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেটাতে লেখা থাকবে 'এন্ডারসন'। এই ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে সোবহান সাহেবের অফিসের উদ্দেশ্যেই এত লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এই দেশে এসেছেন। কথা-বার্তা ঠিকঠাক হয়ে ডিল ফাইনাল হয়ে গেলে একটি অসাধারণ ব্যাপার হবে আসলে। তো প্রায় দুই ঘণ্টা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থেকে কীভাবে যেন তিনি সোবহান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে ফেললেন। জানালেন, তাকে কেউ রিসিভ করতে আসেনি। সোবহান সাহেবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার জোগাড়। মোবারকের মতো আধপাগলা লোককে কী বুদ্ধিতে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন—এটা নিয়ে নিজেকে গালমন্দ করতে করতে নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। শেষপর্যন্ত সেই ডিল ফাইনাল হয়েছে।

'মোবারক!'

'জি, স্যার।'

'এইখানে তোমাকে কেন ডাকা হয়েছে জানো তো?'

'জি, স্যার।'

'এই ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা কী?'

মোবারক কোনো কথা না বলে হাসতে থাকে। সোবহান সাহেবের দৃষ্টি সিলিং এ নিবদ্ধ এখন। কোনো একটি বিচিত্র কারণে মোবারকের প্রতি তিনি একধরনের মমতা বোধ করেন। আজ কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এজন্য মোবারকের দিকে তাকানো ঠিক হবে না। রুলস ইজ রুলস। যথেষ্ট হয়েছে। মোবারক এই অফিসের পিয়ন। একে সোবহান সাহেবই এই চাকরি দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই রমনায় সন্ধ্যা বেলা হাঁটতে যেতেন। সোবহান সাহেব প্রায়ই দেখতেন—এক লোক সেখানে প্রতিদিন পকেট থেকে পাতলা একটি রুমাল বের করে সিজদার জায়গা বরাবর বিছিয়ে সালাত আদায় করত। এরপর সালাত শেষে পার্কের বেঞ্চিতে এক প্যাকেট বাদাম নিয়ে বসত। সেই বাদাম বেশিরভাগ সময়ই তার খাওয়া হতো না। ধুলোমাখা পিঙ্গাল চুলের বাচ্চাগুলো এসে হাত পাতা মাত্র সে হাতের প্যাকেটটি

Scanned with CamScanner

দিয়ে দিত। সোবহান সাহেব কৌতূহলবশতই একদিন ওর সাথে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারলেন—সমাজকল্যাণে অনার্সে থার্ড ক্লাস পেয়ে ঘরে বসে আছে। নাম মোবারক। একটি টিউশনি করে। এরপরেই এই অফিসে ধরে নিয়ে এসেছিলেন।

'মোবারক'

'জি স্যার।'

'মাসের এগারো দিনের বেতন নিয়ে অফিস থেকে বিদায় হও। তোমাকে আমাদের আর প্রয়োজন নাই।'

সোবহান সাহেব কথা শেষ করেই ফাইলে মন দিলেন। মোবারকের দিকে তাকালেই সর্বনাশ। মোবারক তিন মিনিট চুয়ান্ন সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে গলি ছেড়ে মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে মোবারক। আজ ওর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। রোদে চারপাশ খাঁ খাঁ করছে। দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা শেষপর্যন্ত মোবারককে নিতে রাজি হয়েছে। রিকশা টান দেবার ঠিক আগ মুহূর্তে 'ও ভাইজান! ও ভাইজান!' বলতে বলতে রঞ্জু এসে লাফ দিয়ে রিকশায় চড়ে বসল।

রঞ্জু এই অফিসের সবাইকে চা পরিবেশন করে। বয়স জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় সাত। আসলে হয়তো এগারো কিংবা বারো হবে।

'কী রঞ্জু, তুই কী চাস?'

'আফনে না থাকলে আমিও এইহানে থাকুম না।'

'রিকশা থেকে নেমে অফিসে যা বললাম।'

'আমারে একখান ধাক্কা মাইরা নিছে হালায় দেন। আমি যামু না।'

বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে রিকশা টানা শুরু করল।

'তোর মা'র অসুখ সেরেছে নাকি রে?'

'হ ভাইজান। হেয় এখন কামে যাইতে ফারে। বাফেও ফিরা আইসে। সৎ মায়ে বুলে কার লগে ভাইগগা গেসে গা। ব্যাডায় এখন সুড়সুড় কইরা ফিরত আইসে।'

Scanned with CamScanner

'তোর মা তো এখন খুব খুশি রে!'

'আর কইয়েন না ভাইজান। ভাদাইম্যা ব্যাডায় ফিরত আইছে আর আম্মায় মুখে আঁচল চাইপ্পা ধইরা একটু পরপর ফিচফিচ কইরা কান্দে আবার হাসে। নানান জিনিস রান্ধে। কুনো তাল নাই কাইজকামের।'

মোবারক হাসে। রঞ্জু খুশিতে ঝলমল করছে। কী অসাধারণ দৃশ্য। চোখে পানি এসে যাবার মতো অসাধারণ।

মোবারক যখন বাড়ি ফিরল তখন দুপুর তিনটা দশ। মোবারকের বাবা আইজুদ্দিন কাঁঠালবাগানের গলির ভেতর দুই রুমের এক চিলতে ঘরের আধ চিলতে বারান্দার চকির ওপরে বসে আছে দুপুরের ভাত খেয়ে। মোবারকের মা মারা গেছে ওর যখন দুই বছর বয়স তখন। টাইফয়েডে মারাই গেল। মাকে একটুও মনে নেই মোবারকের। মায়ের কোনো ছবিও কখনও দেখেনি। আইজুদ্দিন স্কুলের দপ্তরীর চাকরি করতেন। স্ত্রী মারা যাবার পরে কখনও আর বিয়ে করেননি। নিজেই ছেলেকে বড় করেছেন। নিজের স্কুলেই হেড মাস্টারকে বলে মোবারকের পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। রান্না-বান্নাও নিজেই করেন এখনও। একজন বুয়া সপ্তাহে দু'দিন এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়।

'কী রে মোবারক, তোর খবর কী?'

'জি আব্বা, খবর ভালো।'

'তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে না খবর ভালো। কি চাকরিটা গেছে নাকি?'

'হু।'

'যা, আলু ভাজা আর পুঁটিমাছ আছে। দেশি পুঁটি। খেয়ে নে।'

'হু।'

'যাক! বিয়ে শাদী করিস নাই। চিরকুমারের ব্রত নিয়েছিস এদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। নইলে এখন বউ নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে খেতি। ধর তুই কানা ফকির সাজলি। তোর বউ কাঁধে তোর হাত নিয়ে গাড়ির কাচে ঠক ঠক করে ভিক্ষা চাইত—'আম্মাজান, অন্ধমানুষরে দয়া কইরা কিছু দেন গো আম্মা।'

Scanned with CamScanner

মোবারক হেসে ফেলল। শিশুসুলভ হাসি। বাবা এত ভালো মানুষ কেন, মোবারক ভেবে পায় না। সে কি পারবে কোনোদিন বাবার মতো ভালো মানুষ হতে!

মোবারক নারী-বিদ্বেষী—এমন কিছু না; কিন্তু বিয়ে করতে পারে না। ভেতর থেকে মারাত্মক অপরাধবোধ কাজ করে। মোবারকের বয়স যখন আটাশ তখন কাপাসিয়া গ্রামের শিউলি নামের এক ছলবলে মেয়ের সাথে ওর বিয়ে ঠিক হয়। প্রস্তাব এনেছিল মোবারকের খালু। বাইশে আষাঢ় বিয়ের দিন পাকা হয়। মোবারকরা বরযাত্রী নিয়ে বেরও হয়; কিন্তু ওর বন্ধু জাকিরের বাবা মারা যাবার খবর আসে সেই মুহূর্তেই। ঝুম বৃষ্টি জাকিরকে এভাবে একা ফেলে ও কিছুতেই যেতে পারেনি। প্রত্যন্ত গ্রাম হওয়াতে মেয়ের বাড়িতে খবর দিতেও একদিন পার। এদিকে বরযাত্রী না যাওয়াতে মেয়ের বাড়ির অবস্থা যাচ্ছে-তাই।

এসব খবর মোবারক পরে শুনেছিল। শিউলিদের বাড়িতে যখন সন্ধ্যা হবে হবে দশা, মানুষেরা প্রায় সব চলে গেছে; তখন ওই গ্রামেরই বুড়ো আলম ব্যাপারী এগিয়ে এসেছিলেন কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করতে। আলম ব্যাপারীর কাঠের ব্যবসা। টাকা-পয়সার অভাব নেই। সেদিন সন্ধ্যা পেরোতেই শিউলির সাথে আলম ব্যাপারীর বিয়ে হয়ে যায়। শিউলি নাকি সেই রাতেই পুরো দুই বোতল কীটনাশক একসাথে খেয়েছিল। এরপর সব শেষ!

এই ঘটনার পর মোবারক প্রায় একমাস কারও সাথে কথা বলেনি। মুখের দিকে তাকানো যেত না। আইজুদ্দিন সাহেব তখনও রিটায়ার্ড করেননি। ছেলের জন্য পরে ছুটি নিয়ে বাসায় ছিলেন প্রায় পনের দিন। মোবারকের মাথার কাছে চুপচাপ বসে থাকতেন। আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে চোখের পানি গাল বেয়ে সাদাকালো দাড়িগুলো ভিজিয়ে দিত। মা-মরা ছেলেটার জন্য তিনি একটু বেশিই মমতা বোধ করেন। সেবার মোবারকের ওজন কমেছিল প্রায় এগারো কেজি!

এরপর থেকে গত সাত বছরে যতবারই মোবারকের বিয়ের প্রসঙ্গ এসেছে ও কিছুতেই আগাতে পারেনি। আগালেই শিউলির মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জীবনটা এমন কেন, কে জানে! মৃত্যুর ওপার থেকেও কিছু মানুষ মায়ার চিকন সুতা দিয়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে রাখে। মোবারক প্রায়ই আল্লাহকে বলে 'আল্লাহ গো, জীবন নিয়ে আমার কোনো দুঃখবোধ নাই। জান্নাতে নাকি মানুষ যা চায় তাই পায়। আপনি আমারে শিউলিকে দিয়েন।'

Scanned with CamScanner

মোবারক সন্ধ্যার সময় তার অফিসের এগারো দিনের বেতনের পুরো টাকাগুলো নিয়েই বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। গন্তব্য নিউমার্কেট। এই টাকা দিয়ে ও একটি রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি কিনবে।

বাচ্চা ছেলেটির নাম শাহজাহান। কাঁঠালবাগানের মোবারকদের বাসার পাশের নীল রঙের তেরপাল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট তাঁবুটি ওর সাম্রাজ্য। বয়স সাড়ে ছয়। সারাদিন কাগজ টোকায় অথবা ফুল বিক্রি করে। ফুটপাতের মানুষজনের সাথে বেশি ঘ্যানঘ্যান করলে দুই একটি চড়-থাপ্পড়ও খায়। এর বাবা পঙ্গু মানুষ। ভিক্ষা করে। গত চার দিন আগে এন্ডারসন সাহেব যখন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন মোবারকের জন্য, তখন মোবারক তেরপাল সাম্রাজ্যের শাহজাহানকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সি বিভাগে।

বাচ্চাটি সামনের আন্ডারকন্সট্রাকশনের একতলা ছাদ থেকে খোয়ার ওপরে পড়ে হাত ভেঙে ফেলে। এদিক-ওদিক ছিঁড়ে-কেটেও গিয়েছিল। ঠোঁট ফুলে এত বড় হয়ে আছে। বস্তির বাচ্চাদের যে-কোনো বিপদে আর কাউকে দেখা না গেলেও মোবারককে দেখা যায় সবার আগে। বাচ্চাটার হাতে প্লাস্টার করিয়ে ফিরিয়ে আনতে আনতে দুপুর পার হয়ে গেল সেদিন। আর এন্ডারসন হয়ে গেল ইতিহাস।

মোবারকের এইসব নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই। মোবারকের মাথাব্যথা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি নিয়ে। সম্রাট শাহজাহানের এই জিনিসের বড় শখ।

রাত আটটা। সোবহান সাহেব অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরি মোবারকের বাসায় এসেছেন। মোবারককে না পেয়ে ওর বাবার কাছে একটি চিরকুট রেখে এসেছেন। সেটাতে লেখা—'মোবারক, তুমি আধপাগলা হলে কী হবে, মানুষ কিন্তু খারাপ না। তোমার প্রতি আমি বেশ মমতা বোধ করি। এই মমতার উৎস কী—তা আমার জানা নেই। তবে বোধটা ভালো রকমই সত্য। কাল থেকে দশটার বদলে নয়টা থেকে অফিস করবে। এটা-ই তোমার শাস্তি।'

সোবহান সাহেবের গাড়ি মেইন রোডে রাখা। গলিতে ঢোকে না। তাই হেঁটে মেইন রোড পর্যন্ত উঠতে হবে। কিছুদূর যেতেই পথের বাম পাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন।

ফুটপাতের ওপরে তেরপালের একটি নীল রঙের তাঁবু। তার পাশে মোবারক বসা। মোবারকের কোলে একটি বাচ্চা। বাচ্চাটির ঠোঁট বাজেভাবে ফুলে আছে আর হাতে প্লাস্টার।

Scanned with CamScanner

পাশে মাটির চুলায় এক মহিলা ইয়া লম্বা এক ঘোমটা টেনে দাঁত দিয়ে আঁচল কামড়ে মাটির চুলায় ভাত রাঁধছে। আগুনের ধোঁয়া গিয়ে অন্ধকারে মেলাচ্ছে। পাশেই দুই পা নেই এমন একজন লোক বসা; সম্ভবত মহিলার স্বামী। দুইজনই হাসিমুখে মোবারক আর ছোট বাচ্চাটার কার্যকলাপ দেখছে।

মোবারক বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে গভীর বিস্ময়ে একটি রিমোট কন্ট্রোল খেলনা গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি একবার সামনে যায় একবার পেছনে। আবার ডানে যায় এরপর বামে যায়। বাচ্চা আর মোবারকের মুখভর্তি হাসি। সোবহান সাহেব মনের অজান্তেই আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসছেন। আইজুদ্দিন সাহেব ছেলের উদ্দেশ্যে তার বসের লেখা চিঠি পড়ে চোখভর্তি পানি নিয়ে হাসছেন।

এই হাসিগুলো অপার্থিব। ভালো থাকুক এক চিলতে অপার্থিব হাসি।

Scanned with CamScanner

উমরাহ

সাদিয়া হোসাইন

এটাই যদি আপনার প্রথম হজ বা উমরাহ হয়ে থাকে এবং এজন্য আপনি যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন কিংবা অনেক বই ও আর্টিকেল পড়ে থাকেন তাহলে আপনার মনে হতে পারে—আপনি মক্কায় গিয়ে খুব সহজেই প্ল্যান-মাফিক হজ ও উমরাহ সম্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু শেষমেশ দেখা যাবে, আপনার জন্য সবকিছুই একেবারেই কাস্টম মেইড।

গতকাল একটি খবর পড়ে খুব হাসছিলাম। একজন বাবা দুআ করেছিলেন, তার সন্তানের জন্ম যেন পবিত্র মক্কা নগরীতে হয়। ডিউ ডেট বেশ দূরে ছিল বিধায় তিনি ভেবেছিলেন, হজের পরে মক্কায় অবস্থানকালেই সন্তানের জন্ম হবে।

ওমা! ঠিক হজের দিনই তার দুই সন্তানের আগাম জন্ম হয়। তিনি দুআ কবুলের এই অভাবিত দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান। দুআ কবুলের কাস্টম মেইড ফলাফল এমন হবে—তিনি সেটা ভাবতেই পারেননি!

আমি 'উমরাহ' নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। শ্বশুর-শাশুড়ি বয়স্ক মানুষ। ডায়াবেটিস ছাড়াও প্রেশার ও হার্টের অসুখ আছে। উপরন্তু আমাদের দুই মেয়ে। কাজেই তাওয়াফ ভয়ংকর কঠিন হতে পারে! আমার স্বামী একা মানুষ—পাঁচজনের দায়িত্ব নেবে কীভাবে?

Scanned with CamScanner

সবাই বলে, উমরাহ'র জন্য একটি সুন্দর প্ল্যানিং খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গ্রুপে গেলে ভালো। সেখানে অভিজ্ঞ মুআল্লিমরা প্ল্যানিং-এ সাহায্য করতে পারেন। আমরা দুজন মিলে 'প্ল্যান' করলাম, দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে পৌঁছাব।

সেখানে যাওয়ার পর আমার বর, প্রথমে আব্বু-আম্মুকে নিয়ে উমরাহ করে আসবে। আমি জুমআ পড়ে মেয়েদের নিয়ে হোটেলে একটু ঘুমিয়ে নেব। মধ্যরাতে ওদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গে উমরাহ করব। তখন আমার ও মেয়েদের হবে প্রথম উমরাহ। আর মেয়েদের বাবার হবে দ্বিতীয় উমরাহ।

হারামের বাইরেই অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। সেগুলোতে করে সহজেই 'মসজিদে আয়িশা' নামের মিক্বাতে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসা যায়। কাজেই মেয়েদের বাবার জন্য দ্বিতীয় উমরাহ করা খুব কঠিন হবে না। এই ছিল প্ল্যানিং।

এদিকে আব্বু-আম্মু আমাদের আগেই মক্কায় পৌঁছে গিয়েছেন। আর মক্কায় গেলে অস্থিরতা এতটাই বেড়ে যায় যে, উমরাহ না-করা পর্যন্ত কিচ্ছু ভালো লাগে না, ঘুমও আসে না। আব্বু-আম্মুও তাই উমরাহ না করে থাকতে পারলেন না।

কিন্তু একা একা উমরাহ করে আমার পঁচাত্তর বছর বয়সী সুস্থ-সবল শ্বশুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা যখন পৌঁছালাম তখন তিনি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, শ্বশুর-শাশুড়ি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন। রাতে আমরা দুজন মেয়েদের নিয়ে উমরাহ করব, ইন শা আল্লাহ। পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে তাওয়াফ করার সুযোগ তো থাকছেই।

রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে মেয়েদের রেডি করতে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের আগেই শ্বশুর-শাশুড়ি রেডি হয়ে আছেন। বুঝতে দেরি হলো না যে, তারাও আমাদের সাথে তাওয়াফ করতে চাইছেন।

বস্তুত স্রষ্টার প্রতি কিছু মানুষের ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী ও প্রগাঢ় হয় যে, তারা বয়সের আধিক্য ও শারীরিক অক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যান। আশেপাশের সব-মানুষকে মিলিয়ে সার্বিক পরিস্থিতিটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর ভরসা করে আমরা সবাই একসাথে রওয়ানা দিলাম।

Scanned with CamScanner

বাবা-মা আর দুই-দুইটি ছোট মেয়ে—সব মিলিয়ে কীভাবে কী হবে, দিশা না পেয়ে আমার স্বামী একটি হুইল চেয়ার নিয়ে নিল; কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ি—কাউকেই ওখানে বসাতে রাজি করানো গেল না। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন; হঠাৎ হুইল চেয়ার মানতেই পারছিলেন না।

তবে আমাদের উপর্যুপরি অনুরোধ ও চাপের কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই শ্বশুরকে তাওয়াফের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়। তাকে রেখে আমরা বাকি পাঁচজন তাওয়াফের স্রোতে নেমে পড়ি।

প্রথমে প্ল্যান ছিল, আমি দেড় বছরের শাকিরাকে আমার বুকের সাথে স্লিঙে বেঁধে নেব আর ওদের বাবা নায়ীমার হাত ধরে থাকবে। প্ল্যান মাফিক শাকিরাকে স্লিঙে ঠিকই বেঁধেছি; কিন্তু নায়ীমা কোনোভাবেই আমার হাত ছাড়বে না। ওদিকে আমার হাতে নায়ীমার হাত, ওর হাতে ওদের দাদুর হাত, আবার ওদের দাদুর হাতে ওদের বাবার হাত—চারজনের লম্বা চেইন হয়ে গেল। তাওয়াফ করতে গিয়ে এত লম্বা চেইন সামলানোও বেশ কঠিন।

ওদিকে আমার বুকের কাছে শাকিরাকেও দেখতে হচ্ছে। তাওয়াফ শুরু করে দেখলাম, চেইনের চিন্তায় তাওয়াফে মন দিতে পারছি না। আবার নায়ীমা কাবা দেখার উত্তেজনায় দৌড়ে যাচ্ছে। হাঁটু-ব্যথা নিয়ে আম্মু আর পেরে উঠছেন না।

আমি 'বিসমিল্লাহ' বলে শুধু মেয়েদের বাবাকে বললাম, 'আম্মুকে দেখো; আমরা আছি।'

তারপরে আমার বুকে বাঁধা দেড় বছরের শাকিরা আর হাতে ধরা সাড়ে চার বছরের নায়ীমাকে নিয়ে একাই তাওয়াফ শুরু করলাম। অবশেষে আমরা—আল্লাহর তিন বান্দি—আল্লাহর ঘরে হাজির হলাম।

এই তাওয়াফ নিয়ে কত ভয় পেয়েছি, নিজেও গতবার তাওয়াফে কত চাপে পড়েছি, গরমে অস্থির হয়েছি, চুরির ভয় পেয়েছি; কিন্তু সে-রাতে আমি আর আমার মেয়েদের মনে হচ্ছিল, ফেরেশতারা আমাদের রাস্তা খালি করে দিচ্ছিল। আর আমরা তরতর করে দৌড়াচ্ছিলাম!

রাতের সে-সময়টাতে মক্কার আবহাওয়া অদ্ভুত ঠান্ডা থাকে। মেয়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমিও দৌড়াচ্ছিলাম। কিন্তু একটুও গরম লাগছিল না। নায়ীমার সাথে কথা

Scanned with CamScanner

ছিল ও প্রতিবার কাবা ঘুরে আসার পরে ওকে একটি ছোট্ট ললি দেব।

আমি ঘুর্ণন মনে রাখার জন্য সঙ্গে করে সাতটি ললি নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিটি ঘুর্ণন শেষ হওয়ার পরে মেয়েকে একটি করে দিচ্ছিলাম। এভাবে ললির পাল্লায় পড়ে আমার ছোট্ট মেয়েটিও তাওয়াফের নিয়ম শিখে গেল। প্রতিটি ঘুর্ণন শেষে মেয়েটিও আমার সঙ্গে 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও' পড়ছিল। আমি ওকে আগেই দুআটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। ও গ্রীন লাইটের কাছে গিয়েই হাত পেতে দুআ করছিল। তারপর আবার 'আল্লাহু আকবর' বলে দৌড় শুরু করছিল!

আশেপাশের মানুষদের থেকে আমার ফুলের মতো মেয়েগুলো অনেক ভালোবাসা পাচ্ছিল। কত মানুষ যে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে গেল ভালোবেসে! আদরগুলো ওরা বুঝতে পারছিল। আগে ওরা কখনও এত অল্প সময়ে এত মানুষের ভিড়ে এভাবে আদর পায়নি।

প্রথম দুবার ঘুরে আসার পরে আমার মনে হলো, আমি সত্যিই তাওয়াফ করছি! একা একা! আমার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে! আল্লাহু আকবর! গত একটি মাসজুড়ে আমি মহান আল্লাহর কাছে এ দুআটিই করেছিলাম। এভাবেই আল্লাহ চমকে দিয়ে মানুষের দুআ কবুল করেন।

এই তো, গত ছয় বছর আগে যখন তাওয়াফ করেছিলাম তখন আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছিলাম! আর এখন আমি একটি না, দুই-দুইটি সন্তান নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হয়েছি।

কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে কীভাবে পানি পড়ে—তা বাকি তাওয়াফগুলোতে বুঝলাম। আমি আমার দুআর-লিস্টের সব দুআ ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু আল্লাহর কাছে বলছিলাম, 'হে আল্লাহ, তুমি এই সামান্য মানুষটার ইচ্ছেও এতটা গুরুত্বের সাথে পূরণ করো! হে আল্লাহ, তুমি আমাকে কবুল করো। এতটুকু হলেই চলবে। আর কিচ্ছু লাগবে না।'

যাওয়ার আগে অনেক ইচ্ছে ছিল স্বামীর সাথে তাওয়াফ করব। আমার সে-ইচ্ছে তখনও পূরণ হয়নি; কিন্তু আল্লাহ আমাকে এমন একটি তাওয়াফ দিলেন, যেটি আমার জীবনে সেই মুহূর্তে খুবই দরকার ছিল।

কীভাবে? একটু বুঝিয়ে বলি, আমার স্বামী পেশায় একজন ডাক্তার। পৃথিবীর সব দেশেই ডাক্তাররা বোধহয় অন্যতম ব্যস্ত মানুষ। আর জুনিয়র ডাক্তাররা তো মহাব্যস্ত। বাসায় ফিরলেও তাদের কাজ শেষ হয় না। বাসায়ও তাদেরকে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয়।

Scanned with CamScanner

উপরন্তু আমার কিছু ব্যস্ততা রয়েছে। পড়াশোনা, ক্যারিয়ার ও সংসার নিয়েও ভাবতে হয়। মেয়ে দুটোর শারীরিক, আত্মিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলোও মেটাতে হয়। সব মিলিয়ে আমরা দুজন শহুরে জীবনের কঠিন এক সংগ্রামে নেমে পড়েছিলাম। দু'দণ্ড জিরিয়ে নেবার কিংবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছিলাম না।

উপরন্তু বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন—সবাইকে ছেড়ে এই দূরপরবাসে বারবারই খেই হারিয়ে ফেলছিলাম। তাছাড়া আমার ছোট মেয়েটার ওজনের সমস্যা এবং রাতে অনিদ্রা ও ভয়জনিত কারণে অসংখ্যবার ঘুম থেকে উঠে যাওয়ার সমস্যা তো ছিলই। নিজের ও সন্তানদের এই সব চাপ ও সমস্যার কারণে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমানো আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। দিনের পর দিন আমি তিন-চার ঘণ্টা ঘুমের মধ্য দিয়েই যাচ্ছিলাম। এসব কারণে মাঝে মাঝে নিজেকে খুব একা মনে হতো!

কিন্তু সেদিন দুই মেয়েকে নিয়ে তাওয়াফ শেষ করার পর হঠাৎ নিজেকে হাজেরা আলাইহাস সালামের উত্তরসূরি মনে হলো। তিনিও তো নির্জন প্রান্তরে দুধের বাচ্চা নিয়ে একা ছিলেন। তার কাছে তো তখন জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্য-পানীয়ও ছিল না। কীভাবে পারলেন তিনি? নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে ছিলেন।

এবারের উমরাহ থেকে যে-অনুভূতিগুলো অন্তরে যত্ন করে নিয়ে এসেছি সেগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সহজ করে দিলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। আর তিনি সাথে থাকলে নির্জন মরুভূমিতে একাকী থাকার মতো দুরূহ কাজটাও আনন্দদায়ক হয়ে যায়। যেমনটা হাজেরা আলাইহাস সালামের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আলহামদু লিল্লাহ।

হজ ও উমরাহ মূলত কাস্টম মেইড। সার্বিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে আপনি এমন পরিস্থিতি ও পরীক্ষায় পড়বেন, যা আপনার জন্য ওই মুহূর্তে খুবই দরকার ছিল। সবক্ষেত্রে হয়তো আপনি এর তাৎক্ষণিক সুফলটি বুঝতে পারবেন না। তবে একসময় অবশ্যই বুঝবেন।

বস্তুত স্রষ্টার প্রতি কিছু মানুষের ভালোবাসা এতটাই শক্তিশালী ও প্রগাঢ় হয় যে, তারা বয়সের আধিক্য ও শারীরিক অক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যান। আশেপাশের সব মানুষকে মিলিয়ে সার্বিক পরিস্থিতিটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না।

Scanned with CamScanner

যা হারিয়ে পেয়েছি

আরিফ আবদাল চৌধুরী

আজ আপনাদের ছোট্ট একটি গল্প শোনাব। আমার নিজের কোনো গল্প নয়; আমার সাথে দেখা হয়েছিল—এমন একজন মানুষের গল্প।

একবার আমি যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুসলিম কমিউনিটিতে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলাম। খুতবার পরে এক ভাই আমার দিকে এগিয়ে এলো। কিছু মানুষের চোখে একধরনের চাহনি থাকে—যা দেখলেই মনে হয়, তার বলার মতো একটি গল্প আছে। তার চোখের চাহনিটা ছিল ঠিক সে-রকম।

সে আমাকে বলল, 'ভাই, আপনি এইমাত্র যা-কিছু বললেন, তা আমার হৃদয়ের একদম ভেতরে গিয়ে আঘাত করেছে।'

খুতবায় আমি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু তালিবের মৃত্যুর ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। লোকটিকে বসতে বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'প্লিজ, আমাকে বলুন, কীভাবে এটা আপনাকে নাড়া দিল? আপনার গল্পটি আমাকে বলুন।'

তিনি বললেন, 'ভাই গত এক বছরে আজকেই প্রথমবারের মতো আমি সালাত আদায় করেছি। আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক মুসলিম পরিবারে। জীবনের বেশির ভাগ সময় আমি খুব ধার্মিক ছিলাম। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতাম; কিন্তু গত এক বছরে আজই হচ্ছে প্রথম দিন, যে-দিন আমি সালাত আদায় করেছি।'

Scanned with CamScanner

এতদিন সালাত আদায় না করার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে আমার জীবন ছবির মতো সুন্দর ছিল। অন্যান্য মানুষের জীবনে যেমন দীর্ঘমেয়াদী কিছু স্বপ্ন ও পরিকল্পনা থাকে, আমার জীবনেও ঠিক তেমনই ছিল। সেই সময়ে জীবনের সবকিছু একদম পরিকল্পনা-মাফিক এগোচ্ছিল। সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছিল। তখন মনে হতো প্ল্যান সফল হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমার বয়স ছিল ত্রিশের কাছাকাছি। মেডিকেলের রেসিডেন্সি শেষ করছিলাম। পাশাপাশি দুই জায়গায় জবও করছিলাম। বিয়েও করেছিলাম আমার স্বপ্নের নারীকে। আমাদের ফুটফুটে দুটি শিশু সন্তান ছিল। সুসজ্জিত ও মুখরিত বাগানের ন্যায় ছোট্ট একটি গৃহকোণ ছিল।

তাদেরকে বাসায় রেখে আমাকে দিনে ষোলো ঘণ্টা কাজ করতে হতো। থাকতাম একটি ছোট ঘিঞ্জি এপার্টমেন্টে। এপার্টমেন্টটির অবস্থান ছিল নিতান্ত সাধারণ এলাকায়। আমাদের যে-গাড়িটি ছিল, সেটিও দুদিন পরপরই নষ্ট হয়ে যেত। কোনোরকমে দিন পার করছিলাম আমরা—বছরের পর বছর একইভাবে।

আমার মেডিকেল রেসিডেন্সির মেয়াদ যখন শেষের দিকে তখন আশেপাশের বিভিন্ন ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডাক্তারদের গ্রুপ থেকে চাকরির প্রস্তাব আসতে থাকে। খুব লোভনীয় প্রস্তাব। ছয় অঙ্কের বেতন। জানেনই তো, ছয় অঙ্কের বেতন আমেরিকাতে কত বিশাল ব্যাপার।

সবকিছু ঠিকমতো চলছিল। আমার ডেস্কে একটি না, কয়েকটি অফার লেটার পড়ে থাকত। ঠিক করলাম, ভালো পরিবেশে থাকার জন্য অভিজাত এলাকায় সুন্দর একটি বাড়ি কিনব। এতে আমাদের বাচ্চারা ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে। গাড়ির ডিলারশিপেও গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে আমরা মিনিভ্যান আর ভালো মানের গাড়ি দেখেছিলাম। সবকিছু ঠিকমতো চলছিল, আমাদের সব স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছিল।

একদিন আমি প্রতিদিনকার সময়ের কিছুটা আগে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ঢুকে সালাম দিলাম; কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিল না। ঘড়িতে সময় দেখলাম। এই সময়ে সাধারণত আমার স্ত্রী বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখত। সে নিজেও তাদের সাথে একটু ঘুমিয়ে নিত।

Scanned with CamScanner

তো আমি ভাবলাম, ওরা ঘুমাক জাগানোর দরকার নেই। আমি কিছু-একটা খেয়ে বইপত্র নিয়ে বসলাম। পড়াশোনা করলাম, কিছু ই-মেইলের জবাবও দিলাম। কিছুক্ষণ পর বাচ্চাদের আওয়াজ পেলাম। ওরা ঘুম থেকে উঠে গেছে। ছোটটি কাঁদছিল আর বড়টি কথা বলছিল। জানেনই তো বাচ্চারা ঘুম থেকে জেগে উঠলে ওদের কিছুটা বিরক্তি থাকে। যা-ই হোক বাচ্চারা উঠে গেছে। তাই আমার খুব আনন্দ লাগছিল। সচরাচর বাবাদের যেমন লাগে আরকি!

রুমে ঢুকে দেখলাম বাচ্চারা বিছানায় আমার স্ত্রীর পাশে বসে আছে। স্ত্রী তাদের মাঝে চুপচাপ শুয়ে আছে। একটুও নড়াচড়া করছে না। ব্যাপারটা কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছিল। যেহেতু আমি পেশায় ডাক্তার তাই তক্ষুনি তাকে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, সে মারা গেছে। এইমাত্র না; আরও প্রায় এক ঘণ্টা আগে। তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে আর এই পৃথিবীতে নেই।

ভাই, সেই মুহূর্তে সাজানো-গোছানো জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমি হারালাম আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জনকে। আমার সন্তানেরা হারাল তাদের পরম প্রিয় মাকে। সেইসাথে আমি আমার ঈমানও হারিয়ে ফেললাম।

পরবর্তী চব্বিশটা ঘণ্টা আমার একরকম ঘোরের মধ্যে কাটল। জানাযা-দাফন—সবকিছু হয়ে গেল। অথচ আমি বুঝতেও পারছিলাম না যে, কী হচ্ছে। সেই দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা শেষে আমি আমার রুমে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম। এরপরের একাধারে কয়েক দিন রুম থেকে আর বের হইনি।

লাইট বন্ধ করে রুমেই শুয়ে থাকতাম। দৃষ্টি থাকত ছাদের দিকে। বাচ্চাদের প্রতিও আমার বিশেষ খেয়াল ছিল না। এই কয় দিনে তাদেরকে হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখিনি। তখন আমার মা এবং ভাই-ই বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আমার কী করা উচিত।

কিছুদিন পর আমি নিজেকে বিছানা থেকে টেনে নামালাম। বাচ্চাদের সাথে আবার কথা বলতে শুরু করলাম। চেষ্টা করলাম, কাজে ফিরে যেতে। বুঝে উঠতে চেষ্টা করলাম যে, কীভাবে আমি কাজ করার পাশাপাশি বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করব। আমার মা এবং ভাই আমাকে এত সাহায্য করেছিলেন যে, তা বলার বাইরে!

Scanned with CamScanner

আস্তে আস্তে, একটু একটু করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস ধরে আমি আমার জীবনের ভাঙা টুকরোগুলোকে আবার জোড়া লাগালাম। আবার কাজে যেতে শুরু করলাম। বাচ্চাদের রুটিনও রপ্ত করে নিলাম। সবকিছু বুঝে নিতে লাগলাম। খালি একটি জিনিস আর আগের মতো ছিল না। একটি জিনিস—যা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, একটি জিনিস যা—আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আমার ঈমান চলে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস ভেঙে পড়েছিল। আমার সালাত আদায় করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার আর কোনো বিশ্বাস-ই ছিল না।

আমার ভাই আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। সে তাদের মতো ছিল না, যারা দূরে দাঁড়িয়ে বড় বড় নির্দেশনা দিয়েই চলে যায়। কিছু লোক আছে না, যারা খালি উপদেশ দেয় কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না? যারা কোনোদিন মানুষকে সাহায্য করে না, কারও প্রয়োজনে এগিয়ে আসে না। শুধু দূর থেকে খবরদারি করে। আমার ভাই সে-রকম ছিল না।

সে আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। যখন আমার হাসপাতালে ডাক পড়ত, তখন সে আমার বাচ্চাদের সাথে জেগে থাকত। সে আমার পাশাপাশি আমার বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করছিল। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। সে খুব ধার্মিক লোক। নিয়মিত সালাত আদায় করে। সে আমাকে বারবার বলত, প্রতিদিন বলত, 'ভাইয়া এসো, তোমার সালাত আদায় করা উচিত। ভাইয়া এসো, তোমার সালাত আদায় করা উচিত।'

কিন্তু আমি কেবলই গোঁয়ার্তুমি করে চলছিলাম।

আজ সকালে সে হঠাৎ আমার বাসায় এসে হাজির। বলল, 'আমি কোনো 'না' শুনব না। তোমার বাচ্চাদেরকে মা দেখে রাখবেন। তোমাকে আমার সাথে মসজিদে যেতে হবে। জুমআর সালাত আদায় করতে হবে। তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে তোমার মাথা নত করবে। তুমি সিজদা করবে। আল্লাহু আকবার বলবে। দেখবে, তোমার হৃদয়ে যে-ক্ষতস্থান আছে, তা পূরণ হয়ে যাবে।

সুতরাং, আমি জুমআর সালাতে আসলাম। আমি খুতবা শুনলাম এবং আপনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বলেছিলেন যে, কীভাবে তিনি তার সন্তানদের মাকে হারিয়েছিলেন। কীভাবে তিনি তার জীবনসঙ্গিনীকে

Scanned with CamScanner

হারিয়েছিলেন। সাথে সাথেই আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গেলাম। এখন আবার সবকিছু আমার কাছে অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে।'

এই ছিল জীবনসঙ্গিনী হারানো এক লোকের গল্প।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ভেবে দেখুন। এত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেও কীভাবে একজনের মধ্যে টিকে থাকার মতো শক্তি অবশিষ্ট থাকে? কীভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরের দিনের সকালটাতে ঘুম থেকে উঠতেন। বাইরে যেতেন এবং আগের দিনের চেয়েও জোরালোভাবে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করতেন।

কীভাবে তিনি তার প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকতেন। এটা জেনেও যে, দিনশেষে তিনি এক শূন্য ঘরে ফেরত আসবেন। এটা জেনেও যে, ঘরে ফিরেই তিনি তার বিছানা খালি দেখবেন। এটা জেনেও যে, তিনি বাড়ি ফিরে তার সন্তানদের অশ্রু মুছে দেবেন। কারণ, তাদের মা আর ফেরত আসছে না? কীভাবে তিনি টিকে ছিলেন? কোন জিনিস তাকে পথ চলার শক্তি জোগাচ্ছিল? সেই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তরফ থেকে সমাধান আসল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সবথেকে অলৌকিক এক ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এর আগে কোনো মানুষের হয়নি। এর নাম হচ্ছে আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ-এর সফর। রাত্রিকালীন যাত্রায় জেরুজালেম গমন, তারপর ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ। রাতের যাত্রায় আল-আকসায় যাওয়া এবং তারপর ঊর্ধ্বাকাশে ওঠা। সেখানে তিনি আল্লাহর এত বেশি নিকটবর্তী হলেন, যতটা আর কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি জিবরাইল আলাইহিস সালামও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আপনি এখান থেকে সামনে যাবেন।'

সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছিলেন একটি উপহার। সেই উপহারটি ছিল দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যে, কঠিন সময় আসবে, দুঃখ-দুর্দশা আপনার দরজায় কড়া নাড়বে, ভীষণ সব বিপদ আপনার ওপর আপতিত হবে; কিন্তু যতবারই আপনি মাটিতে পড়ে যাবেন, ততবারই আবার উঠে দাঁড়াবেন। আর বলবেন, 'আল্লাহু আকবার'। যতবার

Scanned with CamScanner

আপনাকে কোনো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে বলবেন, 'আল্লাহু আকবার।'

সালাত আপনার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা প্রশমিত করবে। এটা আপনার সমস্যা দূর করবে এবং সহজ করে দেবে আপনার কঠিন সময়কে।[১]

[১] গল্পটি শাইখ আব্দুন নাসির জাংদা হাফিযাহুল্লাহ-র একটি লেকচার থেকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

পবিত্র প্রত্যাখ্যান

শেখ আসিফ

উত্তেজনায় ঘামছে ইফতি। একটি ভয় এবং লোভ কাজ করছে। মাথায় একটি কথাই ঘুরছে 'সত্যিই কি আমরা এমন করব?'

একটু আগেই লাবণি ম্যাসেজ দিয়েছে ম্যাসেঞ্জারে। ম্যাসেজ পড়ে কেমন একটি শিহরন বয়ে গেছে শরীরে। 'আগামীকাল বাসায় কেউ থাকবে না, তুমি না আসতে চেয়েছিলা? এসো।'

কেমন যেন একটি নেশা খেলে গিয়েছিল ইফতির মাথায়। ভালোবাসা ওকে পাগল করে তুলেছে। আজকে লাবণির সাথে ফোনালাপ হলো অনেকক্ষণ। দুজনই কেমন যেন আকুলতায় ঘিরে আছে। কালকের দিনটি নিয়ে শত প্রতীক্ষা। আবার কিছুটা ভয়। রাতে শুয়ে শুয়ে অনেক্ষণ এসব ভাবল ইফতি। ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুম।

ফজরের আগে এসে রাসেল ভাই ডাক দিয়ে একপ্রকার জোর করেই উঠালো। মেসে থাকতে এই একটি কারণেই বিরক্ত লাগে ইফতির। যত্রতত্র মানুষ এসে অনধিকার চর্চা করে। অগত্যা বাধ্য হয়ে সালাত আদায় করতে হলো। সালাতের পরে রাসেল ভাই জোর করে হাঁটতে নিয়ে গেলেন। বাহ! সকালটা তো ভারি সুন্দর। এমন মোহনিয়া ভোর কতদিন দেখা হয় না ইফতির। সেই কবের কথা যখন বাবার সাথে গ্রামের রাস্তায় হাঁটত ফজরের পরে। রাসেল ভাই বললেন, 'ইফতি, তোমাকে ইউটিউবে একটি লিংক পাঠিয়েছি। কুরআন তিলাওয়াত। শুনে দেখো তো।

Scanned with CamScanner

লাবণিদের বাসায় যাবার কথা বিকেলে। হন্টন-পর্ব শেষে দ্বিতীয় পর্ব ঘুম দিয়ে বেলা ১২টা বাজাল ইফতি। হাই তুলতে তুলতে বাথরুমে গেল। অতঃপর নিয়মমতো টেবিলে ল্যাপটপ নিয়ে বসল। রাসেল ভাই একটি লিংক পাঠিয়েছে। লিংকে গিয়ে দেখল একটি কুরআন তিলাওয়াত। কালা মতো একজন আফ্রিকান লোক। তিলাওয়াত করছে। নাম হাদি তোরে। কানে হেডফোন লাগিয়ে একবার শুনল ইফতি। তারপর আবার শুনল। কী যেন এক মোহ লুকিয়ে আছে এই তিলাওয়াতের মধ্যে। কতদিন কুরআন শোনা হয় না। রাসেল ভাই তো ভারি সুন্দর জিনিস দিয়েছেন। আবার শুনল ইফতি। বার পাঁচেক শোনার পর থিতু হলো।

মাথায় একটি আয়াত ঘুরছে 'কলাত হাইতা লাক'। কিন্তু এর অর্থ কী। রাসেল ভাইকে জিজ্ঞেস করায় তিনি খুব সুন্দর করে এই আয়াতের পটভূমি শোনালেন। এটি সূরা ইউসুফের আয়াত। কীভাবে নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম এক নারীর ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন। আল্লাহ কীভাবে তার প্রিয় বান্দাকে অশ্লীলতা থেকে হিফাযত করলেন। চমৎকার এক কাহিনি। রাসেল ভাই আরও বললেন, 'এজন্যই এই সূরাকে কুরআনে আহসানুল কাসাস বলা হয়েছে। আল্লাহ এর মাধ্যমে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কত মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন তার কাহিনিও শুনল ইফতি।

বিকালে লাবণির বাসায় যাবার কথা। এখন ৪টা বাজে। খচখচ করছে বুকের ভেতর ইফতি। কেন ওর বাসায় যাওয়া লাগবে? এতদিন তো বাইরেই ঘুরতাম। একটু আগে রাসেল ভাইয়ের শোনানোর কাহিনিটি বারবার মনে পড়ছে। প্রাসাদের এক কোণে এক নারী সকলের আড়ালে নবী ইউসুফকে বললেন, 'হাইতা লাক'—কাছে এসো। তিনি কোনোকিছু না ভেবে উলটো দৌড় দিয়েছিলেন। আর আমি কিনা উলটো একটি মেয়ের কাছে দৌড়ে যেতে যাচ্ছি! লাবণির বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ইফতি ভালো করেই জানত। এটি নিতান্ত মনের কোনো প্রেম নয়। দৈহিক একটি চাহিদা। নিতান্তই একটি অবৈধ ও গর্হিত কাজ। এটুকু জ্ঞান তো সকলের বিবেকেই আছে। ৪টা থেকে ৫টা। পুরো একটি ঘণ্টা ইফতি ইউটিউবে সূরা ইউসুফ এর ওই অংশটুকুর তিলাওয়াত শুনল। মনটাকে শক্ত করে বাঁধল। ঠিক ৫টায় লাবণির ম্যাসেজ—কোথায় তুমি? ম্যাসেজটি পড়ে ইফতির মনে হচ্ছিল মেয়েটি যেন বলছে 'হাইতা লাক (কাছে এসো)। ইফতি একবার চেয়েছিল রিপ্লাই দেবে; কিন্তু ভাবল এ রিপ্লাই থেকে শয়তান বহুদূর নিয়ে যেতে পারে। লাবণিকে ব্লক করে দেবার আগে মনে মনে পড়ল 'মাআযাল্লাহ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই)।'

Scanned with CamScanner

জীবনের ব্যাকরণ

আফীফা আবেদীন সাওদা

[এক]

হলের পাতলা ডালে আজও একজন হাত ধুয়ে গেছে ভুল করে। জিওলজির শেষ বর্ষে পড়া রফিক সে-দৃশ্য নিজ চোখে দেখেছে। না দেখলে অনেক কিছুই খাওয়া যায়। দেখে ফেললে বিপদ। আজ দুপুরের খাবারটা ডালের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না আর।

গতকাল অবশ্য জমপেশ একটা ভোজ জুটেছিল দুপুরে। সব খাবারের নামও জানে না রফিক। ডিপার্টমেন্ট থেকে সে আর জুবায়ের গিয়েছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে। সেখানেই বাহারি লাঞ্চের ব্যবস্থা।

জুবায়েরের সাথে কনফারেন্সে যাবার অনুভূতি খুব একটা সুখকর ছিল না। জাপানি এক মেয়ে ওদের সাথে হাত মেলাতে এসেছিল। রফিক সাথে সাথে জানিয়ে দিল ওর ধর্ম এ কাজের অনুমতি দেয় না। মেয়েটাও সাবলীল ভঙ্গিতে হেসে হাত সরিয়ে নেয়। ঠিক তখনই জুবায়ের আগ বাড়িয়ে খুব করে মেয়েটার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, সে বেশ লিবারেল। এসব রিচুয়াল গোঁড়া ধার্মিকদের জন্য।

হতভম্ব মেয়েটা দুজনের সাথেই কিছুক্ষণ কথা বলে বিদায় নিয়েছিল। অস্বস্তিটা রফিকের লাগার কথা ছিল, কিন্তু অস্বস্তিতে পড়ে গেল জুবায়ের। 'একে নিয়ে যে কী করি' ভঙ্গিতে পার করে দিয়েছে কনফারেন্সের পুরোটা সময়।

Scanned with CamScanner

সকালে ক্লাসে এসে দুই-তিনজনকে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে দেখেছে রফিক। জুবায়ের দুই চেয়ার এক করে আধো-শোওয়া হয়ে কনফারেন্সে কী কী হলো বর্ণনা করছে। তাকে ঘিরে ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা।

রফিক অস্বস্তিতে একটু দূরে গিয়ে বসেছিল। দূর থেকেই দেখল—কেউ কেউ ওর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। ঘটনা বুঝতে দেরি হয়নি রফিকের। জুবায়ের সবাইকে উঠতি হুজুরের গল্প শোনাচ্ছে।

লাঞ্চ ব্রেকের আগের ক্লাসটা ছিল আলতাফ স্যারের। স্যার ক্লাস শেষে রফিককে দেখা করতে বলেছেন। ভদ্রলোক তাকে খুব স্নেহ করেন। রফিক তার এলাকার ছেলে। সেও স্যারের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। মফস্বলের ছেলে রফিক। ঢাকায় এসে হলের গণরুমেও সিট পায়নি প্রথম দিকে। পরে আলতাফ স্যারের চেষ্টায় সিট পেয়ে যায়।

স্যার প্রায়ই রফিকের বাড়ির খোঁজ নেন। যে-কোনো সমস্যায় তার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। রফিকের বাড়িতে মা আর ছোট বোন আছে। সে টিউশনি করে নিজে চলে, যে-টাকা বাঁচে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। যা দেয় তাতে এমন কিছু হেরফের হয় না সংসারে, তবুও চেষ্টা করে পাঠাতে।

রফিক বুঝতে পারছে না স্যার কী জন্য ডাকতে পারে। বছরখানেক হলো স্যারের সাথে একটু মনোমালিন্য চলছে। হুট করে ওর দাড়ি রাখা, টাখনুর ওপর প্যান্ট পরা ডিপার্টমেন্টের অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। কেউ অবশ্য কিছু বলেওনি। কেবল আলতাফ স্যার বিরক্ত হয়ে ধর্ম নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। রফিক তার ভুল ভাঙাতে চেয়েছিল। স্যার উল্টো রেগে গেছেন।

স্যারের রুমে যাবার পর রফিক বুঝতে পারল জুবায়ের ভার্সিটিতে পড়লেও মনে মনে কিন্ডারগার্টেনের চেতনা লালন করে। প্লে-গ্রুপের বাচ্চারা যেমন কথায় কথায় নালিশ দেয়, জুবায়েরও ঠিক তাই করে বসেছে। সেই জাপানি মেয়ের সাথে হাত না মেলানোর ঘটনা স্যারকে পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে! কে জানে, হয়তো ক্যাম্পাসের মাঠে ঘুরঘুর করা আচারওয়ালা পর্যন্ত এ ঘটনা জেনে গেছে কি না।

আলতাফ স্যার গম্ভীর মুখে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছে রফিককে।

Scanned with CamScanner

'তুমি এভাবে চলতে থাকলে কোথায় চাকরি পাবে? জুবায়ের ছেলেটা সেখান থেকে ইন্টার্ন করার অফার পেয়েছে। তুমি পাওনি কেন বোঝো? তোমার চাকরি লাগবে না? সংসার কে চালাবে তোমাদের?'

পুরোটা সময় রফিক মাথা নিচু করে ছিল। কিছু বলতে পারেনি। সংসারের কথা ভাবলে সে-ও চোখেমুখে অন্ধকার দেখে। কী অপেক্ষা করছে সামনে!

[দুই]

'বাবা, খেয়েছিস?'

'হুম্ম।'

কী যেন মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে মা আবার বলতে থাকেন, 'ওহ শোন, তোর হানিফ চাচাকে চাকরির জন্য বলেছিলাম। উনি বললেন, তোর দাড়ির জন্য নাকি...'

'আহ মা! যাকে-তাকে আমার চাকরির জন্য কেন বলো! তোমাকে নিষেধ করেছি না?'

মাকে আর কথা বলার সুযোগ দেয়নি রফিক। পরে কথা হবে বলে কল কেটে দিয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পুরো পৃথিবীর মানুষ ওর চাকরি নিয়ে চিন্তিত। সবাই দিনে একবার করে বলে যায় দাড়ির জন্য চাকরি হবে না।

সেদিন গিয়েছিল ছাত্রের বাড়িতে। ছাত্রের মা অমায়িক মহিলা। রফিকের একটা চাকরির জন্য নিজের স্বামীকে খুব করে ধরেছেন। এমন না যে রফিক অনুরোধ করেছে। ভদ্রমহিলা নিজ উদ্যোগে পরোপকার করতে চেয়েছিলেন। রফিককে বলে দিয়েছেন শুক্রবার বাচ্চাদের বাবা বাসায় থাকেন। রফিক যেন অবশ্যই আসে।

প্রথম দর্শনেই রফিককে দেখে নাক কুঁচকে ফেলেছিলেন ছাত্রের বাবা। যেন ওর গা থেকে বোঁটকা গন্ধ আসছে। এরপর চলল নানান জেরা। দাড়ি কেন, জোব্বা না পরলে কী হয়? আমিও তো মুসলিম, আমি জান্নাতে যাব না? তুমি একাই যাবে?

প্রশ্নবাণে জর্জরিত রফিক খেই হারিয়ে ফেলেছিল। ছাত্রের মা একবার নাস্তা দেওয়ার জন্য ড্রইংরুমে এসেছিলেন। মুখ থমথমে। ওর দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে চলে গেছেন। রফিক ভাবতে পারে না এমন মার্জিত, ভদ্র একজন মহিলার স্বামী এতটা উন্নাসিক!

Scanned with CamScanner

ছাত্রের বাবার হাত থেকে সেদিন কোনোমতে মুক্তি পেয়েছিল রফিক। পরদিন মনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ছাত্রের বাসায় গিয়ে শোনে—কাল থেকে আর আসতে হবে না। মাসের পুরো বেতনটা দিয়ে ছাত্রের মা ছলছল চোখে বললেন, 'তোমার আংকেলের কথায় কিছু মনে কোরো না। উনি ওরকমই। মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে মাফ করে দিয়ো বাবা।'

রফিক কষ্ট পায়নি আসলে। দাড়ি-টুপি দেখে নানান মানুষ নানান কথা বলে। এর মাঝেও কিছু মানুষ অকারণে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। কটু কথা মনে রেখে মনের ভার বাড়িয়ে লাভ নেই। কেবল একটাই কষ্ট, টিউশনিটা গেল। ছাত্র ইংলিশ মিডিয়ামের ছিল। মাস শেষে ভালো একটা অঙ্ক আসত। এই টিউশনির পুরো টাকাটাই বাড়ি পাঠিয়ে দিত রফিক। এখন মাকে কী পাঠাবে?

[তিন]

থিসিস ডিফেন্স খুব বাজে হলো রফিকের। শামীমা ম্যাম শুরুতেই ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করলেন। ডিপার্টমেন্টের অন্যতম সিনিয়র টিচার তিনি। তার ওপরে কথা বলার কেউ নেই। দাড়ি-টুপি জোব্বা নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাবিজাবি বলার পর আচমকা বলে বসলেন, 'তুমি আইএস করো নাকি?'

হতভম্ব রফিক এরপর সব গুলিয়ে ফেলে। একাডেমিক প্রশ্নের উত্তরেও ভজঘট পেকে গেল। অতঃপর টিচারদের আরও কিছু কটু কথা শেষে বিদায়।

ডিফেন্সের পর রফিক অনেকদিন ডিপার্টমেন্টমুখো হয়নি। কেমন একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল সে। সহপাঠীরা যার যার কাজে ব্যস্ত। কেউ বিসিএসের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কেউ ব্যাংক জবের প্রস্তুতি। রফিক চাকরি খুঁজছে হন্যে হয়ে। চাকরি পাচ্ছে না। কেউ দুটো ভালো কথাও বলছে না। সবার একই কথা। এই বেশভূষা ছাড়তে হবে। নতুবা চাকরি হবে না। গভীর হতাশায় তলিয়ে যাচ্ছিল রফিক।

এর মাঝে একদিন দেখা হলো নূর ভাইয়ের সাথে। ওর সব কথা শুনে নূর ভাই বোঝালেন, 'দেখো রফিক, রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি যদি তোমাকে সাহায্য করতে চান, লেবাসের জন্য তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তাঁর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।'

Scanned with CamScanner

ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছিল বড়জোর বিশ মিনিট। এই বিশ মিনিটের খুব দরকার ছিল রফিকের জীবনে। জীবন নিয়ে হতাশায় ইবাদতেও গাফিল হয়ে গিয়েছিল সে। নূর ভাই এসে তাকে উজ্জীবিত করে গেলেন।

সেদিন থেকে রফিক অনর্থক দুশ্চিন্তা বাদ দিয়েছে। চাকরির চেষ্টা সে করে যাবে। তবে না হলে হতাশায় ডুবে যাবার কিছু নেই; বরং এই সময়টা সে কুরআন হিফয করবে। চাকরি-বাকরি শুরু হয়ে গেলে অবসর পাবে না আর। এখনই সময় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করবার।

[চার]

সবচেয়ে সুন্দর জুব্বাটা পরে, গায়ে আতর মেখে বের হয়েছে রফিক। আজ ইন্টারভিউ আছে। একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে লেকচারার নিচ্ছে। রফিক জানত না। এক ব্যাচ জুনিয়র হাবিব জানিয়েছে খবরটা। হঠাৎ করে একদিন হাবিবের ফোন, 'ভাই, এই ভার্সিটিতে এপ্লাই করে দেখেন।'

হাবিব বেছে বেছে কেন-ই-বা ওকে বলল—তা অবশ্য জানে না রফিক। আজকাল ওর অজানাকে জানতে চাইবার কৌতূহলও কমে গেছে। খেয়াল করে দেখেছে, চারপাশের ঘটনা প্রবাহ যত বেশি জানা যায়, ঝামেলা তত বাড়ে। চাকরির ইন্টারভিউ আছে এতটুকু জানাই যথেষ্ট তার জন্য।

ইন্টারভিউ বোর্ডে রফিকের জন্য একটা চমক ছিল। এক্সটার্নাল স্বয়ং আলতাফ স্যার! থিসিস ডিফেন্সের কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেদিন যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিল না সে, সবচেয়ে বেশি ক্ষেপে গিয়েছিলেন আলতাফ স্যার। ওর সুপারভাইজার স্যারও এত রাগেননি, যতটা আলতাফ স্যার রেগেছিলেন। আজ স্যারকে দেখে সেই ট্রমার কথা মনে পড়ে গেল।

রফিক নিজেকে শাসায় মনে মনে। নূর ভাই বলেছিলেন, 'মানুষকে এমন স্থানে বসাবে না, যে-স্থান থেকে সে তোমার মনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলতে পারে। ওই স্থান কেবল আল্লাহর। মানুষকে ভয় পেয়ো না।'

চমৎকার একটা ইন্টারভিউ হলো রফিকের। রুম থেকে বের হয়ে আসার পর আলতাফ স্যারও বের হয়ে আসলেন। খুশিতে রফিকের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

Scanned with CamScanner

'হাবিব তোমাকে বলেছিল তাহলে?'

স্যারের প্রশ্নে রফিকের বুঝতে বাকি থাকে না হাবিব কেন ওকেই ফোন করে বলেছিল খবরটা। অবাক লাগে ওর। ডিফেন্সের পর সে রীতিমতো পালিয়ে বেড়াত স্যারের কাছ থেকে। স্যারও তাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। অথচ আজ মনে হচ্ছে স্যার ওর কতটা আপন! অন্তরের মালিক যিনি, কেবল তিনিই জানেন কেমন করে মানুষের মন বদলে যায়।

পরিশিষ্ট :

রফিক লেকচারার হিসেবে জয়েন করেছে সেই প্রাইভেট ভার্সিটিতে। মা আর ছোট বোনকে ঢাকায় এনেছে। যে-মানুষগুলো আগে দূর দূর করত তারাও আজকাল কাছে ভিড়তে চায়। রফিক কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। সাধ্যের মধ্যে কিছু-না-কিছু করার চেষ্টা করে। যে উপেক্ষা আর অবজ্ঞার সাক্ষী হয়েছে একসময়, তার স্বাদ অন্যকে দেয় কী করে!

Scanned with CamScanner

ভাবনার আধাঁর

আনিকা তুবা

বিয়ের অনেকদিন পরেও বাচ্চা হচ্ছিল না। মন খারাপ লাগত। মনে হতো যেন, মা হতে পারব না। চার বছর পর প্রথম বাচ্চা হলো। সবাই অনেক খুশি! অনেক অপেক্ষার পর পাওয়া এই সন্তান। এই বাচ্চা আমাদের কাছে তাই অনেক দামি; কিন্তু বাচ্চাটি হলো অসুস্থ। নরমাল ডেলিভারি অথচ বাচ্চা হওয়ার দশ দিন পরেও আমরা হাসপাতালে বন্দি। তখন বাইরের পৃথিবীটা দেখতে পেতাম না। জগৎ ছিল উমারকে ঘিরে।

অনেক শখ করে সাহাবী উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর নামে তার নাম রেখেছিলাম উমার। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব শক্তিশালী ছিলেন। ঈমানে ও শক্তিতে আমাদের উমার হলো দুর্বল। জন্মের পর থেকেই উমারের হাতে ক্যানোলা লাগানো ছিল। ছোট্ট একটি হাতে তারচেয়েও বিশাল মাপের যন্ত্রটি দেখতে একটুও ভালো লাগত না। প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে ওর ওষুধ দেওয়ার পরে দেখতাম, বাকি বাচ্চাগুলো গলা ফাটিয়ে কাঁদছে; কিন্তু আমার বাচ্চা কাঁদে না। নার্স বলত, তোমার বাচ্চা তো অসম্ভব ভদ্র! আমি মনে মনে কাঁদতাম। বুক ভেঙে আসত। আমার উমার কাঁদে না, আমার উমার কাঁদতে পারে না।

বাসায় বোনের মেয়ে ছিল যাইনাব। ছোট থেকেই তার কান্নাকাটিতে আমরা অস্থির! তখন মনে হতো—আহা! আমার উমার যাইনাবের মতো কেন কাঁদে না, কেন জ্বালায় না? সত্যি, যন্ত্রণাও যে কখনও এত মধুর হতে পারে, এত সাধের হতে পারে, জানতাম না। হাসপাতালে বসে আমার শুধু মনে পড়ত—রালফ ভাইদের

Scanned with CamScanner

কথা। এই দম্পতি বাচ্চা নিয়ে কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন। অসুস্থ বাচ্চা যাদের নেই, তারা কোনোদিন বুঝবে না—এই পরীক্ষা কী ভীষণ কষ্টের!

সবচেয়ে কঠিন দিন ছিল—যেদিন উমারের মেনিনজাইটিস টেস্ট করা হয়। এতটুকু একটি প্রাণ! তার শিরদাঁড়া থেকে রক্ত নেওয়া হবে? আমরা ইন্টারনেটে এই রোগের কথা পড়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখনও কিন্তু তেমন কষ্ট লাগেনি। কষ্ট লাগল তখন, যখন দেখলাম আমাদের বাচ্চার সাথে রোগের লক্ষণ প্রায় সবগুলোই মিলে যাচ্ছে।

চার বছর পরে বাচ্চা হলো—আর সেই বাচ্চাটিও হলো অসুস্থ। বাচ্চাটি তাই আমাদের কাছে আরও দামি হয়ে যায়। মলিন দৃষ্টি মেলে উমার দূরে কোথায় তাকিয়ে থাকে—সেই তাকিয়ে থাকা দেখে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা কষ্টরা অশ্রু হয়ে ঝরে...

দশ দিন পর উমার রিলিজ পায়। আলহামদু লিল্লাহ, এরপর দ্রুতই ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। এখন উমার হাসে-খেলে-জ্বালায়। আমি ওর জ্বালানোকেও উপভোগ করি। মানুষ সুখে থাকলে দুঃখের কথা ভুলে যায়। তবুও কোনো-কোনোদিন হঠাৎ যখন মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা, তখন বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। সত্যি, বড় ভারী ছিল সেই দিনগুলো...।

আমরা যারা সুস্থ-সন্তান পেয়েছি, আমরা বুঝি না, এটা আল্লাহর কত বড় নিয়ামত। আল্লাহ যে কী দয়া করে আমাদের এতকিছু দিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করি—বেশিরভাগ মানুষই খুব উদ্ধত। এত কিছু পেয়েও একটু শুকরিয়া নেই, একটু বিনয় নেই, আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিলে শত অজুহাত। ইসলাম মানতে কত হাজারও আপত্তি।

আমরা কি পারি না—এই সুখের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে? আমরা কি পারি না—আজ থেকেই ইসলামের কথামতো নিজেকে বদলে নিতে? শুধু একটি সুস্থ-সন্তানের আশায়, সন্তানের একটি হাসির জন্য মানুষ জান দিয়ে দিতে পারে! সেখানে সবকিছু পেয়েও আমরা আল্লাহকে অমান্য করি কীভাবে?

খুব ইচ্ছে হয় এমন একটি দৃশ্য দেখতে—যখন চেনা মানুষগুলোর সবার মুখে দাড়ি থাকবে। মেয়েদের পরনে থাকবে হিজাব। বাবার হাত ধরে ছেলেমেয়েরা টুকটুক করে মসজিদে যাবে আর মায়ের মুখে শুনবে কুরআনের বাণী। ওরা বড় হয়ে

Scanned with CamScanner

কুরআনের হাফিয হবে, দ্বীনের আলিম হবে, ইসলামের দাঈ হবে—ওদের কথায় লাখো লোক ইসলাম গ্রহণ করবে।

আমাদের সন্তানরা এমন হয় না। কারণ, ওরা আমাদের দেখে ইসলামকে অবহেলা করতে শেখে, ভালোবাসতে শেখে না। আমাদের সন্তানরা এই জীবনে বড়-কিছু হোক—শুধু এটাই কি আমাদের চাওয়া?

মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। একদিন আমাদের নিজেদের জন্য ধিক আসবে, ছিঃ ছিঃ করব নিজের ওপর; কিন্তু সেই দিন, সেই কঠিন দিনে দুনিয়াতে ফিরে এসে নিজেকে বদলে নেবার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

> *যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে—হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম আর শুনলাম। এখন আমাদের (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দেন, আমরা ভালো কাজ করব, আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।*[১]

কিন্তু সেদিন আর ফেরত আসা যাবে না।

জীবনের যে-অল্প কয়েকটি দিন বেঁচে আছি, চলুন—বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বদলে নিই। যে মহান রব, আমাদের সব দিলেন—তাঁর দিকে ফিরে যাই। স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা-কাচ্চা, নাতিপুতি নিয়ে একজীবন কাটিয়ে দিই রবের ইবাদতে।

---

[১] সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১২।

Scanned with CamScanner

মা

নুসরাত জাহান

খুব ছোটবেলায় বুঝে গিয়েছিলাম আমার মায়ের অনেক সাধ আছে; কিন্তু সাধ্য সবসময় থাকে না। মায়ের সাথে মার্কেটে গিয়ে কোনো জিনিস পছন্দ হলেও একবারের বেশি দুবার নেড়েচেড়ে দেখার দুঃসাহস করতাম না। আমি জানি, কিনে দিতে না পারলে মায়েরই বেশি মন খারাপ থাকে।

ক্লাস টেনে পড়ি তখন। একবার মায়ের সাথে মার্কেটে গিয়েছিলাম একটি নতুন বাবুর জন্য কিছু জামা-কাপড় কিনতে। পাশের কসমেটিকসের দোকানে একজোড়া কানের দুল খুব পছন্দ হয়ে গেল। বারবার নেড়েচেড়ে দেখার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। মা তখন বাচ্চার কাপড় দামদর করা নিয়ে ব্যস্ত। আমি দুল জোড়া কিছুক্ষণ হাতে নিই আবার রেখে দিই। বেশ দাম হওয়ায় মাকে সাহস করে বলিনি। অবশেষে বাসায় ফেরার জন্য রিকশা ঠিক করলাম। হঠাৎ মা বলল, 'ওই দোকানে কী যেন একটা জিনিস ফেলে এসেছে।'

আমাকে রিকশায় বসতে বলে সেটি আনতে চলে গেল।

বাসায় ফিরলাম। মা ব্যাগের ভেতর থেকে হঠাৎ-ই সেই দুল জোড়া বের করে আমার হাতে দিলেন। হতভম্ব হয়ে গেলাম। মা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'এতবার হাতে নিলি একবার তো ডেকে বলতে পারতি—'আম্মু, কানের দুলটি খুব সুন্দর, তাই না? ব্যস! তাতেই তো হয়ে যেত।'

Scanned with CamScanner

আমার চোখভর্তি পানি। আটকাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু পারছিলাম না।

অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। একবার আমাদের বাসায় আমার এক বড়লোক খালা এলেন বেড়াতে। খালা বোরকা পরেন, সাথে ছিল কালো জর্জেট কাপড়ের ওপরে যশোরের কাঁথা-স্টিচের কাজ করা খুব সুন্দর ওড়না। কথায় কথায় মা জানতে চাইলেন খালার কাছে, এই ওড়না কোথায় পাওয়া যায় আর দামই বা কেমন। খালা দোকানের নাম-ঠিকানা, দাম সবই বললেন,। দাম শুনে মা চুপসে গেলেন। আমার চোখে চোখ পড়ায় শুধু বললেন, 'তোর আন্টির ওড়নাটি সুন্দর, না?'

টিউশনি করতাম তিনটি। একটি টিউশনি থেকে দেড় হাজার টাকা পেতাম। সেই টিউশনির বেতনের প্রায় পুরো টাকাটা খরচ করে মায়ের জন্য ঠিক সেই ডিজাইনের একটি ওড়না কিনলাম। বাসায় ফিরে মাকে প্যাকেটটি দিয়ে ইশারায় বললাম খুলে দেখতে। মা খুলে চোখ কপালে তুলে ফেলল। আমাকে কিছুক্ষণ বকাবকি করে নিজেই গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নতুন ওড়নার ভাঁজ খুলে গায়ে জড়াল। আমি পাশের রুম থেকে মায়ের আনন্দ-অশ্রু লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা দেখছিলাম।

আমি লাচ্ছি খেতে পছন্দ করি। খুব পছন্দ যাকে বলে। মা যতবারই বাবার পেনশনের টাকা তুলতে যেতেন, টাকা তোলা শেষে আমাকে ততবারই খদ্দর মার্কেটের নিচতলার ফাস্টফুডের দোকানে নিয়ে যেতেন। তেঁতুলের সস দিয়ে একটি কলিজার সিঙ্গারা আর বরফ কুচি দিয়ে এক গ্লাস লাচ্ছি। আমার সে-কী আনন্দ!

মেঝো মামাদের বাসায় প্রায়-শুক্রবার ছুটিতে পারিবারিক আড্ডা হতো। মামার জন্য মাঝে মাঝে কফি বানানো হতো। মা দুই একবার কফি খাওয়ার পরে কফির ভক্ত হয়ে গেলেন। কেবল মামার বাসাতেই মা কফি খেতে পারত। আর আমরা হাসলে বলত—গরীবের ঘোড়ারোগ আর কি!

কোনো এক শীতের সন্ধ্যাবেলা টিউশনি থেকে ফেরার পথে একটি নেসক্যাফে কফি-জার আর সাথে রাস্তার পাশে বিক্রি হওয়া গরম গরম ধোঁয়া-ওড়া ভাপা পিঠা (আমার মায়ের খুব পছন্দের) নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মাকে এক মগ গরম কফি বানিয়ে সামনে দিলাম। কফি দেখে মা অবাক। কফি কিনে শুধু-শুধু কেন টাকা নষ্ট করলাম বলে বকাঝকা করলেন। তারপর নিজেই করে কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন আর মুচকি হাসছিলেন। মায়ের চোখে-মুখে শিশুসুলভ আনন্দ আর আমার চোখের কোণে পানি এসে কেবল জমতে শুরু করেছে। আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিরানব্বইটি নামের মধ্যে 'দয়াময়' নামের গুণবত্তা আল্লাহপাক সবচেয়ে বেশি দিয়ে যাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনি হলেন—মা।

Scanned with CamScanner

এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়

আরিফ আজাদ

আগেরদিন বিকেলে একসাথে বসে চা-খাওয়া বন্ধুটি যখন পরেরদিন না-ফেরার দেশে চলে যায়, সেই শোক সামলানোর জন্য তখন ঠিক কী রকম মানসিক প্রস্তুতি দরকার!

মাঝে মাঝে মৃত্যু নিয়ে খুব ভাবি। বুকের বাম পাশে ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ডটি হঠাৎ থেমে গেলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। মুহূর্তেই মানুষ হয়ে যায় অন্য জগতের বাসিন্দা।

বন্ধু জাহিদের মৃত্যু-সংবাদ শোনার সাথে সাথে আমি যেন বরফের মতো জমে গেলাম। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন মুহূর্তেই লোপ পেয়ে গেল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে গেছে, থেমে গেছে ঘূর্ণন। ভেঙে পড়েছে মহাকর্ষীয় সব শক্তি। সবকিছু স্থবির। যে-কোনো সময় হয়তো প্রলয় আসন্ন। 'জাহিদ আর নেই'—এটা যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। মৃত্যু এতটা অনিশ্চিত হতে পারে! এতটা সন্নিকটে!

এমন সময় আমাকে সাহস দিতে এগিয়ে এলো আমার স্ত্রী ফাতিমা। তার চেহারাতেও বিষণ্ণতার ছাপ। বিষণ্ণ-মন নিয়েই সে পাঠ করল, 'কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতুল মাউত।'

ফাতিমার মুখে এই আয়াত শোনামাত্রই আমার যেন নতুন করে ভাবোদয় হলো। এর আগেও অনেকবার শুনেছি এবং তিলাওয়াত করেছি এই আয়াত। তবে, আজকের মতো এতটা গভীরভাবে কখনও তা রেখাপাত করেনি আমার মনে। আসলেই তাই! পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ রয়েছে। একদল সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে,

Scanned with CamScanner

আর একদল করে না। আবার, এই দুই দলের মাঝামাঝি একটি দল আছে। তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসও করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এবং সংশয়বাদী যা-ই হোক, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি চললেও জগতের একটি ব্যাপার নিয়ে কারও মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, নেই কোনো দ্বিমত। আর তা হলো মৃত্যু। পৃথিবীর ইতিহাসে দম্ভভরে অনেকেই নিজেকে খোদা দাবি করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, কিন্তু অমরত্ব লাভের দুঃসাহস কেউ করতে পারেনি। শক্ত আস্তিক থেকে শুরু করে ঘোর নাস্তিক, দোলাচলে থাকা সংশয়বাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে—একদিন তাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

জাহিদ আমার বাল্যকালের বন্ধু। আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে আমি আমেরিকা চলে গেলেও শেকড়ের টানে দেশেই রয়ে যায় সে। জাহিদের ছিল শিক্ষক হবার দুর্বার নেশা। দেশে ফিরে এসে দেখি, সে ব্যবসা করছে। সারাজীবন চিরকুমার থাকার পণ করে থাকা জাহিদকে আমি আবিষ্কার করলাম এক কন্যার পিতা হিসেবে। ছোটবেলার কোনো কথা-ই সে রাখতে পারেনি। জীবনে সে যত রকমের ওয়াদা করেছে, তার সবটাই তাকে ভাঙতে হয়েছে। খুব ছোটবেলায়, পাটোয়ারীদের পেয়ারা গাছে বসে, পা ঝুলাতে ঝুলাতে আমাকে ছেড়ে না-যাওয়ার ওয়াদা করেছিল সে। অথচ সেই ওয়াদাও রাখা হলো না তার। আজ সে আমাকে রেখেই চলে গেছে। কবি বলেছেন, সব চলে যাওয়া নাকি প্রস্থান নয়। সত্যিই কি তাই?

জাহিদ কি আর কখনই ফিরে আসবে আমাদের মাঝে? আর কি কখনও আমরা একসাথে শাপলা তুলতে বেরোব না? ঝড়-বাদলের দিনে একসাথে আম কুড়ানো, স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাঠ-তেপান্তর চষে বেড়ানো আমার সোনালি অতীতের বন্ধুটি কি আর কখনও এসে দরজায় কড়া নেড়ে বলবে, 'তাড়াতাড়ি আয়, নইলে কিন্তু তোকে রেখেই চললাম?' বলবে না। মৃত্যু মানেই হলো নিশ্চিত প্রস্থান।

জাহিদকে একবার খুবই বিমর্ষ পেলাম। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগে থাকা বন্ধুকে এমন অবস্থায় দেখে আমার মনটাও ভারী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার? তোকে এতটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? কোনো সমস্যা?'

মায়াভরা চোখে সে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ টলোমলো। ভারী বর্ষণের পূর্ব-মুহূর্তে আকাশ যেমন গুমোট আকার ধারণ করে, সে-রকম। বুঝতে পারলাম

Scanned with CamScanner

কোনো সমস্যা হয়েছে এবং সমস্যাটি খুবই গুরুতর। আমি রাগতস্বরে বললাম, 'আশ্চর্য! কী হয়েছে সেটা তো বলবি, নাকি? এরকম বোবা হয়ে থাকলে বুঝব কী করে?'

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল জাহিদ। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি কোনোরকমে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, 'জাহিদ, কী সমস্যা বন্ধু? বল আমাকে?'

সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল, 'আমার মেয়েটার ব্রেইন টিউমার হয়েছে রে! চোখের সামনেই সে আস্তে আস্তে জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বাবা হয়ে আমি ঠিকমতো তার চিকিৎসাও করাতে পারছি না। বিশ্বাস কর বন্ধু, মাঈশার কিছু হলে আমি আর তোর ভাবি, আমাদের কেউই বাঁচব না' বলতে বলতেই আমার হাত ধরে জাহিদ আবার কাঁদতে শুরু করল। তাকে শিশুর মতো কাঁদতে দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে।

খুব ছোটবেলায় আমি বাবা-মাকে হারিয়েছি। আমার জন্যে তাদের আদর-ভালোবাসা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কোনোটাই সেভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু মাঈশার জন্য জাহিদের অবিরত চোখের জল দেখে বাবা-মায়ের ভালোবাসা কিছুটা অনুভব করতে পারছি।

তাকে বললাম, 'দেখ, এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। রোগ যেমন আছে, তার চিকিৎসাও আছে। তুই কোনো চিন্তা করিস না। দেখিস, মাঈশার কিচ্ছু হবে না, ইন শা আল্লাহ'।

জাহিদের সাথে এই আলাপগুলো হয়েছিল কয়েক মাস আগে। এরপর যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাঝখানে আমাদের আর কোনো সাক্ষাৎ হয়নি। মতিঝিলে গতকাল ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায় আমাদের। দুজনেই খুব ব্যস্ত। হালকা আলাপ এবং দুজনে দু-কাপ চা খেয়ে বিদায় নিয়ে নেওয়া।

এরপর?

এরপর আজ তার মৃত্যু সংবাদ! আহা মৃত্যু! আহারে মানুষ! কচু পাতার ওপর জমে থাকা শিশিরবিন্দুর মতোই ঠুনকো মানুষের জীবন। হালকা বাতাসে পাতা দুললেই গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

হার্ট-অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে জাহিদের। কী-জানি ওই বুকের ভেতর কত রকমের বোঝা চেপে রেখেছিল সে। গতকালের জাহিদকে আজ অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন

Scanned with CamScanner

বিশেষণে ডাকতে হবে। মৃত জাহিদ, লেইট জাহিদ। গতকালের জাহিদ আজ কেবলই নির্জীব ও অনড় পদার্থ। গতকালের মানুষটি আজ কেবলই লাশ! জীবনের পরিণতি যে কত নিষ্ঠুর হয়, তা যদি আমরা অনুভব করতাম!

জাহিদের মৃত্যুর সাথে সাথে মাঈশার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেল। তার ব্যবসার পার্টনাররা নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে সটকে পড়ল। তার মৃত্যুর সাথে সাথে নামে-বেনামে বেরিয়ে এলো অনেক পাওনাদার। কোনো এক সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'জীবিতকে নিয়ে ব্যবসা চলে, মৃতকে নিয়ে নয়।'

সেই সাহিত্যিক আজও বেঁচে আছেন কি না, জানি না। বেঁচে থাকলে তাকে আজ দেখানো যেত, মৃতকে নিয়েও এখানে কত রমরমা ব্যবসা হয়।'

তিনমাসের মাথায় বাড়িওয়ালা জাহিদের স্ত্রী-কন্যাকে আর বাসা ভাড়া দিতে রাজি হয় না। ব্যবসার অংশীদাররাও ব্যবসার বিরাট 'ক্ষতি' দেখিয়ে জাহিদের নাম চুক্তিপত্র থেকে বাদ দিয়ে দিল।

ঢাকা শহর। যেখানে পান করার মতো একটু পানিও মাগনা পাওয়া যায় না, সেখানে বুঝি এই অবস্থায় ব্রেইন টিউমারের চিকিৎসা হবে? অবস্থা এমন, বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে পথে বসা ছাড়া ভাবির কোনো উপায়ন্তর নেই। আমাদের অবস্থাটাও তেমন আহামরি কিছু নয়—মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি। কোনোরকমে নিজেদের ভরণপোষণ সামলে বাড়তি কারও দায়িত্ব কাঁধে নেব, সে সাধ্যি কই? তবুও টুকটাক যতটুকু পারছিলাম, বন্ধুর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা অব্যাহত ছিল।

রোজগার থেকে বাঁচিয়ে কিছু অংশ সঞ্চয় করেছিলাম। ঠিক করলাম, তা উঠিয়ে মাঈশার চিকিৎসা করাব। ভাবনাটা আমার স্ত্রী ফাতিমার সাথে শেয়ার করলাম। ফাতিমা খুবই নরম মনের মানুষ। দীর্ঘ সাংসারিক জীবনে তাকে আমি কখনই কঠোর হতে দেখিনি। অন্যের বিপদ আর দুঃখের সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফাতিমা-ই সবসময় আমাকে বলত। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার প্রস্তাবে ফাতিমা অবশ্যই রাজি হবে এবং খুব খুশিও হবে।

কিন্তু যখনই তাকে আমি আমার ভাবনার কথা জানালাম, সে আমার মুখের ওপরে বলল, 'এটার কোনো দরকার নেই'।

Scanned with CamScanner

ফাতিমার জবাব শুনে আমি খুব অবাক হলাম। সে আমার এই প্রস্তাবে রাজি হবে না, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তাকে তো আমি চিনি। সাত বছর ধরে ঘর-সংসার করছি আমরা। জীবনে যাকে সবসময় অন্যের ভালো থাকা আর অন্যের সুখের কথা ভাবতে দেখেছি, তাকে আজ এমন কঠিন আর পাষাণ রূপে দেখতে পাব, দুঃস্বপ্নেও আমি তা ভাবতে পারি না। এ কি আমার সহধর্মিণী ফাতিমা? নরম হৃদয়, সরল অন্তর আর শুভ্র মনের অধিকারিণী যে ফাতিমাকে আমি চিনি, ভালোবাসি, বিশ্বাস আর ভরসা করি, এ কি সেই!

তার পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। দুনিয়াটাকেই আমার কাছে বিস্বাদ লাগছে তখন। জগতের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত বোধকরি এটাই। মনে মনে বললাম, 'ফাতিমা, তুমিও এভাবে বদলে যেতে পারলে! স্বার্থপরতার মোহ থেকে তুমিও বাঁচতে পারলে না!'

উঠে দাঁড়ালাম। ওকে কেন জানি পর পর মনে হচ্ছে। এই ফাতিমাকে আমার সহ্য করতে মন চাইছে না। দ্রুত স্থান ত্যাগ করার জন্য পা বাড়াতেই আমার হাত ধরে সে বলল, 'আপনি কি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন?'

আমি কিছুই বললাম না। আজ তাকে আমার কিচ্ছু বলার নেই। কঠিন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে আবার বলল, 'আমার কথাটা একবার শুনুন, প্লিজ'।

কী শুনব আমি? স্বার্থপরতার গল্প ছাড়া আর কী শোনাবে সে আমাকে? আমাকে হয়তো আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বলবে। আমার অনাগত সন্তানদের কথা ভাবতে বলবে। তাদের বেড়ে ওঠার জন্য হলেও জমানো সঞ্চয়গুলো এভাবে খরচ না করার অনুরোধ করবে, এই তো? এর বাইরে আর কী-ই-বা শোনানোর আছে তার?

আমার কোনো জবাব না পেয়ে ফাতিমা এবার তার কথা বলে যেতে লাগল, 'আজকে না-হয় ভাবিদের আমরা টাকা দিয়ে সাহায্য করলাম, কিন্তু আগামীকাল? আগামী পরশু কী হবে তাদের? কার কাছে যাবে তারা? কোথায় গিয়ে হাত পাতবে?'

ফাতিমার কথাগুলো বুঝে উঠতে পারছি না আমি। নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে যাচ্ছে, 'আজকে না-হয় তাদের আমরা দয়া করব, কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দরকার একটি আশ্রয়। মাথা গোজার জন্য একটি আবাস। এই মুহূর্তে মাঈশার একটি নির্ভরতার ছায়া দরকার। পরম যত্নে তার মাথায় বুলিয়ে দেবার মতো দুটো কোমল হাত দরকার। তার মাথার ওপর দরকার একটা বটবৃক্ষ'।

Scanned with CamScanner

ফাতিমার কথাগুলোর কোনো মর্ম উদ্ধার করতে পারলাম না। তাকে অনুরোধ করে বললাম, 'তুমি কি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবে তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

এবার ফাতিমা আমার হাত ধরল। আমি খেয়াল করলাম তার চোখ দুটি রক্তজবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। তার কান্নার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এই ফাতিমাকে যেন আমি চিনতেই পারছি না কোনোভাবে। সে কান্না থামিয়ে বলল, 'আপনি ভাবিকে বিয়ে করুন'।

আমি পুনরায় নির্জীব হয়ে গেলাম। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা বাক্যটি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি কি ঠিক শুনেছি? কী বলল এটা ফাতিমা? এটা সে ভাবল-ই বা কীভাবে?

ফাতিমা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। টপটপ করে তার চোখের জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে। আমি তাকে স্পর্শ করলাম। দুহাতে তার মুখ আলতো করে ধরে বললাম, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

আমার প্রশ্ন শুনে আবারও তার চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ফোয়ারা। আমার দুহাত ভরে গেল তার অশ্রুজলে। সে থরথর করে কাঁপছে। আমি তাকে শক্তভাবে ধরলাম। আমার বাম হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললাম, 'এটা হয় না ফাতিমা'।

'কেন হবে না? আল্লাহ না করুন, জাহিদ ভাইয়ের জায়গায় আপনি আর ভাবির জায়গায় যদি আমি হতাম? আমাকে উদভ্রান্ত, অসহায় অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে আপনি দেখতে পারতেন?'

আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। ফাতিমার যুক্তির বিপরীতে দাঁড় করানোর মতো যুক্তি আমার কাছে নেই।

বললাম, 'যতটুকু পারি, টাকা দিয়ে তো আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাই না?'

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ফাতিমা। বলল, 'এটা দয়া। আমি চাই না, তারা দয়া নিয়ে বাঁচুক। আমি চাই, তারা অধিকার নিয়ে বাঁচুক। একজন নারী তার স্বামীর অধিকার, একটি সন্তান তার বাবার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে পছন্দনীয়।'

Scanned with CamScanner

সে-বার আমি আর কোনোভাবেই ফাতিমাকে বোঝাতে পারিনি। তার যুক্তির কাছে পেরে ওঠা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, তার সেক্রিফাইসের সামনে আমাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে। এমন পবিত্র ইচ্ছাকে অসম্মান করার মতো দুঃসাহস আমার হয়নি।

সত্যি সত্যিই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। যেদিন আমার দ্বিতীয় বিয়ে হলো, সেদিন বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশে মুহুর্মুহু মেঘের তর্জন-গর্জন। ভারী বর্ষণে প্রকৃতি তখন একেবারে দিশেহারা। এমন ঝড়ো হাওয়ার রাতে, আমার ঘরের ভেতরেও একটি ঝড় বইছিল। সেই রাতে ফাতিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুদের মতো হাউমাউ করে কাঁদছিল। বাইরের ভারী বৃষ্টির সবটুকু জল যেন ফাতিমার চোখে এসে ভর করেছিল। জাগতিক নিয়মে পুরুষেরা নাকি কঠিন প্রকৃতির হয়। তারা নাকি খুব সহজেই কাঁদে না। জগতের নিয়মকে ভুল প্রমাণিত করে সেদিন ফাতিমাকে জড়িয়ে ধরে আমিও খুব কেঁদেছিলাম।

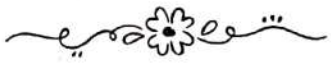

Scanned with CamScanner

অন্তর মম বিকশিত করো

আরিফ আবদাল চৌধুরী

ঘটনাটি আটাশ বছর বয়সী এক বোনের, যিনি এখনও হিফয করে যাচ্ছেন। ঘটনাটি তিনি এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন—

হিফযের শুরুর দিকে টানা এক বছর আমি কুরআন মুখস্থ করার চেষ্টা করি। মুখস্থ করতাম আর ভুলে যেতাম। চার বছর এই অবস্থার মধ্য দিয়েই যাচ্ছিলাম। এরপর একদিন আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং বিয়ের পরে আমার পক্ষে আর কুরআন মুখস্থ করা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি ঠিকঠাকমতো তিলাওয়াতও আমি চালিয়ে যেতে পারছিলাম না। স্বামী, সংসার আর বাচ্চাদের সামলাতে সামলাতে আমি হয়ে উঠলাম আগাগোড়া একজন দুনিয়াদার মানুষ। আখিরাত ভুলে থাকা মানুষের কাতারে উঠে গেল আমার নাম।

জীবনে সমস্যা লেগেই থাকত। একটা সমস্যার সুরাহা হলে অন্য আরেকটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। সমস্যায় জর্জরিত জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তার ভারে আমার মাথা নুইয়ে পড়েছিল। আমার অবস্থা তখন খুব খারাপ। সারাদিন কান্নাকাটি করতাম। মানসিক চাপে আমার শরীরের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠল এবং দিনদিন তা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। নিজেকে নিজের কাছেই বোঝা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—আমার চারপাশের পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। আমি হাঁসফাঁস করতাম। মনে হতো, মৃত্যুই সম্ভবত এই যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাওয়ার একমাত্র উপায়। এভাবেই পার হচ্ছিল আমার যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের কঠিন সময়। এরপর খুব

Scanned with CamScanner

কাকতালীয়ভাবে আমি কুরআনের এই আয়াতটি শুনতে পেলাম—'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয়ই তার জীবন হবে কষ্টের; এবং হাশরের দিন তাকে আমি পুনরুত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।'[১]

এই আয়াত শোনার পরে যেন আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার বোধোদয় হলো। মনে হলো, আয়াতের কথাগুলো যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া, জীবন দুঃখ-কষ্টে ভরে ওঠা...

নিজের জীবনের খতিয়ানের সাথে আমি মেলানো শুরু করলাম। চারপাশের মানুষগুলোকে খুশি করার জন্য, তাদের সন্তুষ্টির জন্য আমি কত কিছুই না করি। কিন্তু তাতেও কোনো তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কোথায় কী যেন নেই। কোথাও একটা শূন্যতা, একটা অনুপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম; কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না—সেটা কী। আমি তো দুনিয়ার কাজ-ই করছিলাম। তবে দুনিয়া কেন আমার প্রতি বিমুখ? দুনিয়া লাভের জন্যই তো আমার চেষ্টা-সাধনা, কিন্তু দুনিয়াটাই যেন আমার জন্যে গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে।

আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমার বিচ্যুতি, পদস্খলনের ঠিক কারণ আমি অনুধাবন করতে পারলাম। দুনিয়া পেতে গিয়ে আমি দুনিয়ার মালিকের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি। আমি হারাতে চলেছি এপার-ওপার সব।

ফিরে এলাম কুরআনের কাছে। সমস্ত অবহেলা, অযত্ন আর অনিয়ম ছেড়ে দিনরাত কুরআনের সাথেই কাটানো শুরু করলাম। আমি খেয়াল করলাম, কুরআনকে জীবনে নতুন করে স্থান করে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে এতদিনের সব অকল্যাণ আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। যে কঠিন মুহূর্তগুলো এতদিন আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেগুলো চোখের পলকেই সহজ হয়ে গেল। সবকিছুতেই একটা স্থিতিশীলতা, স্থবিরতা এবং ভারসাম্য চলে এলো, আলহামদু লিল্লাহ।

শুরু করলাম পড়াশোনা। কীভাবে হিফয করা যায় তা নিয়ে সবিস্তারে পড়তে শুরু করলাম। দিনরাত কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলাম। যখন আমি রান্না করছি, যখন আমি ঘর গোছাচ্ছি, যখন আমি আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করছি, যখন আমি বন্ধুদের কিংবা পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে আছি—সবসময় গুনগুন করে

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ১২৪।

Scanned with CamScanner

আমি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতাম। অন্তত মনে মনে।

যে-অসুখে পড়ে আমি মৃত্যু-পথযাত্রী হতে যাচ্ছিলাম, ধীরে ধীরে সেই অসুখটাও সেরে গেল। আমার হৃদয়ে এক অন্যরকম প্রশান্তি বিরাজ করতে শুরু করল। যে-অতৃপ্তি আমার মনে ব্যথার আলোড়ন তৈরি করছিল, তা এক গভীর পরিতৃপ্তি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেল, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পুরস্কৃত করলেন। এর থেকে বড় কোনো প্রাপ্তি হতে পারে না।

আমি যে অগোছালো জীবনযাপন করছিলাম তা বদলে গিয়ে এক গোছানো, পরিচ্ছন্ন জীবনে রূপ নিল। আমি আমার কুরআন শেখার সময়ের রুটিন বানাতে শুরু করলাম : আজকে তাজবীদ, কালকে তাহফিয, এভাবে। আমার চারপাশে যারা ছিল তারাও নিজেদের জীবনকে গুছিয়ে নিতে শুরু করল। কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনকে আমূল বদলে ফেললাম।

কারও জীবনই সমস্যাবিহীন নয়, কেননা, আল্লাহ আমাদের যে-পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা বিপদাপদে পরিপূর্ণ; কিন্তু, এখন আমি আমার সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে পারি। কারণ, এখন আমি আগের চাইতে বেশি সচেতন এবং জ্ঞানী।

আপনি হয়তো ভাবছেন, 'এভাবে কুরআন শেখার কী অর্থ থাকতে পারে যদি সে ভুলে যায়? আমি বলব যে, তিনি নিজেকে রাতদিন কুরআন দ্বারা পরিশুদ্ধ করছেন, এর পবিত্রতা ও এর সৌরভ দিয়ে। যেমন—সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন :

> *যে-ই ভালো কাজ করবে, মুমিন থাকা অবস্থায়, নিশ্চয়ই আমি তাকে এক সুন্দর জীবন অতিবাহিত করাব এবং অবশ্যই আমি তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ নমুনা অনুযায়ী পুরস্কৃত করব।*[১]

কুরআন শেখা ও মুখস্থ করার সময়ে মনে রাখবেন, আপনি এমন এক রাস্তায় পা বাড়াচ্ছেন যার কোনো সমাপ্তি নেই, কিন্তু এই পথে আপনি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন। কেননা, এই পর্যন্ত যারা কুরআনের হিফয করেছেন তারা সকলেই জানেন, তারা ভুলে যান এবং তারপর আবার মুখস্থ করেন, তারপর আবার ভুলে যান। তারপরেও

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৭।

Scanned with CamScanner

তারা মুখস্থ করে যেতে থাকেন। আপনি যদি সুখী জীবনযাপন করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই কুরআনের সংস্পর্শে থাকতে হবে।

সুতরাং, নিজেকে কুরআনের কাছে বিক্রি করে দিন এবং দেখুন, কীভাবে এটি আপনার জীবনকে আগাগোড়া বদলে দেয়। আজই শুরু করুন এবং কুরআন দ্বারা আপনার জীবন চিরতরে বদলে নিন।[১]

[১] ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত একটি ইংরেজি লেখার ভাবানুবাদ।

Scanned with CamScanner

অগ্রাধিকার

আফীফা আবেদীন সাওদা

[এক]

চিলেকোঠার ঘরটাতে চুপচাপ বসে আছে মারইয়াম। সুন্দর করে ঘর সাজানো হয়েছে। দেওয়ালে নতুন রঙ। ছাদে চেয়ার টেবিল পাতা, সুন্দর আলোকসজ্জা। সন্ধ্যা নামলেই আলোতে চারদিক ঝলমল করে উঠবে।

এত সাজসজ্জা এত আড়ম্বর সব মারইয়ামকে ঘিরে। আজ ওর বিয়ে। চারদিকে আনন্দ, হইচই। তবু সবকিছু ছাপিয়ে মারইয়ামের মনটা ভীষণ খারাপ।

একটু আগেই সামিয়া আপুকে রাগিয়ে দিয়েছে সে। মারইয়ামকে নিজ হাতে সাজিয়েছে সামিয়া। পার্লারে যেতে নারাজ তার বোন। এ বাড়ির বিয়েতে এমনটা আগে হয়নি। ছেলে-মেয়ে আলাদা বসবার ব্যবস্থা, কনেকে মাহরাম ছাড়া কোনো পুরুষ দেখতে পারবে না। আরও কতশত নিয়ম। সবকিছু বোঝেও না সামিয়া। এত জটিলতার প্রয়োজন কী মাথায় ধরে না তার। বারবার বলছে, 'আমার লাল টুকটুকে ছোট্ট বোনটাকে সবাই দেখতে পাবে না?'

শেষমেশ মারইয়ামকে বলেই বসল, 'তোর দুলাভাইকে ডাকি? একটু দেখে যাক তোকে। কী মিষ্টি লাগছে! সে তো তোর ভাইয়ের মতোই। যখন ছোট ছিলি, দুলাভাইয়ের কোলে কোলে ঘুরতিস। ভুলে গেছিস?'

Scanned with CamScanner

ফোনটা হাতে নিয়ে হাজব্যান্ডকে কল দিচ্ছিল সামিয়া। একমাত্র শালিকে সে দেখবে না, এ হয় না! আতঙ্কে জমে যাওয়া মারইয়াম চিৎকার দিয়ে ফোনটা কেড়ে নিল হাত থেকে।

'আস্তাগফিরুল্লাহ! না-আ-আ!'

মারইয়ামের হঠাৎ চিৎকারে সামিয়া হতবিহ্বল। এই তো দুই বছর আগেও বোনটা এমন ছিল না। হঠাৎ কী হলো, কীভাবে হলো কিছুই জানে না সে।

দুই বছর আগে হাজবেন্ড পিএইচডি করতে দেশের বাইরে গেল। তার তিনমাস পর সামিয়াও পাড়ি জমাল সে-দেশে। চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে যায় কথাটা যে কী পরিমাণ সত্যি! এর মাঝে আমূল বদলে গেছে তার ছোট বোনটা। হাত মোজা, পা মোজা, নিকাবে নিজেকে মুড়িয়ে ফেলেছে একদম। বিয়ের অনুষ্ঠানে কঠিন সব শর্ত জুড়ে দিল। এমন হলে চলবে না, অমন হতেই হবে। মা-বাবাও মেনে নিলেন। এখানেই সামিয়ার রাগ। চাইলেই সব মেনে নিতে হবে!

চিলেকোঠা থেকে নিচে ফিরে গিয়ে মায়ের সাথে বেশ চেঁচামেচি করেছে সামিয়া। কেন মারইয়ামকে কিছু বলা হচ্ছে না? মা-বাবা ওকে আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। রাবেয়া খানম বড় মেয়েকে থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আত্মীয়-স্বজনে গিজগিজ করছে পুরো বাড়ি। বরপক্ষও চলে এলো বলে। এর মাঝে অযথা সিনক্রিয়েটের মানে হয় না। অবশ্য মেয়েকেই বা কী বলবেন! নিজেই বিরক্ত মারইয়ামের ওপর।

[দুই]

আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেছে। বরপক্ষের আসবার কথা ছিল দুপুরে। বারবার ঘড়ি দেখছে মারইয়াম। এখনও আসছে না কেন? আরেকটু পরই মেকআপ তুলে ওযু করে নিতে হবে।

'কী রে মারইয়াম! ঘড়ি দেখিস কেন এত? বরের জন্য তর সইছে না আর? অত উতলা হলে তো বিপদ! সে কিন্তু এখনও বেগানা পুরুষ। না না বেগানা পুরুষ না... তুই কী যেন বলিস... ও হ্যাঁ গাইরে মাহরাম!' বলেই হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল মারইয়ামের ফুপাত বোন।

Scanned with CamScanner

চিলেকোঠায় আত্মীয়-স্বজনেরা ভিড় করেছে কনে দেখতে। কম-বেশি সেজেছে সবাই। ছোট চাচি সেজেছেন সবচেয়ে বেশি। মেকআপ বক্স যেন উপুড় করে মুখে ঢেলে দিয়েছে। তার চেয়ে বয়সে ছোট ভাগ্নি-ভাতিজিরা তেমন সাজেনি দেখে আফসোসও করছেন। তিনি কি তবে দলছাড়া হয়ে গেলেন! কয়েকবার এসে মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করে গেছেন, 'হ্যাঁ রে মারইয়াম, আমাকে কি বেখাপ্পা লাগছে দেখতে?'

আরেক ভাগ্নিকে বাগে পেয়ে জেরা শুরু করলেন, 'বিয়ে বাড়িতে তোরা এত সাদামাটা সেজেছিস কেন?'

'আরে মামী আজকে সেজে কোনো লাভ নেই! কেউ দেখবে না!' ঠোঁট উল্টিয়ে ভাগ্নির জবাব।

এই 'কেউ' কারা সেটা মারইয়াম জানে। 'কেউ দেখবে না' মানে পুরুষেরা দেখতে পাবে না। নারী পুরুষের আলাদা বসবার আয়োজন অনেককেই হতাশ করেছে। তাই মনমতো সাজেওনি তারা। অথচ এই মেয়েগুলোকে যদি রবের আদেশ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যদি বলা হয় সৌন্দর্য প্রদর্শন কোরো না, তখন তারাই বলবে, 'আমরা কি কাউকে দেখানোর জন্য সাজি? আমরা তো নিজের জন্য সাজি!'

কী প্রহসন! আপনমনেই হেসে ফেলে মারইয়াম। পরক্ষণে হাসি মিলিয়ে যায় সালাতের চিন্তায়। মাকে একটা ফোন দেবে? চিলেকোঠায় আসতে বলবে?

[তিন]

ভার-মুখে ওপরে উঠে এসেছেন রাবেয়া খানম। বিয়ের দিনটা প্রত্যেক মেয়ের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই শক্ত কথা বলতে চান না মেয়েকে। তবে এই মেয়ে যা শুরু করেছে কিছু না বললে আর চলছে না। একটু আগে ফোন দিয়ে বলেছে, 'মা আমি মেকআপ তুলে ফেলছি। নইলে আসরের ওয়াক্ত পার হয়ে যাবে।'

মেয়ের এমন আক্কেল গুড়ুম কথা শুনে লিফট ছেড়ে সোজা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে এসেছেন। এত এত মানুষের সামনে এই মেয়ে তার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেবে!

চিলেকোঠার ঘরটাতে যারা ছিল সবাইকে বিদায় করে দিয়েছেন রাবেয়া। জরুরি কথা আছে মারইয়ামের সাথে। যাবার আগে বড় জা হাসতে হাসতে স্বভাবসূলভ রসিকতা করে গেছেন, 'চলো চলো, সবাই ভাগি। মা-মেয়ে ষড়যন্ত্র করবে এই ঘরে।'

Scanned with CamScanner

অপ্রস্তুত হাসি হেসেছেন রাবেয়া। চোখে মুখে একরাশ কৌতূহল চেপে আত্মীয়রা একে একে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

দরজাটা লক করে চোখের আগুনে মেয়েকে পুড়িয়ে দেবার একটা চেষ্টা চলল কিছুক্ষণ।

'মেকআপ তুলে ফেলবে কেন?' শীতল কণ্ঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন রাবেয়া। উত্তর জানা, তবুও মেয়ের মুখে আরেকবার শুনতে চান।

'আসরের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে মা। আমার ওযু করতে হবে। মেকআপ না তুললে ওযু হবে না।' মারইয়ামের অসহায় উত্তর।

'আজকের সালাতটা বাদ দাও তাহলে। মাগরিবের সাথে পড়ে নিয়ো।' এবার কণ্ঠ আরও বেশি গম্ভীর।

নিজ কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না মারইয়াম। মা এটা কী বলল! সালাত কাযা করতে বলল! এতটা নির্বিকারভাবে!

'শোনো মারইয়াম, বিয়ে নিয়ে যা শুরু করেছ তার সবটাই মেনে নিয়েছি। আর কিছুই মানতে রাজি নই আমি। পরিবারের সবাইকে বীতশ্রদ্ধ করে ফেলেছ তুমি!'

'কিন্তু মা...!'

'কোনো কিন্তু না! মেকআপ তুলতে চাইলে তোলো! তবে মনে রেখো, তোমার মাকে অসন্তুষ্ট করে আজ এই বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছ।'

চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে মারইয়ামের। 'মা, তোমাকে সন্তুষ্ট করতে গেলে যে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন! তুমি কেন বুঝতে পারছ না!'

'আমি কিছুই বুঝতে চাই না! যা খুশি করো তুমি!' দরজাটা খুলে প্রবল বেগে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন রাবেয়া।

সেই ছিল মা-মেয়ের শেষ আলাপচারিতা। ব্যথিত মারইয়াম সব মেকআপ তুলে ওযু করে এসেছে। তাকে যে রবের ডাকে সাড়া দিতে হবে! জায়নামাযে মাথা ঠেকিয়ে সব কষ্ট নিবেদন করতে হবে পরম করুণাময়ের কাছে।

Scanned with CamScanner

সিজদায় লুটানোর পর মারইয়াম আর ওঠেনি। রব তাকে চিরতরে ডেকে নিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়বারের মতো সিঁড়ি ভেঙে চিলেকোঠায় দৌড়ে এসেছিলেন রাবেয়া খানম। অপলক চেয়ে ছিলেন মেকআপ বিহীন মেয়ের মুখশ্রীর দিকে। কী সুন্দর স্নিগ্ধ মুখ! ফুলের মতো ফুটে আছে যেন। এই মুখে কি দুনিয়ার কোনো প্রসাধনী মানায়![১]

---

[১] একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

Scanned with CamScanner

পাঁচশো টাকা

আনিকা তুবা

রফিক সাহেব কফি খেতে খুব পছন্দ করেন। একটি কফি মেশিন কেনার শখ তার বহুদিনের। তিনি যে অফিসে চাকরি করেন সেখানেই একটি আছে। জিনিসটি খুবই চমৎকার! তার মন চায় বাসায় বউ-বাচ্চাকে কফি বানিয়ে খাওয়াতে। স্ত্রীকে নিয়ে তেমন একটা বাইরে যাওয়া হয় না। তার স্ত্রী নিকাব পরে দোকানে গিয়ে মুখ খুলে কফি খেতে তার আপত্তি; কিন্তু বাসার জন্য কফি মেশিন কেনার পেছনে অনেকগুলো টাকা ঢালবেন সেই ইচ্ছে রফিক সাহেবের হয় না। তারচেয়ে বরং টাকাগুলো ভালো কোনো খাতে ব্যয় করা যায়। এই তো গত মাসেই জমানো টাকাগুলো পাঠালেন বন্যার্তদের জন্য। ভালো লাগে। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ভালো কাজে খরচ করলে মনে শান্তি হয়।

ইদানিং কেনাকাটার অনেক অ্যাপ চালু হয়েছে, মোবাইলে তারই একটি নামিয়ে চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ একটি জিনিসে চোখ আটকে গেল। আর কিছুই না, একটি চকচকে লাল রঙের কফি মেশিন।

জিনিসটার দামও সামান্য। মাত্র পাঁচশো টাকা। এক লোক তার নিজের কফি মেশিনটাই কোনো কারণে বিক্রি করে দিচ্ছেন। মেশিনটি নাকি ভালো কাজ করে। কোনো সমস্যা নেই। আবার দামটাও এত কম! এখন তো মানুষ একবার নাশতা খেতেই পাঁচশো টাকা খরচ করে ফেলে। না! এমন সুযোগ আর আসবে না। এ যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক উপহার! রফিক সাহেব জুব্বা গায়ে চাপিয়ে দ্রুতই বেরিয়ে পড়লেন।

Scanned with CamScanner

কফি মেশিনটি আবার হাতছাড়া না হয়ে যায়। ঘরে বসেই দোকানের মতো মজাদার কফি খাওয়ার কথা ভেবে তার মেজাজটা আজ খুব ফুরফুরে।

লোকটার হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিয়ে রফিক সাহেব লাল রঙের কফি মেশিনটার মালিক হয়ে গেলেন। কাঁধে চাপিয়ে একাই কষ্ট করে বাসায় নিয়ে এলেন। কাউকে কিচ্ছু জানালেন না। স্ত্রীকে এবার ধোঁয়া ওড়া ক্যাপুচিনো বানিয়ে চমকে দেওয়া যাবে। নিশ্চয়ই রেণু বাসার মগে বানানো ক্যাপুচিনো দেখে খুব অবাক হবে!

লাল রঙের কফি মেশিনটি যত্ন করে সেট করলেন রফিক সাহেব। ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করলেন। পাশে দাঁড়ানো তার চার বছরের মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে বাবার কাজকর্ম দেখছে।

'বাবা বাবা, এটা কী?'

'এটা একটি কফি মেশিন।'

'এটা দিয়ে কী করবা?'

'এটা দিয়ে আমরা মজার মজার কফি বানাব আর খাব।'

'আমাকেও দিবা, বাবা?'

'হ্যাঁ, আজকে তোমাকেও দেব।'

'প্রত্যেকদিন দিবা, বাবা?'

'না আম্মু, প্রতিদিন তো কফি খেতে নেই; কিন্তু আজকে দেব। আজকে আমরা সবাই মিলে ফোমঅলা ধোঁয়া-ওড়া কফি খাব।'

চামচ দিয়ে মেপে মেপে খুব সাবধানে দুধ চিনি আর কফি বীনসগুলো ঢাললেন এক এক করে। কেতলিতে পানি ফুটিয়ে পানি ঢাললেন। এবার স্টার্ট চাপলেই এক মিনিটে তৈরি হয়ে যাবে। অফিসের সবাই বলে 'রফিক সাহেব, আপনার কফি বানানোর হাত দুর্দান্ত। হুজুর হয়েও এত ভালো কফি কেমনে বানান!'

মনে মনে হাসেন রফিক সাহেব। স্টার্ট বাটনে আলতো চাপ দিলেন তিনি। আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু এ কী! মেশিনটি কাজ করছে না যে!

Scanned with CamScanner

রফিক সাহেব ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, টুকটাক ঘেঁটে দেখলেন। না, সব লাইন ঠিক আছে। তাহলে? লোকটি কি তবে ঠকিয়েছে! মাত্র পাঁচশো টাকার জন্য! মাত্র পাঁচশো টাকা!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে। কয়টি টাকার লোভে মানুষ কেন অমানুষ হয়ে যায়? কেন লোক-ঠকানোর মতো একটি মারাত্মক গুনাহ করে? কেন কয়টি টাকার জন্য মিথ্যা বলে? কী হতো পাঁচশোটা টাকা না পেলে? কী হতো একটু কম লোভ করলে? রফিক সাহেবের আর কিচ্ছু বুঝে আসে না। দুনিয়ার পিছে ছুটতে থাকা মানুষদের এই কাজগুলো তার খুব আজব লাগে। পাঁচশো টাকার বিনিময়ে এভাবেই বুঝি কেউ কেউ জাহান্নাম কিনে নেয়।

রফিক সাহেবের মেয়েটি এখনও আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে ফোমঅলা ধোঁয়া-ওড়া কফির জন্য। আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের সেই কফি মেশিন।

Scanned with CamScanner

আকাশছোঁয়া আলো

মুরসালিন নিলয়

ফেরদৌসের সাথে আমার পরিচয় মিশরে থাকাকালীন। কায়রোর এক ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে আরবী শেখতাম তখন। ফেরদৌস ইংল্যান্ড থেকে মিশরে এসেছিল আরবী আর ইসলামী-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। ও যে-বাড়িতে থাকত, সেখানে একটা ঘর খালি ছিল। আমিও তখন মাসখানেকের জন্য থাকার জায়গা খুঁজছি। সেই সূত্রে পেয়ে গেলাম ফেরদৌসকে।

তখন সে উনিশ বছরের টগবগে এক যুবক। কিছু মানুষকে দেখলেই ভালো লাগায় মনটা ভরে ওঠে। ফেরদৌস ছিল সে-রকম। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে আপন করে নিল। সামান্য কুশল বিনিময়, চা বিস্কুটে আপ্যায়ন—সবকিছুতে তার আন্তরিকতা আমায় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তার সাথে থাকার দিনগুলো আজও মনে পড়ে। একটা হাদীস পড়েছিলাম, 'দ্বীনের মধ্যে যে-ব্যক্তি ভালো কিছুর প্রচলন ঘটায় যা তার পরেও লোকেরা অনুসরণ করে, তার পুরস্কার অনুসৃতদের পুরস্কারেরই অনুরূপ হবে, আর তাদের থেকে কোনো অংশই কাটা যাবে না।'[১] ফেরদৌসের জীবনযাত্রা থেকে শিখেছিলাম অনেক কিছু। ঈশার সালাত আদায় করেই সে ঘুমিয়ে পড়ত, আর উঠত ভোরেরও আগে। উঠেই সোজা চলে যেত উস্তাযের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করতে। নিয়ত ছিল হাফিয হবে। জান-প্রাণ

---

[১] *সহীহ মুসলিম।*

Scanned with CamScanner

দিয়ে কুরআন পড়ত সে। কীভাবে কুরআনে হাফিয হওয়া যায় তা-ই নিয়ে চলত নানান গবেষণা। ড্রইং রুমের একপাশে পর্দা টানিয়ে নিজের ঘর বানিয়ে নিয়েছিল ফেরদৌস। তাতে শুধু বই আর বই। ঘুমাবার ব্যবস্থাও সেখানে, পাতলা মাদুর টেনে। পার্থিব সব আরাম আয়েশ ত্যাগ করে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন। এক মুহূর্ত বসে থাকার লোক ছিল না সে। সারাক্ষণ কোনো-না-কোনো নেক-কাজে ডুবে থাকা চাই। হোক সেটা ইলম অর্জন বা মসজিদে সালাত আদায়, নফল রোযা, দান-খয়রাত কিংবা সুন্নাহ পালন।

আমি কখনও তাকে গীবত, অসার কথাবার্তা, সময়ের অপচয় করতে দেখিনি। দেখিনি লক্ষ্যচ্যুত হতে। মনে হতো এই ছেলে নিজেকে সত্যিই একজন মুসাফির ছাড়া আর কিছু ভাবে না। রবের কাছে ফিরবার আগেই সব দায়িত্ব পালন করে যেতে চায়।

তার বাড়িতে মাসখানেক থেকে আগের ঠিকানায় চলে আসতে হলো আমাকে। চলে আসার পর ফেরদৌসের থেকে একটা মেসেজ পেলাম।

সে লিখেছে—

আপনার সাথে এই কয়দিন খুব ভালো সময় কেটেছে। আমার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, 'সে এমন কী করেছিল যে আমার কাছে মাফ চাইছে? কোনো রকম আঘাত কিংবা এতটকু অপমানও তো করেনি!'

আসলে এটা ছিল তার বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। আমার সাথে খারাপ কিছু করুক কিংবা না-করুক—তা এখানে ধর্তব্য নয়। সৌজন্য প্রকাশ করতে সে ছিল সদা তৎপর।

ফেরদৌসের পাঠানো মেসেজটা এখনও আমার ফোনে রয়ে গেছে। কেবল সে-ই চলে গেছে তার প্রিয় রবের কাছে। তার মারা যাবার ঘটনাও আমার জন্য বিরাট শিক্ষা নিয়ে হাজির হয়েছিল। সে গল্পই বলব আজ। দিনটা ছিল ২০১৩ সালের মার্চের ১৫ তারিখ, শুক্রবার। ফেরদৌস ও আরও কয়েকজন ভাই মিলে দল বেঁধে কায়রোর ফাইয়ুম প্রদেশে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেখানে ছিল চমৎকার দৃষ্টিনন্দন একটা হ্রদ, তার মাঝে ছোট্ট দ্বীপ জেগে আছে। একজন ভাই বাদে সবাই-ই চাইছিল সে হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটতে। শান্ত, নিথর হ্রদের পানি বুক সমানও হবে না। মাথার ওপর জ্বলজ্বলে সূর্যের আলো পানিতে পড়ে ঝিকমিক করছিল।

Scanned with CamScanner

সেই একজন বাদে বাকিরা পানিতে নেমে গেল। এর খানিক পরেই উতলা হয়ে উঠল হ্রদের ঢেউ। একটু আগে যে পানি পেটের উচ্চতায় ছিল, তা গলা ছাড়িয়ে যেতে চাইল। পায়ের নিচের মাটি যেন তাদের টেনে নিচে নিয়ে যেতে চাইছে।

চোরাবালি! ফেরদৌসরা চোরাবালিতে ডুবতে বসেছে তখন। কয়েকজন চেষ্টা-তদবির করে পারে ফিরে এলো। চোরাবালিতে রয়ে গেল তিনজন। তাদের মাঝে ফেরদৌস একজন।

শক্ত-সমর্থ এক ভাই সাহস করে ঝাঁপ দিলেন তাদেরকে বাঁচাতে। মাত্র দুইজনকে ফিরিয়ে আনা গেল। রয়ে গেল কেবল ফেরদৌস।

অতঃপর লাশের জন্য অপেক্ষা। সাতটা ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, তবুও লাশ ভেসে উঠল না। যে-ট্যাক্সিতে করে তারা এসেছিল সেই ট্যাক্সিচালক সাহায্য নিয়ে আসার কথা বলে পালিয়ে গেল।

ফেরদৌস নিখোঁজ, এদিকে বিরান এক জায়গায় আটকা পড়েছে তারা। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়, ক্ষুধায় দিশেহারা সবাই। নেটওয়ার্কও কাজ করছিল না, কারও সাথে যোগাযোগের উপায় নেই। অবশেষে স্থানীয় কিছু ভালো লোক সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন। থানায় পৌঁছে দেওয়া হলো ভাইদের। ভাইয়েরা যখন থানায়, বাইরে তখন মরুঝড়। লাশ উদ্ধারে যাওয়া সম্ভব না।

পরদিন সকালে দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শনে যায় পুলিশের একটা দল। তারা লাশ উদ্ধারের চেষ্টা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি। অতঃপর সাধারণ এক লোককে ডেকে আনা হলো। আল্লাহর সাহায্যে ফেরদৌসের লাশ খুঁজে পেয়েছিল লোকটি।

উপস্থিত কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি সেদিন। একদিন আগেও যে বন্ধুটি তাদের সাথে ছিল, সে এখন আর নেই। এমন দৃশ্য সহ্য করা না-জানি কতটা কঠিন ছিল তাদের জন্য! ফেরদৌস ফিরে এসেছে, লাশ হয়ে! তারা বলেছিল ফেরদৌসের হাত-পা নাকি হালকা বাঁকানো ছিল। সে যেভাবে ডুবে গিয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

জানি না কীভাবে তার চিরবিদায়ের কথা সুদূর ইংল্যান্ডে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এটাই মনে হয় সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল সেই ভাইদের জন্য। এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা বলার সাহসই কোথায় পাবে, আর কেমন করেই বা তা বলবে?

Scanned with CamScanner

আমি এখনও ভাবি, কেমন লেগেছিল ফেরদৌসের মায়ের? ওর বাবার? ছেলেকে দেখেনি একটা বছর। সেই গ্রীষ্মেই ছেলে আসবে বলেছিল। সদ্যোজাত বোনকে প্রথমবার দেখবে বলে উদগ্রীব হয়েছিল ছেলেটা! যখন ওর সাথে থাকতাম, ও মায়ের সাথে প্রতিদিন দুইবার করে ফোনে কথা বলত। দিনে একবার, রাতে আরেকবার। আমার আসায় কত যে খুশি হয়েছিল! আমেরিকান বন্ধু পেয়ে মায়ের কাছে তার সে কী উচ্ছ্বাস! হায়! তার মা আর কখনই ছেলের ফোন পাবে না। কেউ তাকে সকাল-রাতে ফোন করে নিত্যকার গল্প বলবে না। শেষ যখন কথা হয়েছিল তাদের, তারা কি জানত—এটাই শেষ? কেউই জানত না। মৃত্যু এমনই। কখন সামনে এসে উপস্থিত হবে, কেউ জানে না।

তবুও ফেরদৌসকে দেখে মনে হতো—মৃত্যুর জন্য সে বুঝি প্রস্তুত। একবার আমাদের উস্তায ফেরদৌসের কুরআন তিলাওয়াত রেকর্ড করেছিলেন। সেটা ছিল সূরা জুমুআ-র শেষভাগ।

বলুন—

.....

তোমরা যে-মৃত্যু হতে পলায়ন করো, সে-মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে। অতঃপর তোমারা যা আমল করতে, সে-সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।[১]

.....

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে গিয়ে ফেরদৌস কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তিলাওয়াত চালিয়ে গিয়েছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। যেন সে জানত, খুব শিগগিরই মৃত্যু এগিয়ে আসছে তার দিকে।

তার মৃত্যুর খবর শুনে আরবী শিক্ষককে বলেছিলাম, 'উস্তায, ফেরদৌসের কথা মনে আছে? ওই যে আগের বাসায় যার সাথে আমি ছিলাম কিছুদিনের জন্য।'

তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু মনে করতে না পারলেও একটু পরেই বলেছিলেন, 'ওহ, ওই যে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করত, সেই ছেলেটি?'

---

[১] সূরা জুমুআ, আয়াত : ৮।

Scanned with CamScanner

সুবহানাল্লাহ! লোকে তাকে মনে রেখেছে কুরআন তিলাওয়াতকারী হিসেবে। কুরআনের সাহচর্য তাকে মৃত্যুর পরও সম্মানিত করেছে। ওই হাদীসটি বারবার মনে পড়ে যায়; যেখানে বলা হয়েছিল, যে-ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা অধ্যয়ন করে, সে জান্নাতে নেককার লেখকদের সাথে থাকবে।[১]

ফেরদৌস মারা গেছে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন, শুক্রবারে।[২] আল্লাহর রাস্তায় ইলম খুঁজে ফেরা পথিক ছিল সে। জ্ঞানার্জনের পথে থেকে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু—সবই তো শুভ মৃত্যুর লক্ষণ![৩]

অবাক হয়ে যাই, কতই না সুন্দর সব লক্ষণ নিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে! তার জানাযাতেও শরীক হয়েছিল অজস্র মানুষ। তাদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র, শিক্ষক আর আলিম।

আশা রাখি, ফেরদৌসকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ক্ষমা করে দেবেন, তাকে দান করবেন জান্নাতের উঁচু মাকাম। জীবনে এক ঘণ্টার জন্যও ফেরদৌসের সাথে যাদের দেখা হয়েছিল, সবাই এসেছিল তার সুমধুর ব্যবহার আর বিনম্র জবানের সাক্ষ্য প্রদান করতে। এত কম বয়সী কোনো ছেলের জানাযায় এত মানুষ আমি আর কোনোদিন দেখিনি!

ঘুরতে গিয়েও ফেরদৌস আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়নি সেদিন। গাড়িতে করে যাবার সময় সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিল সে। জুমআর দিন সূরা কাহফের ফযীলত তো আমরা সবাই জানি। এইদিনে সূরা কাহফ তিলাওয়াতকারীর পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, আলো দেবে কেয়ামতের দিনে।[৪]

---

[১] যে-ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা অধ্যয়ন করে, সে (জান্নাতের) নেককার লেখকদের সাথে থাকবে। আর কুরআন পড়তে গিয়ে যে-ব্যক্তি তোতলায় এবং তা পড়তে অসুবিধা হয় তাকে দুইগুণ পুরস্কার প্রদান করা হয়।—*সহীহ বুখারী*।

[২] সব থেকে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার। এই দিনেই আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই আদম আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। আর এই শুক্রবার দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।—*সহীহ মুসলিম*।

[৩] ইমাম বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাঁচ প্রকারের মৃত-ব্যাক্তি শহীদের মর্যাদা পাবেন। তারা হলেন—মহামারী, ডায়রিয়া, পানিতে নিমজ্জন, চাপা পড়ে এবং জিহাদের মাঠে মৃত্যুবরণকারী।

[৪] ইবনু উমার রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের

Scanned with CamScanner

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিল, মৃত ফেরদৌসের চেহারা থেকে যেন নূর ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

ফেরদৌস দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে ঠিকই। তবে তার মৃত্যু আমাকে যা শিখিয়ে গেছে, তা সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। তার থেকে বয়সে বড় হলেও তাকে আদর্শ মানতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমার। সে স্বয়ং এক অনুপ্রেরণার নাম। এক দুর্দমনীয় শক্তি ছিল তার মাঝে। যে-মানুষটা আমাদের কাছে সুন্দর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত রেখে গেল, কিয়ামতের দিনে পরম করুণাময় যেন আকাশছোঁয়া আলোয় তাকে উদ্ভাসিত করেন।[১]

দিন আলো দেবে এবং বিগত জুমআ থেকে এ জুমআ পর্যন্ত তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।'—*আস-সুয়ূতি।*

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? অতএব, মুমিনরা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬০]

Scanned with CamScanner

জীবনকে তুলনা করা যায় নদীর সাথে। নদী যে মোহনায় থামে, সেখানেই জন্ম দেয় নতুন গল্পের। নদীর প্রতিটি কল্লোল যেন একেকটি গল্প। প্রতিটি বাঁক একেকটি উপাখ্যান। অথবা, জীবনকে আমরা একটি শ্রাবণমুখর সন্ধ্যাও বলতে পারি—যেখানে ঝুম-বৃষ্টির শব্দ শোনায় গল্পের মতো, ঝিরিঝিরি স্নিগ্ধ বাতাসকে গল্পের কাহিনির মতো লাগে জীবন্ত। জীবন কি তাহলে বয়ে চলা কোনো নদী কিংবা আকাশ ভেঙে ঝরঝর করে নেমে আসা কোনো শ্রাবণ-দিনের বৃষ্টি? জীবন কি নিছক উথাল-পাতাল কোনো তরঙ্গের ভেলকি কিংবা গা শীতল করা কোনো স্নিগ্ধ বাতাসের সুর?

না। জীবন এর চেয়েও বেশিকিছু। জীবন এর চেয়েও বেশি দুরন্ত, বেশি চঞ্চল আর বেশি আকস্মিক। জীবনের কাছে মাঝে মাঝে গল্পও তুচ্ছ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে জীবন রূপকথার চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। জীবনের বাঁকে বাঁকে, মোড়ে মোড়ে, ঘটনা-প্রতি-ঘটনায় জন্ম নেয় হৃদয়ের আকুতি-মিনতি, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ আর দুঃখ। এজন্যেই জীবন দুরন্ত, দুর্বিনীত ও চঞ্চল। এজন্যেই জীবন অন্যরকম। সেই অন্যরকম জীবনে জন্ম নেওয়া একগুচ্ছ গল্প দিয়েই সাজানো 'গল্পগুলো অন্যরকম' বইটি...

ISBN
9 789849 386469

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner